ঋণ-মোক্ষ

সামাজিক উপন্যাস

শ্রীতারকনাথ সাধু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আষাঢ়—১৩৩২

মূল্য দুই টাকা

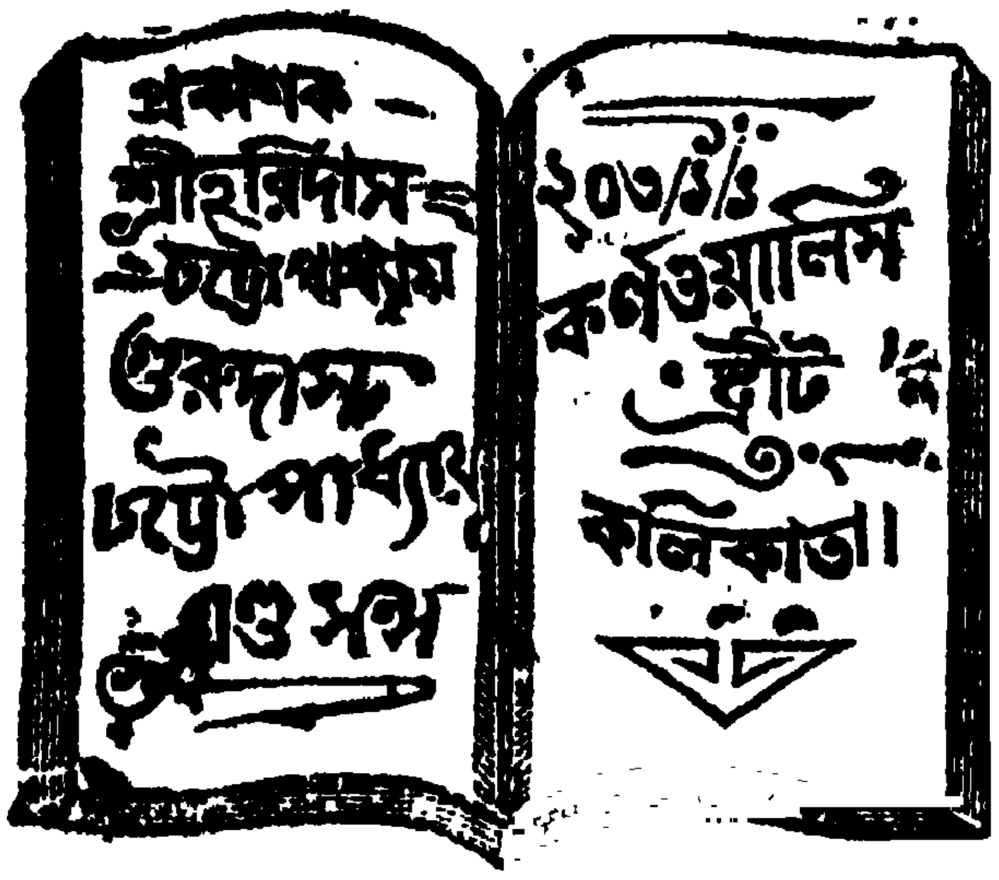

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর সি, আই, ই প্রণীত

গ্রন্থাবলী

১। ভোলানাথের ভুল

নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস

ধর্ম্মহীন শিক্ষার পরিণাম কি বিষময়—কলিকাতা সহরে প্রত্যহ কত প্রকার জাল-জুয়াচুরি হইতেছে, রাতারাতি বড় মানুষ হইতে গিয়া ধনীর সন্তানও কিরূপে শেষ-জীবনে কারারুদ্ধ হয়, তাহারই নিখুঁৎ প্রত্যক্ষ চিত্র এই গ্রন্থে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

২। মেনকারাণী

স্ত্রীপাঠ্য অভিনব গার্হস্থ্য উপন্যাস

বন্ধু-বান্ধবের বিবাহে, নব-বিবাহিতা বন্ধু-পত্নীকে উপহার দিতে হইলে এইরূপ পুস্তকই দেওয়া উচিত। আর শ্বশুর-শাশুড়ীর ত কথাই নাই, যদি পরের মেয়েকে গৃহে আনিয়া নিজ-গৃহকে শান্তিপূর্ণ ও লক্ষ্মীমন্ত করিতে চান, তবে এইরূপ গ্রন্থই বৌমাকে পাঠ করিতে দিন।

৩। মহামায়ার মহাদান

ইহা উপন্যাস নহে—সত্য-ঘটনামূলক আখ্যায়িকা। (যন্ত্রস্থ)

মহাপূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে।

ধর্ম্মের ভাণ করিয়া আজকাল লোকে কিরূপে অপরের সর্ব্বনাশ করে, তাহাই ইহাতে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। সত্য ঘটনা উপন্যাসকে পরাজিত করিয়াছে।

মুখবন্ধ

সারা বৎসর বহু জনাকীর্ণ কোলাহলময় মহানগরী মধ্যে অবিরত কর্ম্মে নিরত থাকিতে থাকিতে জীবনে অবসাদ আসে। তাই মাঝে মাঝে এই সুদূর নির্জ্জন নিভৃত কুটীরমধ্যে বিশ্রামলাভ করি। এবারও অবসর লাভ করিয়া ভাবিয়াছিলাম—নিষ্কর্ম্মা হইয়া এক প্রান্তে বসিয়া থাকিব। কিন্তু হায়! এক পক্ষ অতীত হইতে না হইতেই বুঝিলাম কর্ম্ম হইতে বিরত থাকাও সুখকর নহে। তাহার উপর চৈত্র মাসের মধ্যাহ্নে রৌদ্রের অগ্নিময় উত্তাপে গৃহের বাহির হওয়াও সম্ভবপর নহে। কাজেই লেখনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

উদ্দেশ্য—কুসঙ্গে পড়িয়া মানুষের কিরূপ অধঃপতন হয়, তাহাই দেখান। আজকাল একপ্রকার কীট হইয়াছে, যাহারা সমাজকে ফোঁপরা করিয়া ফেলিতেছে। এই সমাজকীটদিগের নিকট মানবের দৈনন্দিন কর্ম্মে ভগবানের নাম নাই, ধর্ম্ম অসার বাক্‌চাতুর্য্য মাত্র; কোন রকম করিয়া দিনকতক স্ফূর্ত্তিতে কাটাইবার ইচ্ছা, অতিশয় বলবতী; "যেন তেন প্রকারেণ" আশু সুবিধার সন্ধান; ফল নিছক্ দুঃখভোগ। ইহাদের নীতি-সার "খাও, পিও, স্ফূর্ত্তি কর" অন্য সবই অসার।

কেবল ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, অনেকে আবার অধর্ম্ম ও অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না, উদ্দেশ্য ফাঁকি দিয়া জীবনটাকে সুখে কাটাইয়া দেওয়া। তোতাপাখীর মত কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন আওড়াইয়া, বাহ্যিক ধর্ম্মের ভাণ করিয়া, সাধারণের চক্ষে ধূলা দিয়া, জীবনটাকে স্বর্গের পারিজাতের ন্যায় কাটাইয়া দিতে চায়।

এই শ্রেণীর লোকেরা টপ্পা বাজী করিয়াই কর্ত্তব্য পালন করিতে চায়। জীবনে কোন সৎকর্ম্ম না করিয়া, দুটা শাস্ত্রের বুকনী ঝাড়িয়া, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া, দেখাইতে চায়, তাহারা কর্ত্তব্যপালন করিতেছে।

তাহারা ভুলিয়া যায়, আমরা যখন নিজ নিজ সংসারে কর্ত্তা হইয়া বসি সেই সময় আমরা নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের মান, ইজ্জৎ, খ্যাতি, সুনাম, বিষয়াদি ধন-সম্পত্তি অছিরূপে প্রাপ্ত হই—সে কেবল অল্প সময়ের জন্য। আর যতদিন পর্য্যন্ত, আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণ মানুষ হইয়া না উঠে, ততদিন পর্য্যন্ত, আমরা পূর্ব্বপুরুষদত্ত অধিকারগুলি অন্যান্য গচ্ছিত সম্পত্তির ন্যায় রক্ষা করিতে বাধ্য, আবার মৃত্যুর পূর্ব্বে বা মৃত্যু সময়ে সেইসবগুলি মায় ব্যাজ, পরবর্ত্তী বংশধরগণকে বুঝাইয়া দিয়া যাইতে বাধ্য। এইরূপ না করিলে আমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই। এই কর্ত্তব্য কর্ম্মে যাঁহার গলদ হইবে, তিনিই গচ্ছিতাপহরণদোষে দুষ্ট হইবেন। আমাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম, গচ্ছিত সম্পত্তি অটুট রাখিয়া, সেই সব বুঝাইয়া দিয়া যাওয়া; আর পরবর্ত্তী বংশধরগণ যাহাতে সেই সব ন্যস্ত সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষা করিয়া পুনশ্চ পরবর্ত্তী পুরুষকে বুঝাইয়া দিয়া যাইতে পারেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত পাত্র করা; উক্ত কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে কোন একটি পালন করিতে যিনি অসমর্থ হন, তিনি অবিশ্বাসী ও অনুপযুক্ত। মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—যেমন করিয়া পার, কর্ত্তব্য পালন কর। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মগুলি সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিতে পারিলেই কর্ত্তব্য পালন করা হইল। আর যিনি সেই সবগুলি সম্বর্দ্ধিত করিয়া যাইতে পারেন তিনি বংশের তিলক।

অন্যদিকে আমাদের দেশে অনেক রকম জুয়া চলিতেছে, তন্মধ্যে "ঘোড় দৌড়" সমাজের ব্যাধি হিসাবে চূড়ান্ত। লোকে দেখিতেছে, ঠেকিতেছে, ঠকিতেছে, আবার সেই সর্ব্বনাশের রাস্তায় গিয়া আত্মহত্যা করিতেছে।

ঋণ-মোক্ষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দাবীদারের অভ্যর্থনা

ভৈরবচাঁদ :—মুণিমজি হুকুম জারি কর, আগামী কল্য আমার জমিদারীতে সকলেই আনন্দ উৎসব করিবে। সকলে নিজ নিজ ভদ্রাসন আলোকমালায় শোভিত করিবে, সত্যনারায়ণজিউর সিন্নি দিবে। আগামী-কল্য পূর্ণিমা তিথি—প্রত্যেক বাটীতেই সত্যনারায়ণের পূজা হইবে, ছয় মাসের করিয়া খাজনা মকুব্। আজ আমি পিতৃপুরুষের ঋণ পরিশোধ করিতে আরম্ভ করিলাম, মুণিমজি, দেখো অক্ষরে অক্ষরে আমার হুকুম যেন তামিল হয়। তুমি জাননা আজ আমার কি আনন্দের দিন। আমি আমার জন্মদিন হইতে পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেক মালিকান হইয়াছিলাম, পিতার মৃত্যুর দিন আমি পিতামহের ত্যক্তসম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক হইলাম; নিজেও সেই সম্পত্তির অনেক বৃদ্ধি করিয়াছি, সে কেবল সত্য-নারায়ণজির দয়া। বিবাহের পর ক্রমান্বয়ে ছয় কন্যা, প্রত্যেকবারেই সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে মনে করি এইবার আমার বখরাদার আসিতেছে, যাহাকে আমায় হিসাবদিহি করিতে হইবে, কিন্তু নারায়ণজির আমার উপর, বোধ হয়, কৃপার অভাব; প্রত্যেকবারেই তাই একটী করিয়া মার আগমন। পিতার আগমনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছিলাম কিন্তু পিতা ত এতদিন পর্য্যন্ত আসেন নাই। আমি আমার পিতৃ-পিতামহের সম্পত্তির

হিসাব লইয়া বসিয়াছিলাম, বুঝিয়া লইবার লোকের অভাব ছিল। আজ সেই লেনেওয়ালা আসিয়াছে, আমি আজ হিসাব শোধ করিবার অবসর পাইলাম; সত্যনারায়ণজির কৃপায় যদি খোকা বাঁচিয়া থাকে আর কয় বৎসরের মধ্যেই আমি হিসাব শোধ দিব। আজ হিসাব শোধ করিবার প্রথম দিন, নারায়ণজি আমায় পিতৃঋণ হইতে মুক্ত করুন।

চিরঞ্জিলাল ঃ—চাঁদজি হিসাব শোধ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমরা জহুরী-বাচ্ছা পরের হিসাব লইয়াই আমাদের জীবনান্ত; হিসাব শোধ করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন; হিসাব শোধ করিয়া দিলে জলছাড়া মাছের মত কয়দিন বাঁচিবে?

ভৈরবচাঁদ ঃ—লালজি পরের হিসাব শোধ করিতে আমি একেবারেই ব্যস্ত নহি; পরের হিসাব শোধ করিয়া দিলে আমি কি লইয়া এখানে থাকিব। তবে কি জান, পিতৃপুরুষের ঋণ শোধ আলাহিদা কথা; পিতা যখন স্বর্গারোহণ করিলেন তাহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পিতৃদত্ত ধনসম্পত্তি সমস্তই আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন; শুধু যে তিনি টাকা কড়ি বিষয় সম্পত্তি আমাকে দিয়া গেলেন তাহা নয়, তাঁহার বংশের মান, সম্ভ্রম, সুনাম, সুখ্যাতি, সমস্তই আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন—বৎস! আমার পিতৃদত্ত সমস্ত সম্পত্তি, আমার বংশের সুনাম, সুখ্যাতি, আমার পূর্ব্ব পুরুষের মান, ইজ্জত সমস্তই তোমার কাছে দিয়া গেলাম; তুমি এই গুলি ন্যাসরক্ষক হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; দেখো ঈশ্বরের দিব্য ইহার কিছুই তছরুপাত করিও না। আমার বংশে তোমার পরে যিনি আসিবেন তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া পিতৃঋণ শোধ করিও। দেখিও আমার পূর্ব্বপুরুষের স্বচ্ছ, নির্ম্মল, শুভ্র বংশ-গরিমায়, নাম ও যশে, কোনরূপ কলঙ্ক-রেখা আনিও না, কোনরূপ দাগ দিও না। আমার এই বংশের যশোগানে কোনরূপ যেন বেসুর না হয়; যদি পার এই বংশের

বহুদূরব্যাপী যশঃসৌরভ আরও দিগ্‌দিগন্তব্যাপী করিতে চেষ্টা করিও। লালজি আমি যতটুকু পারিয়াছি, বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি, বরং কথঞ্চিৎ সেই মর্য্যাদার আরও বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাও করিয়াছি, এখন আমি সেই হিসাব শোধ করিবার অবসর পাইতেছি, আজ বড় আনন্দের দিন, লালজি, আজ বড় আনন্দের দিন; আজ নারায়ণজির আমার প্রতি বড় দয়া; আমি জহুরীর ছেলে, আর যাহাই হই বিশ্বাসঘাতক নহি। পূর্ব্বপুরুষের নাম যশঃ লোপ করি নাই। মোহনচাঁদ জহুরীর বাচ্ছা, আর যাহাই হউক, গচ্ছিত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে জানে না—তাহার রক্তে সে দোষ নাই।

চিরঞ্জিলাল ঃ—তা চাঁদজি, আমি ত তোমাদের সংসারে দাড়ি গোঁফ পাকাইলাম। তোমার পিতা কর্ত্তা মোহনচাঁদজি ত কখন কিছু লেখা পড়া করিয়া জিম্মাদার করিয়া যান নাই। তিনি স্বর্গে গেলেন, তুমি মালিক হইলে এই ত আমি জানি; সে ত আজ ৩০ বৎসরের কথা।

ভৈরবচাঁদ ঃ—মুণিমজি, তুমি হুসিয়ার লোক হয়ে এই কথা বলিলে; পিতা যখন পুত্রের হাতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের বংশমর্য্যাদা, ও তৎসঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষদের ধনসম্পত্তি গচ্ছিত করিয়া যান, তখন কি কোন লেখা-পড়া করিয়া যান; তাহা নয়, লেখাপড়া করে, যখন এক অবিশ্বাসী অপর এক অবিশ্বাসীর সহিত ব্যবহার করে, লেখাপড়া দলীল দস্তাবেজ তাহাদের জন্য; লেখাপড়া, দলীল, দস্তাবেজ প্রাণের জিনিষ নয়, উহা প্রাণের বাহিরের জিনিষ; উহা এটর্ণি বাড়ী, উকীল বাড়ীতে তৈয়ারী, এক পক্ষ অপর পক্ষকে টানিয়া বাঁধিতে চায়, অপর পক্ষ আইনের প্যাঁচ হইতে খোলোসা পাইতে চায়; সে যেমন করিয়া পারে, তাহা হইতে বাহিরে আসিতে চায়, ইহাতে প্রাণের কথা কিছু নাই, ধর্ম্মের সত্ব কিছু নাই, ইহা বেচা কেনার কথা, হৃদয়ের কথা নয়; বিনা লেখাপড়ায় যে আদান

প্রদান হয়, যাহাতে সাক্ষী—চন্দ্র, সূর্য্য আর স্বয়ং নারায়ণ, তাহাতে মানুষ জুয়াচুরি বা ফেরেপবাজী করিতে পারে না, তাহা করিতে হইলে হৃদয়ের শুদ্ধতম তন্ত্রী ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়; তাহা ত মানুষ পারে না। দেখ সূর্য্যদেব সারাদিন পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিয়া যখন সন্ধ্যার সময়ে চন্দ্র-দেবকে হিসাব বুঝাইয়া দিয়া রাত্রের জন্য ছুটী লন, তখন ত উকীল এটর্ণি দ্বারা লেখাপড়া করিয়া হিসাব বুঝাইয়া লন না, অথচ আবহমান কাল এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, কোন গোলযোগ নাই; যেখানে বত্রিশ বাঁধন সেইখানেই গেরো ফসকা হয়।

চিরঞ্জিলাল :—অহো চাঁদজি বুঝেছি বুঝেছি; কি জান চাঁদজি, তোমাদের সংসারে ঢুকে অবধি কেবল উকীল বাড়ী যাতায়াত দলীল দস্তাবেজের কথাই মনে পড়ে। প্রথমটা তোমার কথাটা আমি তলিয়ে বুঝি নাই; তবে কি জান চাঁদজি যাহাকে পূর্ব্বপুরুষের হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহাকে প্রথমতঃ মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা চাই, নতুবা বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা। এই দেখ না—আমার ঝন্টিলাল; আপনাদের সংসারের কাজে ব্যস্ত থেকে, ঝন্টিকে বংশের ঝন্টি করিয়া তুলিতে পারিলাম না; এই আমার দুঃখ।

ভৈরবচাঁদ :—সে এখন ছেলে মানুষ এখনও সময় আছে, চেষ্টা কর মনের আশা পূর্ণ হইবে। (স্বগত) মুণিমজি কথাটা অতি সত্য বলিয়াছ, আমরা সব কাজ করি, কেবল ছেলে মানুষ করিতে পারি না; সে কাজ করিবার আমরা সময় পাই না, কথাটা বড় শক্ত কথা, দেখি কি করিতে পারি, আজকের এই আনন্দের দিনে আর ও দুর্ভাবনার প্রয়োজন নাই, তবে কথাটা বড় শক্ত; কথাটা বড় সত্য।

চিরঞ্জিলাল :—মালিকজি তোমার আমলাবর্গের কিরূপ হবে? তাহাদের কি বথ্‌শীষ?

ভৈরবচাঁদ :—তাহারা প্রত্যেকেই দুই মাসের তঙ্কা ইনাম পাইবে।

চিরঞ্জিলাল :—বলিতেছিলাম কি—দ্বিগুণ করিলে হয় না? আমি ত তোমাদের সংসারের খাইয়াই মানুষ, আমার কথা বলছি না, অপরাপর গরীব তাঁবেদারদের কথা বলিতেছি।

ভৈরবচাঁদ :—লালজি আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি খালি তবিলদার, আমাকে ত হিসাব দাখিল করিতে হইবে, এখন এইরূপই হো'ক, তবে বলছি যখন বাচ্ছাকে মানুষ করে তুলতে পারব, তখন ইহার দশগুণ করে দিব, দেখি নারায়ণজির মর্‌জি। লালজি! তুমি আজ আনন্দের দিনে একটা মস্ত ধোকা তুলে দিলে, মালিকের যা মর্‌জি, নারায়ণ, নারায়ণ।

চিরঞ্জিলাল :—চাঁদজি, পাওনাদার দাবীদারকে দেখলে, লোকের মুখ শুকিয়ে যায়, আর দাবীদারের আগমনে তোমার এত আনন্দ?

ভৈরবচাঁদ :—লালজি এখানে বসে তাহার জন্য কতকাল অপেক্ষা করব? না বুঝিয়ে দিয়ে ত যাবার উপায় নাই, যাহার সম্পত্তি তাহাকেত বুঝাইতে হইবেই।

ভৈরবচাঁদ আফতাফচাঁদ জহুরীর বংশধর। আফতাফচাঁদ জহুরী বহুদিন পূর্ব্বে প্রথমে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন, তিনি অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ব্যবসায়ী; ব্যবসাদার হইলেও তিনি অসাধু ছিলেন না, তাঁহার ব্যবসার মূলমন্ত্র ছিল "সাধারণের বিশ্বাস হারাইও না, ধর্ম্মের ভিত্তির উপর ব্যবসায়ের উন্নতি। সাধুতা সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতির মূলমন্ত্র; ব্যবসাতেও তাহাই" বাঙ্গালায় অনেক বিদেশীই আসিয়াছেন। কেহ আসিয়াছেন ব্যবসা করিতে, কেহ আসিয়াছেন লুট তরাজ করিতে, কেহ আসিয়াছেন রাজত্ব বিস্তার করিতে, কেহ আসিয়াছেন ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও শিল্প শিখিতে,

দেখিতে, শিখিয়া ও দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে। এই নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর জগতে, অতি প্রাচীন সভ্যতাও যে অতি নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর তাহারই প্রমাণ দেখিতে। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ভারতে মুমূর্ষুপ্রায়। আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ত্যক্ত অনুষ্ঠানগুলির কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ তাহাও বুঝিতে অক্ষম, তবে সুখের বিষয় ক্রমে বোধগম্য হইতেছে। যে সকল বিদেশী এই দেশে ব্যবসা করিতে আসিয়া, থাকিয়া যান আফ-তাফচাঁদ জহুরী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া নিজেরত উপকার করেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালারও উপকার করেন। জহরৎ বিষয়ে তিনি একজন বিশেষ বিচক্ষণ ও কর্ম্মক্ষম জহুরী। তিনি কেবল জহরৎ বিষয়ে জহুরী নন সকল বিষয়েই জহুরী ছিলেন। বাঙ্গালার মাটি, জল, হাওয়া ও মানুষ দেখিয়া প্রথম হইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা অতি সুন্দর স্থান। তিনি যেমন বুঝিলেন, অমনি ইহার প্রেমে মজিলেন, এবং যেমন মজিলেন অমনি বসিলেন, এবং যেমন বসিলেন, অমনি রহিয়া গেলেন এবং থাকিবার পরই তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ বাঙ্গালার অধিবাসী হইয়া গেলেন। তাহাতে লাভ উভয়েরই; বাঙ্গালার ও আফতাফচাঁদ ও তার বংশধরগণের। তাই বলিতেছিলাম ভৈরবচাঁদ একজন খাঁটি জহুরী। তিনি জহরও চিনিতেন আর পৃথিবীতে যাহা কিছু ভাল, সে সবও চিনিতেন, তিনি হুঁসিয়ার ও ধার্ম্মিক উভয়ই। ধার্ম্মিক হইলেও হুঁসিয়ার হওয়া যায়; আর হুঁসিয়ার হইলেও ধার্ম্মিক হওয়া যায়, তিনি তাঁহার জীবনে এই সত্যটি বিশেষ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। লোকে জানিত তিনি ধার্ম্মিক হইলেও বোকা নন, প্রতারক তাঁহাকে ঠকাইতে পারিত না; প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে দয়া প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বভাবসিদ্ধ নীচতা হেতু, ভাবিত ভৈরবচাঁদকে ঠকাইয়া কিছু আদায় করিলাম, আর ভৈরবচাঁদ ভাবিত আবেদনকারী

নীচমনা হইলেও দয়ার পাত্র;—প্রার্থীর নিজের জন্য নয়, তাহার পুত্র কলত্র ও আশ্রিতদের অভাবের জন্য। মুর্শিদাবাদে আসিয়া বসবাস করিলেও ভৈরবচাঁদ পূর্ব্বপুরুষের আদিম বাস একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই; আর পরিত্যাগ করেন নাই তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের পোষাক, পরিচ্ছদ, ও আচার ব্যবহার। এখানে থাকিয়া বিবাহাদির কালে, দেশ হইতে পাত্র পাত্রী আনিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ফলতঃ তিনি বাঙ্গালায় বাস করিয়াও তাঁহার জাতীয়তা হারান নাই। চিরঞ্জিলাল তাঁহার মুণিম গোমস্তা। তাঁহার বংশের চিরন্তন প্রথা অনুসারে মুণিমজি তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্য হইতে আসিত; চিরঞ্জিলালও সেইখান হইতে আসিয়াছিল, সে ভৈরবচাঁদের বেতনভোগী ভৃত্য হইলেও, মালিকের ভ্রাতা থাকিলে যে মান মর্য্যাদা পাইত, চিরঞ্জিলাল তাহার কম পায় নাই—ভৈরবচাঁদ চিরঞ্জিলালকে ভায়ের ন্যায় ভালবাসিত, যত্ন করিত, আর চিরঞ্জিলালও ভৈরবচাঁদকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিত। চিরঞ্জিলালের হস্তে ভৈরবচাঁদের স্বার্থের কোনরূপ হানি হয় নাই, তবে ভৈরবচাঁদের সংসারে থাকিয়া চিরঞ্জিলাল বেইমান না হইয়াও নিজের সংস্থান করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুখ কোথায় ?

সমরেন্দ্র :—গিন্নী, কতকাল এই রকম খেটে খেটে চালাব, আজ বিশ বৎসর ধরে চাকরী করছি, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সুখে দুঃখে, আমোদে কষ্টে কাটিয়া যাইতেছে ; কিন্তু মোট ফল কি হইল ? জন্তু জানোয়ার যেমন খায়, দায়, থাকে, আমরাও সেইরূপে সময় কাটাইতেছি ; কিন্তু সংসারে আসিয়া করিলাম কি ?

কুমুদিনী :—দেখ কর্ত্তা, আর করবে কি, তুমি সময় বৃথা কাটাও নি, আমি যদ্দিন তোমাদের সংসারে এসেছি তদ্দিনইত তুমি কর্ম্মে ব্যস্ত ; মাকে মার মতন, ভাইকে ভাইদের মতন, আত্মীয় স্বজনকে যতদূর সম্ভব ভাল ব্যবহারই করে আসছ। আমি, তোমার গৃহে এসে রাজরাণী হইনি বটে, ধনীর গৃহিণীও নই, কিন্তু আমার কোন অভাবই নাই। দশরথের ন্যায় স্বামী, রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় পুত্র, সাবিত্রীর ন্যায় কন্যা, মনের মতন আত্মীয় স্বজন, সকলই পেয়েছি ; দেখ আমি রাজারাজড়ার কন্যা নই, অতএব স্বয়ম্বরা হই নাই ; আমাদের সমাজের পছন্দ করিয়া বিবাহ প্রথা নাই ; অতএব পছন্দ করে দেখে শুনে পরীক্ষা করে তোমাকে বিবাহ করিনি, কিন্তু গুমর করে জোর গলায় এ কথা বল্‌তে পারি, যদি আজকে আমাকে, সমাজ দেখে শুনে বিবাহ করবার ক্ষমতা দেয়, তবে তোমারই গলায় ফিরে ফিট্টি বরমাল্য দিই। সুখে দুঃখে, আমোদে আহ্লাদে কষ্টে জীবন একরকম কেটে

যাচ্ছে; আমাকে যদি ভগবান দয়া করে বলেন তোমাকে নূতন পছন্দের অধিকার দিচ্ছি তুমি পছন্দ করে নব জীবন আরম্ভ কর, তাহ'লে আমি সেই করুণাময় পরমপিতাকে বলি, দয়াময় আমার পার্থিব পরমন্তপঃ পিতা, যেখানে আমাকে জীবন যাপন করতে দিয়ে গিয়েছেন তা ছাড়া আমি অন্য সংসার চাই না। আমি লক্ষপতির পত্নী নই কিন্তু আমি পাঁচটী দিক্‌পালের মাতা; আমার পাঁচটী পুত্র এক একটী ভবিষ্যৎ দিক্‌পাল। আমার কালীকৃষ্ণ, কলির কৃষ্ণ নয় শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে যেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। অন্যায় তাহার কাছে আসতে পারে না। আমার রাম, যথার্থ নামের সার্থকতা রক্ষা করেছে। আমার গোকুল, নিজ কুলের শ্রীবৃদ্ধি করেছে; আমার শ্যামল, যেন শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর রাজা। আমার নবীন আজকার দিনে যথার্থই নবীন। আমার চপলা, চঞ্চলা নয়, তাহার জ্যোতিঃ চন্দ্রমার রশ্মির ন্যায় স্নিগ্ধকর; তবে আমি আর চাই কি? কতকগুলি অর্থ, তাহা আমার ভাগ্যে নাই, আর থাকলেও হয়ত তা নিয়ে সুখী হতে পারতাম না। দেখ কর্ত্তা সুখ, ধনে নয়, সুখ মনে; আর মনে সুখী হ'তে হ'লে পুত্রকন্যা, স্বামী দেবর ভাসুর, শ্বশুর শাশুড়ী, আত্মীয় স্বজন মনের মতন হওয়া চাই। আমার সে সবই রয়েছে, আমি এদের পরিচর্য্যা করে, এদের সুখ সচ্ছন্দ দেখে যে আনন্দ উপভোগ করি, বোধ হয়, ইন্দ্রের শচীও তাহা উপভোগ করতে পারে কি না, সন্দেহ। যখন আমার আত্মীয় স্বজন মনের আবেগে বলেন, আহা বাছা আমার সংসারের কাজকর্ম্ম করতে করতে শরীরটী মাটি করলে আমি অনেক সময়ে তাহা শুনে হাসি। বলি, হ্যাগা, শরীরটা ভগবান দিয়েছেন কিসের জন্য? বাক্সবন্দি করে তুলে রাখতে, না কার্য্যে নিয়োজিত করতে, আমার শরীর যদি পুত্র কন্যা, স্বামী ও আত্মীয় স্বজনের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত

না হইল তবে কি কাজে লাগিবে ? নিজের সংসারের কাজে যদি না লাগে, ত কি বাজে কাজে লাগিবে ? একটা গাছ পুঁতিয়া ক্রমাগত জল দিতে দিতে, যখন সেইটী বড় হয়, তখন কি আনন্দ, তারপর যখন সেটীতে ফুল ফল ধরে, তখন আর উল্লাসের অবধি থাকে না। যদি গাছ পুঁতিয়া ফল ভোগ করিলে এত আনন্দ, তখন পুত্র কন্যা মানুষ করিতে পারিলে, তাহা অপেক্ষা কত অধিক আনন্দ, তাহা আর একমুখে বলা যায় না। আমার বিশ্বাস ভগবানেরও তাহাই অভিপ্রেত ; আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধরিয়া মানুষ করিয়া তোমার হস্তে দিয়া তাঁহার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন ; আমি আবার যখন আমার সব পুত্র-কন্যাগুলিকে মানুষ করিয়া দিতে পারিব, তখন আমার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবেই তাহার পূর্ব্বে নয়।

সমরেন্দ্র ঃ—আচ্ছা কুমুদ, তোমার যদি পুত্র-কন্যা না হইত ?

কুমুদিনী ঃ—আমার সেরূপ অবস্থা হয় নাই, সেই জন্য সে ভাবনা ভাবি নাই। তবে এটা ঠিক, আমি জীবনের একটা অবলম্বন করিয়া লইতাম ; দেবর বা ভাসুরের একটা পুত্র বা কন্যা লইয়া মানুষ করিতাম। দেখ মনুষ্যমাত্রেরই একটা অবলম্বন চাই, তাহা পুত্র-কন্যা হইলেই ভাল হয়, যদি তা না হয়, তবে আমাদের দেশে নারায়ণের ও দেবদ্বিজের সেবা, অপর দেশে জীবজন্তুর প্রতি ভালবাসা। আমার দেশেও যে ছেলে-মেয়ে ভাল না বাসে, সে জন্তু জানোয়ারকে ভালবাসে। দেখ সে দিন আমি গঙ্গাস্নানে গিয়া শ্মশান ঘাটে গিয়াছিলাম, সেখানে গিয়া দেখি জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী পরণে গেরুয়া, দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনিও একদিন আমাদেরই মতন সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন ; কামান কামাই করিয়া দাড়ি গজাইয়াছেন, ধোপদস্ত কাপড় ছাড়িয়া গেরুয়া সার করিয়াছেন, যষ্টির বদলে চিমটা ধরিয়াছেন, কিন্তু জীবের মায়া ভুলিতে পারেন নাই।

সমরেন্দ্র ঃ—কেন ? কুমুদ কি দেখিলে, যাহাতে তুমি বুঝিলে, তিনি জীবের মায়া ভুলিতে পারেন নাই, তিনি কি সেখানে ছেলে-মেয়ের পিতা হইয়া তাহাদিগকে মানুষ করিতেছেন।

কুমুদ ঃ—ঠিক তাহা নয় তাহাকে দেখিলে ভণ্ড বলিয়া মনে করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তবে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম তিনিও মায়ার গণ্ডী পার হইতে পারেন নাই।

সমরেন্দ্র ঃ—কি দেখিলে কুমুদ ?

কুমুদ ঃ—দেখিলাম, সেই শ্মশানের ঘাটে, যেখানে বৈরাগ্য আপনা হইতেই আসে, তিনি সেই স্থানে একটী খাঁচা পরিষ্কার করিতেছেন। দুই দিকে লৌহ শলাকা দ্বারা আবৃত, মধ্যে আবার লৌহ শলাকা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। শিক্ষিতদের মতে যাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ, তিনি তাহাদেরই একজনের সেবায় ব্যস্ত ; স্বহস্তেই সেই মানবের পূর্ব্বপুরুষের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম মানুষ স্বভাবতঃই মায়ায় আবদ্ধ ; যদি পুত্র-কন্যা, নরনারায়ণ বা দেবদ্বিজের সেবা না করে, তবে, জানোয়ারের সেবা করিবে ; এই যদি সংসারের নিয়ম হয় তবে নিজের পুত্র-কন্যা, স্বামী স্ত্রী, নরনারায়ণ দেবদ্বিজের সেবা করাই সর্ব্বথা বিধেয়।

সমরেন্দ্র ঃ—কুমুদ তুমি ঠিক বলিয়াছ, নিজের ছেলে না থাকিলে পরের ছেলে মানুষ করিতে হয়। আমাদের আফিসে উমাচরণ বাঁড়ুজ্যে মহাশয় কাজ করিতেন, তিনি বিবাহ করেন নাই, ভগবান তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়ের পুত্র-কন্যা রাখেন নাই, তাই পাড়ার এক পিতৃমাতৃহীন বালককে তিনি মানুষ করিতে লাগিলেন। কালে সেই বালক, যুবক হইল। কিন্তু তিনি তাহার শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না করায় সেই বালক, যে বাল্য অবস্থায় মানুষ ছিল, ক্রমে যখন যুবক হইল তখন একটী বাঁদর হইয়া দাঁড়াইল। আমরা তা জানিতাম না, একদিন যখন ছেলে

মানুষ করার কষ্টের কথা হইতেছে আমি বলিয়া উঠিলাম বাঁড়ুজ্যে মহাশয়, আপনিই প্রকৃত সুখী, কেননা আপনি মায়া মুগ্ধ নন; আপনি মায়া মুক্ত, আপনার মায়ার কোন জিনিষ নাই। শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিয়া লুটাপুটি; তিনি বলিলেন, হরি, হরি, তোমাদের কি ভ্রম, তোমরা আমার চেয়ে অনেক সুখী। আমার নিজের ছেলে নাই, সত্য, আমি একটা পরের ছেলের মায়ায় মুগ্ধ; তুমি হয়ত জান না আমি একটা পাড়ার ছেলেকে মানুষ করিতেছিলাম, সে ছেলেটা বেয়াড়া হইয়াছে, বাক্স ভাঙ্গিতে শিখিয়াছে, বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা পয়সা নিতে সুরু করিয়াছে; ত্যক্ত হইয়া কতবার তাড়াইয়া দিলাম। আবার মনের আবেগে দিন কতক বাদেই তাকে ডাকাইয়া লইলাম; এখন সে বাক্স ভাঙ্গিতেছে, আর আমি তাড়াইয়া দিতেছি, আবার ডাকাইয়া আনিতেছি; এই এখন আমি আফিসে আছি, হয়ত সে ছোঁড়াটা আমার বাক্স ভাঙ্গিতেছে।

কুমুদিনী :—বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের নিজের ছেলে নাই, পরের ছেলে পুষিতেছেন, তাহা না করিলে, হয় ত তিনি একটা বাঁদর বা কুকুর পুষিতেন। সংসারের ধর্ম্মই এইরূপ।

সমরেন্দ্র :—আমার ভয় কেবল কোন ছেলেটা যেন না বিগড়ায়; তাহা হইলেই আমি সুখী।

কুমুদ :—এখন যতদুর দেখা যাচ্ছে, তাহাদের ত কোন কুলক্ষণ নাই, তবে সব নারায়ণের ইচ্ছা।

সমরেন্দ্র :—দেখ কুমুদ, কালী বি, এ, পাশ করিয়াছে, মনে করিতেছি, তাহাকে আমার আফিসে লইয়া যাইব, কি জান আমার ত সংসার দেখিবার অন্য কেহ নাই; ভগবান না করুন যদি আমার ভদ্রাভদ্র হয় তবে তোমাদের সকলকার কি হবে?

কুমুদিনী :—ও সব কথা মুখে আনিও না, কৃষ্ণকে আফিসে নেবে

তাতে কোন আপত্তি নাই তবে ও সব অলক্ষণে কথা আমি শুন্‌তে চাই না।

সমরেন্দ্র ঃ—রামকে ইনজিনিয়ারিং কলেজে দিয়াছি, গোকুলকে উকীল করিব, শ্যামকে মেডিকেল কলেজে দিব, আর নবীন এখনও নিতান্ত শিশু ; দেখি লেখা পড়া শিখিলে ওকে ব্যবসায়ে দিব। দেখ কুমুদ আমাদের দেশের অবস্থা এমনি যে লোকে মনে করে, যে ছেলেটা মূর্খ হইল, যাহার কোন শিক্ষা হইল না তাহাকেই ব্যবসাতে দাও, যেন ব্যবসা করিতে গেলে, ব্যবসা শিখিবার জন্য শিক্ষানবিসি করিতে হয় না ; ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল বিশ্বাস, আর এই জন্যই আমাদের ছেলেরা ব্যবসায়ে ভাল পটু হয় না, কৃতকার্য্যও হয় না, শিক্ষানবিসি না করিলে কোন কার্য্যই শিখা যায় না, ব্যবসা ত নয়ই।

কুমুদিনী ঃ—যাক্ ও সব কথা এখন রাখ, তোমার খাবার সময় হ'ল তোমার খাবার দিই। দেখি, ছেলেগুলোর পড়া হ'ল কি না, তাহাদের ডেকে খাবার দিই।

সমরেন্দ্র ঃ—সব কথার মধ্যেও কুমুদ কিন্তু খাবারের কথা ভোলে না!

কুমুদিনী ঃ—বলি হ্যাঁগা, তুমিও কি তা ভোল? তা ত নয় ; এতদিন শাশুড়ী ঠাকুরাণী ছিলেন তিনি ডেকে ডেকে খাওয়াতেন, তার পর আমি ডেকে ডেকে খাওয়াচ্ছি। তাহার পর আমার উপর যদি ভগবানের দয়া হয়, আর তোমার অগ্রে চলিয়া যাইতে পারি, তখন দেখিবে দিন কতক বাদে খাওয়ার কথা তোমার নিজের মনে পড়িবে, আর সেই সঙ্গে আমার কথাও মনে পড়িবে। তবে কি জান, তোমায় ছাড়িয়া অমরধামেও যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি বলছি না যে অমর ধামে যাবই, তবে যদি যাই সে তোমার সহধর্ম্মিণী বলে।

সমরেন্দ্র খাইতে বসিলেন। কুমুদিনী তাঁহাকে আহার করাইতেছেন, এমন সময় রাম সেইখানে আসিল। রাম উন্নত স্বভাব যুবক, যাহা কিছু সৎ ও উত্তম সে তাহাই ভালবাসে, যাহা কিছু অসৎ ও কদর্য্য সে তাহাই ঘৃণা করে, সে প্রায়ই বলিত ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, তাহার সমবয়স্ক যুবকেরা উপহাস ছলে তাহাকে 'জয়রাম' বলিয়া ডাকিত, তাহাতে সে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং বলিত, সত্য কথা বলিয়া একটা উপনাম পাই তাহাতে ক্ষোভের বিষয় কিছুই নাই, বরং সস্তায় একটা খেতাব পাইয়াছি। রাম আসিয়াই মাতাকে ও পিতাকে প্রণাম করিল ও জানাইল যে তাহাদের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। সেই দিন শেষ ছুটি পাইয়াছে; এখন দিনকতক বাটী আসিতে পারিবে না। হাসিতে হাসিতে বলিল, মা তোমাকে না দেখিলে আমার মন কেমন করে, সেই জন্য একটু অধীর হই, তোমাকে দেখিলেই প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়। আমার বয়স হইয়াছে এখনও মনটা এমন হয় কেন মা ?

কুমুদিনী :—বাবা তুমি এখনও ছেলে মানুষ, কচি ছেলে ষষ্ঠীর কোলে এই ত সেদিন হলে বাবা। হাঁ ভাল কথা মনে পড়িল, দেখ কর্ত্তা, সজনী বাবুর স্ত্রী সেদিন বলিতেছিলেন, তাঁহার মেয়ের সঙ্গে আমাদের রামের বিবাহের কথা, আমি বলিলাম ছেলে এখন ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে, তাহার পঠদ্দশা শেষ হলে, তখন বিবাহের কথা কওয়া যাবে; এখন একথা থাক।

সমরেন্দ্র :—দেখ গিন্নি জন্মিবার পরে, বাঙ্গালীর ছেলের জীবনে যদি কিছু স্থির নিশ্চয় থাকে, ত তাহার বিবাহ; সে বিবাহের উপযুক্ত হউক আর নাই হোক, তাহার বিবাহ হওয়া চাই। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে মা বাপের প্রধান কর্ত্তব্য সময়ে পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া, তাহা না হইলে মাতাপিতা নরকগামী হইল।

কুমুদিনী :—দেখ কর্ত্তা, যদি কথাটা ভাল করিয়া বোঝ, তাহা হইলে সেটা নিতান্ত বাজে কথা নয়; আজকাল মানুষের জীবন গড়ে ৫০ বৎসর; দিনকাল যা পড়েছে, তাহাতে নিজের ছেলে নিজে মানুষ না করিয়া গেলে অপরে তাহা করিয়া সম্ভাবনা খুব কম; তুমি পয়সা রাখিয়া যাও, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে তোমার ত্যক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বা ন্যাসরক্ষক করিয়া যাও, তাহাতে অধিকাংশ সময়েই তোমার সম্পত্তি ত যাইবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছেলেটীও যাইবে। এই দেখ, আমার ভাইয়ের কথা; তুমি জান আমার পিতাঠাকুর, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অল্পবয়স্ক শিশু রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। আমার ভাইকে ছেলেবেলা হইতে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল বলিয়া, তিনি বাল্যবিবাহের বিশেষ বিরোধী, নিজে ২৫ বৎসর বয়স হইলে তবে বিবাহ করেন, এখন কিন্তু তিনি দুঃখ করেন, বলেন হয়ত তিনি ভুল করিয়াছেন; তাঁহার বয়স এখন ৫০ বৎসর, তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ৪বৎসর বয়স্ক; কেমন করিয়া তিনি কনিষ্ঠটীকে মানুষ করিয়া যাইবেন? তিনি বিবাহের পূর্ব্বে কত প্রবন্ধ পড়িয়াছেন; কত বক্তৃতা করিয়াছেন, যে বিবাহ বেশী বয়সে করা কর্ত্তব্য; এ সম্বন্ধে কত প্রামাণিকতা দেখাইয়াছেন, এখন কিন্তু তিনি সে বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান।

সমরেন্দ্র :—তুমি মানুষের মন্দ দিকটা অত বেশী দেখ কেন, কুমুদ, তুমি কেন মনে কর, যে পিতার মৃত্যু হইলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বা ন্যাসরক্ষক তাহা আত্মসাৎ করিবে, আর নাবালক পুত্রকে মানুষ করিবে না। কতকগুলি লোক খারাপ হইতে পারে সকলে ত তাহা নয়; তুমি ত রামায়ণ পড়িয়াছ দশরথের কথা ভুলিয়া যাইতেছ কেন? অজ রাজা ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ভানুমতী যখন রাজা দশরথকে এক বৎসরের রাখিয়া ইন্দ্রধামে গমন করিলেন তখন কি বশিষ্ঠ মুনি

দশরথ রাজাকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দেন নাই? না রাজা দশরথ প্রকৃত শিক্ষা পান নাই। ভগবানের রাজ্যে অনাথ বালককে মানুষ করেন ভগবান নিজ।

কুমুদিনী :—হরি হরি তুমি এখনও ত্রেতাযুগের স্বপ্ন দেখিতেছ! এখন আর "সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই" ভুল না, এখন যে ঘোর কলি-কাল। এখন ধর্ম্ম প্রায় মৃতকল্প, অধর্ম্ম বিশেষ বলীয়ান্, এখন গড়ে শতকরা ৫টী মাত্র ন্যায়বান, ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্ম্মিক পুরুষ পাইবে। এ অবস্থায় কে তাহার নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া, জীবদ্দশায় বন্ধুত্বের স্মৃতির অনুরোধে তোমার পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; যে ভাল লোক সে অত ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহিবে না বা প্রথমে রাজি হইলেও, পরে তোমার স্বার্থপর আত্মীয়ের রূঢ় কথায় সে কার্য্য করিতে অস্বীকার করিবে, আর যাহারা মন্দলোক, তাহারা তাহাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে কার্য্য করিবে; কিন্তু তাহাতে তোমার মঙ্গল কোথায়? তোমার অর্থ তছরুপাত করিয়া তাহারা নিজেদের আশু কল্যাণ করিবে।

সমরেন্দ্র :—তাহাতে কি তাহাদের নিজের কল্যাণ হইবে?

কুমুদিনী :—কখনই না; তবে কি জান, তাহারা মনে করে নিজ নিজ কল্যাণ করিতেছে। অধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া কখন মানুষের কল্যাণ হয় না; কিন্তু মনে থাকে শিক্ষার অভাবে প্রত্যেক মানুষ ভ্রান্তির দাস, ভ্রান্তি হেতু এরূপ করে, কিন্তু যখন ভুল বুঝিতে পারে, তখন অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছে, আর ফিরিবার উপায় নাই; তখনও ভগবানের উপর বিশ্বাস ভাসা ভাসা, নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতার উপরই বিশ্বাস বেশী, কাজেই ভ্রান্তিমূলক পথ হইতে ফিরিতে পারে না।

সমরেন্দ্র :—তুমি যা বল্‌ছ হয়ত তাহা সত্য, কিন্তু আমি এখন কিছুদিন রামের বিবাহ দিব না।

কুমুদিনী :—তুমি পুরুষ মানুষ তোমার বিদ্যাবুদ্ধি বেশী, যা ভাল বোঝ তাহাই করিও। কই রাম কোথায়? বোধ হয় তাহার বিবাহের কথা হইতেছে শুনিয়া অপর ঘরে গিয়াছে।

সমরেন্দ্র :—দেখ কুমুদ, আমি অনেক সময় ভাবি যে আমাদের বিবাহ প্রথা ভাল না পাশ্চাত্য প্রথা ভাল; প্রাচ্য ভাল, না প্রতীচ্য ভাল; মাতাপিতা পছন্দ করিয়া আমাদের বিবাহ দেন আমরা বেশ সুখেই জীবন যাপন করি, অন্ততঃ আমাদের বিবাহিত জীবনে অসুখী দম্পতীর সংখ্যা অনেক কম। যে দেশে বয়স্থা কন্যা, দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া বিবাহ করেন, সেখানে বিবাহচ্ছেদের সংখ্যা অনেক বেশী; অসুখী দম্পতীর সংখ্যাও অনেক।

কুমুদিনী :—আমি অত শত বুঝি না, আমি ছেলেদের বধূ নিজে পছন্দ করিয়া আনিব সে বিষয়ে ছেলেদের কোন মত লইব না।

সমরেন্দ্র :—তুমি দেখ্ছি নিতান্ত সেকেলে ধরণের মেয়ে মানুষ, সব বিষয়ে তোমার নিজের হুকুম।

কুমুদিনী :—পুরাতন সব ভাল, পুরাণো চাল ভাতে বাড়ে, পুরাণো তেঁতুল উপকারী, পুরাণো ঘি খুব ভাল ঔষধ, পুরাণো চাকর বিশেষ উপকারী।

সমরেন্দ্র :—আর পুরাণো কর্ত্তা গিন্নী?

কুমুদিনী :—নিশ্চয়ই ভাল, নিশ্চয়ই ভাল, নিশ্চয়ই ভাল, তোমার চেয়ে আমার পক্ষে ভাল আর কে আছে?

সমরেন্দ্র :—আর তুমি না থাকলে একদিনও আমার সংসার চলে না, তুমি আমার সব, তুমি না থাকলে আমি একাভেকা।

কুমুদিনী :—আমার দাম শূন্যি, তুমি একাই একশ, তুমি এক আছ বলেই আমি এখন লক্ষ।

মাতাপিতা তাহার বিবাহের কথা কহিতেছেন, লজ্জায় রাম তাহার

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে ঘরে বসেন, সেইখানে গিয়া দেখিল দাদা বসিয়া পড়িতেছে, রামকে দেখিয়া কালীকৃষ্ণ তাহাকে বসিতে বলিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলে রাম। রাম দাদাকে প্রণাম করিয়া বলিল এইমাত্র আসিতেছি পরে তাঁহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল, দাদাও কেমন পড়াশুনা হইতেছে, সে বিষয়ে খবর লইল। কালীকৃষ্ণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বলিলেন, রাম শুনেছ আজ কয়েকদিন হইল সজনী বাবুর স্ত্রী তোমার বিবাহের কথা কহিতে আসিয়াছিলেন। মা বলিয়াছেন তোমার বিবাহ এখন দেবেন না অন্ততঃ তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বে নয়; রাম বলিল দাদা, মা ঠিক কথাই বলিয়াছেন, বিবাহ হাসি ঠাট্টার কথা নয়, ইহাতে অনেক দায়িত্ব আছে, আমরা এখনও মানুষ হইবার জন্য পিতার অর্জ্জনেরই উপর নির্ভর করিতেছি। তিনি একা আমাদের সকলকার রক্ষা ও শিক্ষার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের কি উচিত তাঁহার উপর আরো ভার চাপান দেওয়া; তোমার যে বিবাহ হইয়াছে, তাহার অনেক কারণ ছিল, প্রথম তুমি মাতাপিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বধূদিদি আসিয়া মাতার ডান হাত হইয়াছেন। তাঁহার সাংসারিক কার্য্যে বধূদিদি বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। বধূদিদি আসিয়া মাতার ও পিতার সেবারও অনেক সুবিধা হইয়াছে, আমাদের সংসারে এখন দ্বিতীয় বধূর প্রয়োজন দেখি না; বিশেষতঃ বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত অন্যরূপ। আমার মতে মানুষ যতদিন না তাহার সন্তান সন্ততিকে সুখে ভরণপোষণ ও শিক্ষা দান করিতে পারে, ততদিন তাহার বিবাহে অধিকার নাই।

কালীকৃষ্ণ:—সত্য বটে, তবে কি জান যখন মাতাপিতা আমার বিবাহ দিলেন, আমার কিছু বলিবার রহিল না, আমি তাহাদের হুকুম পালন করিয়াছি মাত্র।

রাম ঃ—দাদা তোমার কথা আলাহিদা ; পূর্ব্বেই বলিয়াছি তুমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমার বধূ আসিয়া মাতার সঙ্গিনী ও সহায়তাকারিণী হইবেন। আমাদের সংসারে অপর স্ত্রীলোক নাই, কাজেই একজনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল তবে দ্বিতীয় বধূর কথা অন্যরূপ ; তাহার প্রয়োজন আমাদের সংসারে আপাততঃ নাই। দেখ দাদা, বিবাহের সম্বন্ধে এক নিয়ম সকল সময়ে হইতে পারে না, ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন নিয়ম ; অবস্থার বিভিন্নতা হিসাবে, কোন সময়ে একজন যুবা যতক্ষণ না উপায়ক্ষম হয় ততদিন তাহার বিবাহ করা উচিত নয় ; অপরপক্ষে যেখানে পিতার যথেষ্ট অর্থাগম অথবা সংসারে স্ত্রীলোকের অভাব সে অবস্থায় ১৭।১৮ বৎসরের বালকের বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে ; কারণ বধূ আসিয়া শিক্ষার কোন ব্যাঘাত করিতে পারে না, সে অবস্থায় বালককে উপায় করিয়া সংসার নির্ব্বাহের ভার বহন করিতে হয় না। আমার কথা স্বতন্ত্র ; পিতা অনেক যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, এ অবস্থায় আমার বিবাহ হইলে আবার তাঁহার স্কন্ধে নূতন ভার পড়িবে ; তাহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়, তাহাতে আমার শিক্ষার বিশেষ প্রতিবন্ধকও হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার উপর যুবকের নিজের প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর নির্ভর করে। আমি অর্দ্ধাঙ্গিনীর জন্য একেবারেই ব্যস্ত নহি ; আমার প্রয়োজনও নাই। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ দিবার ক্ষমতার মাত্রা আমার এত বেশী নয় যে লেখাপড়ার উপর দিয়া আবার অন্য বিষয়ে দিতে পারি, বিবাহ করিলে কতকটা সময় সহধর্ম্মিণীর জন্য যাইবেই যাইবে এ অবস্থায় আমি বিবাহ করিতে রাজি নহি।

কালীকৃষ্ণ।—রাম, আমি তোমার এ কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, তুমি বিবাহ করিলে কতকটা সময় তাহার জন্য

যাইবে এর মানে কি ? সে সংসারে আসিয়া মাতাপিতা ও আমাদের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত থাকিবে, মাতাপিতা তাহার অভাব অভিযোগের নজর রাখিলেন, তোমার সময় যাইবে কেন ?

রাম।—দাদা বিবাহের কথা ভাবিতেও আমার একটা আতঙ্ক হয় ; বিবাহিতা স্ত্রী ত কলের পুতুল নয়। তাহারও ত মনোবৃত্তি ত আছে শুধু তাকে খেতে পরতে দিলেই চলিবে না, তাহার মনোবৃত্তির বিকাশের জন্য কতকটা সুবিধা দিতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে, ঠিক পথে লইয়া যাইতে হইবে ; সে কার্য্যের জন্য অধিক পরিমাণে দায়ী স্বামী। আমারই এখন সম্পূর্ণরূপে চরিত্র গঠন হয় নাই, কেমন করিয়া আমি তাহার চরিত্র গঠন করিব। অন্ধকে অন্ধ পথ দেখাইয়া লইয়া গেলে দুজনেই গর্ত্তে পড়িবে ; স্বামী হওয়া বড় সোজা, সহজে কিছু অর্থাগমও হয়। কিন্তু স্বামিত্বের দায়িত্বের কথা ত ভাবিবার বিষয়। স্বামিত্বের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে পিতার দায়িত্ব আসিয়া তোমার দরজায় ধাক্কা মারিবে, তখন তোমার উপায় ! বর্ষার বন্যার ন্যায় পুত্র কন্যা আমদানি তাহাদের লইয়া পিতা ব্যতিব্যস্ত। তাহার নিজের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই বা হয় কেমন করিয়া ? আর জীবনের স্ফূর্ত্তি বা হয় কোথা থেকে ? উন্নতিই বা হয় কেমন করিয়া ? তবে যার ঘাড় খুব শক্ত, যাহার খুঁটীর জোর আছে কেবল সে এইরূপ ঝঞ্ঝাবাতে তিষ্ঠিতে পারিবে।

কালীকৃষ্ণ :—বিবাহের পর পিতৃত্বের দায়িত্ব ত আসিবেই, তবে কি জান। যদি বিবাহ না করিয়া চরিত্রবান্ না থাকিতে পারে, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

রাম :—দাদা তুমি হাসির কথা বলিলে আমার বয়স অল্প, চরিত্রবান থাকাই সাধারণ নিয়ম, যদি অল্প বয়সে সেই চরিত্র হারাই, তাহা কেবল সঙ্গদোষে : আর কতকগুলি ছাইপাঁশ ধর্ম্মহীন বাজে নাটক নভেল পড়ে।

পিতার আর তোমার আশীর্ব্বাদে অনেক অসৎচরিত্র বালকের সহিত এক শ্রেণীতে বসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু তাহাদের কাহারও ফাঁদে পড়ি নাই। এতদিন আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছি এখনও বোধ হয় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব। সেই জন্য আমি বলি যখন পিতৃত্বের দায়িত্ব বহন করিবার ক্ষমতা হইবে তখন মনুষ্যের বিবাহ করা কর্ত্তব্য, তাহার পূর্ব্বে নয়।

মা :—ওরে কালী, ওরে রাম, আয় তোরা খাবি আয় খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে।

কালীকৃষ্ণ :—চল মা চল। আমি রামকে তাহার বিবাহের কথা বলিতেছিলাম, যাহা বুঝিলাম তাহাতে এ অবস্থায় সে বিবাহ করিতে নারাজ।

মা :—আমার মতে তাহার কথা ঠিক, তবে "এটো খায় মেটোর লোভে" যদি মোটা রকম যৌতুক পাই আর বউটীও সুরূপা ও সুলক্ষণা হয় তবে সে আলাহিদা কথা। তা নহিলে এখন বিবাহ স্থগিত থাকিবে, রামের লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলে রূপসী ও লক্ষণযুক্তা বধূ রাঙ্গা সূতা ও চেলীর শাড়ী পরাইয়া লইয়া আসিব। যৌতুকের দিকে লক্ষ্য করিব না। আসল কথাটা হচ্চে আমি বধূমাতাকে ঘরওয়ানা ঘর হইতে লইয়া আসিব। নিজের সময় হইলে মোটা যৌতুক চাহি না, অসময়ে ভাল যৌতুক চাই ; আয় বাবা তোরা খেসে আয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধু সম্ভাষণ

রাজীবলোচন ঃ—তা যা বল, যা কও বাবা, আমি জোর গলায় বল্‌ব "সঙ্গ দোষেই গ্রাম নষ্ট" ছেলে বখে, কেবল সঙ্গদোষে, ছেলেবেলায় সে অতি পবিত্রমনা, অতি নিষ্ঠাবান্ অতিশয় সরল থাকে। সৎসঙ্গ দাও সে দেবতা হবে, সঙ্গী খারাপ হলেই সে দানব হবে, সঙ্গীর দোষগুণেই মানুষ দেবতাও হয়, দানবও হয়। এ শালা বদ্‌সঙ্গী, যেন হাওয়ার ন্যায় তোমার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্চে। ছেলেমানুষ কোমল প্রাণ, বদসঙ্গী ফিস্ ফিস্ করে দুটো ফোসলান কথা বলিল, অমনি নির্ম্মল নিষ্পাপ হৃদয়ে দাগ বসিতে আরম্ভ হইল। ক্রমে দাগের পর দাগ, তার পর দাগ, এইরূপে সেই পূর্ব্বেকার নির্ম্মল নিষ্পাপ প্রাণ দেগো হয়ে গেল। মাতা-পিতা অধিকাংশ সময়েই ইহার খবর পান না, যখন পেলেন তখন হয়ত দাগ বেশী বসেনি, ছেলেকে ফেরাতে পাল্লেন, তবে অধিকাংশ সময়েই দাগ এত বেশী করিয়া বসিয়া গেছে, ছেলে তখন দেগো কিম্বা দাগী হয়ে গেছে। মা বাপ পারেন ত সামলান, ছেলেদের বদসঙ্গীর কাছ থেকে দূরে রাখুন। লেখাপড়া শেখাতে পারেন ত ভালই, কম পারেন কম ভাল, একেবারেই না পারেন তা'তেও তত ক্ষতি নাই। তবে এইটী করুন অসৎসঙ্গ হইতে রক্ষা করুন।

শ্যামলাল ঃ—কিরে লোচন তোকে বেদীতে বসিয়ে দিলেই হয়, মুখে খই ফুটছে, তুবড়ীর ফোয়ারা বেরুচ্চে, শালা সঙ্গীর উপর এত চটা কেন? সঙ্গী ছিল বলেই ত মানুষ হয়েছিস্।

রাজীবলোচন ঃ—কি বাবা তোমাদের অভিধানে 'মানুষ' মানে কি 'ভূত', তা যদি হয় তবে তোমার কথা সত্যি।

শ্যামলাল ঃ—বেটা আমাদের সঙ্গে মিশে ত মানুষ হলি, এসেছিলি ত, বেটা, ফরিদপুরে বাঙ্গাল, নাক দিয়ে পোঁটা পড়্ত; না পারতিস্ ভাল করে জামা গায়ে দিতে, না জান্তিস্ মাথার চুল আঁচড়াতে; মাথার চুল যেন শুয়ারের কুঁচী, চিরুনি বা বুরুষের দাগ বসত না, সদাই প্যান্-প্যান্ ভ্যান্-ভ্যান্ করতিস্; থাকবার মধ্যে বাপের বেলেঘাটায় একটা চালের গদি, বুড়োর পয়সাও কিছু ছিল; হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হলি আমরা তখন বাবুর বেঞ্চের বাবুরা। দেখেই বুঝলাম তুই আমাদের একটী সুখাদ্য পুলিপিটে, তোর সঙ্গে আলাপ করলাম, তোকে আমাদের বেঞ্চে আশ্রয় দিলাম, তোকে দয়া করে আমাদের কাপ্তেন করলাম। তখন তোর কোন গুণই ছিল না, খালি থাক্‌বার মধ্যে ছিল বাপের কিছু টাকা। আমাদের কথামত সেই টাকা তুই এনে দিতিস। মনে পড়ে বেটা, খুড়ো, তুমি নির্গুণ হ'লেও তোমার বাবার টাকার খাতিরে তোমাকে আমাদের দলের কাপ্তেন করলাম। তুই বেটা জীবনে ফুটবল খেল্‌তে জানতিস্ না, বল্‌তিস পা ভেঙ্গে যাবে, হাত ভেঙ্গে যাবে, তা সত্ত্বেও অন্য সব ক্লাসের ছেলেদের উপর জোরজবরদস্তি করে তোকে আমাদের ফুটবল ক্লাবের কাপ্তেন করলাম। তুই বেটা ভাল করে কথা উচ্চারণ করতে পারতিস্ না, তোকে আমাদের ড্রামাটিক ক্লাবের সেক্রেটারী করলাম, তুই বেটা দু' লাইন লিখতে পারতিস্ না, তোর বাবার চাল বেচা পয়সার খাতিরে তোকে স্কুল ম্যাগাজিনের এডিটর করলাম, তো বেটাকে ভাল করে কাপড়-চোপড় পরাতে শেখালাম, ভাল করে মাথা আঁচড়াতে শেখালাম, তো বেটার টেরি আমাদের চেয়ে ভাল হয়ে দাঁড়াল, বেটা বেঁকে দাঁড়াতে শিখলি। ছড়ী ধর্‌তে শিখলি সিগারেট খেতে শিখলি, গলায়

টাই বাঁধতে শিখলি, হট্ হট্ হন্ হন্ করে চলতে শিখলি। বেটা তুই আমাদের দলে গোটাকতক টাকা খরচ করেছিস্ সত্য, কিন্তু তাহার বদলে আমাদের কাছ থেকে যা কিছু শেখ্‌বার ছিল, তোকে সব শিখিয়ে দিয়েছি, তাতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করিনি; আর তোকে যখন ছেলেবেলায় পেয়েছি, তখন থেকে ছাড়িনি, জোঁকের মতন তোকে ধরে আছি; দেখ্ বেটা খুড়ো, তোর এখন আর রক্ত নাই, তবু তোকে এখনও ছাড়ি নাই। আমরা নিমকহারাম নইরে বেটা, আমরা নিমকহারাম নই; নিমকহারাম হলে তো বেটার রক্ত চুষে ছেড়ে দিতুম। আমরা তা করিনি, কি বল হট্টেশ্বর?

হট্টেশ্বর :—বাবা "দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেম পিপাসা"। আমরা নিয়েছি দিয়েছি বদল পেয়েছি কিন্তু প্রেমপিপাসা ফুরায় নাই। সব যাবে আমাদের নিঃস্বার্থ প্রেম থেকে যাবে। বাবা মিছে বদনাম করো না, এই দেখ না তরঙ্গিণীর কথা; আমরাই তার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিই, তুমি তার সঙ্গে ১৪ বৎসর বনবাসে রইলে, থুরি, সুখে কাটালে, সত্যি তাকে কতকগুলা টাকা দিয়াছ, সে কি বাবা তোমাকে কিছু দেয় নাই? সে তোমাকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য সময়ে সময়ে রূপ দিয়েছে, যৌবন দিয়েছে, স্ফূর্তি দিয়েছে।

রসময় :—বলে যাও, বাবা, বলে যাও, হুইস্‌কি হজম করতে শিখিয়েছে, তবলায় চাটি দিতে শিখিয়েছে এখন ভাল তবলজিও তোমার কাছে লাগে না, বলে যাও।

শ্যামলাল :—বাবা, বলে যাও আরাম দিয়েছে, বেয়ারাম দিয়েছে, ইন্‌সল্‌ভেন্সি দিয়েছে, দরিদ্রতা দিয়েছে বলে যাও।

হট্টেশ্বর :—দূর বেটা ছুঁচো, দূর; টাকাটাই কি এত হ'ল।

শ্যামলাল :—না বাবা ও কিছু নয় ও উনানের ছাই ও ধূলামুষ্টি মাত্র শাস্ত্রে বলে—টাকা হাতের ময়লা। রেঙ্গো ব্যাটা টাকা দিয়েছে, তার বদলে কত শিক্ষা পেয়েছে, বেটা ছিল রেঙ্গো বাঙ্গাল, এখনু হয়েছে মিঃ রাজীবলোচন আর তরঙ্গিণী ওকে পাকা বাবু করে তোলে. তার পর যেমন টেপীর হাতে পড়া অমনি কোট পেণ্টালুন নেকটাই এঁটে একেবারে মিঃ ঢোল।

হট্টেশ্বর :—শুধু ঢোল, ঢাক, কাঁসি, শানাই।

শ্যামলাল :—বলে যাও বাবা বলে যাও তার পর ডান্স শেখা, বেয়ার ডান্স, রাসিয়ান ডান্স, মন্‌কি ডান্স, ডন্‌কি ডান্স, বাকি রইল কি বাবা ?

হতিস :—বাবা সঙ্গের এমনি গুণ, ছেলেবেলা সাত চড়ে আমার রা বেরুত না, এখন আমি রে-রে-রে ডাক ছাড়ি, টে-রে-কাটা টে-রে-কাটা আমার হাতের বোল, মুখের ত কথাই নাই, দরবার হলে দশটা স্বদেশী বক্তৃতা দিতে পারি, আর দিয়েও থাকি।

হট্টেশ্বর :—ও একটা মন্দ ফন্দি নয় ছেলে বেলা থেকে ছেলে বখিয়ে বেড়ালাম। নিজেত বখাটের চূড়ামণি এখন কিন্তু বাবা আমাদের দলে ভেড়াবার জন্য কত বেটা থার্ডক্লাশ দেশহিতৈষী খোষামোদ করে বেড়ায়।

শ্যামলাল :—বাবা, একেই বলে, আমাদের একটা জন্মগত অধিকার, জন্মগত স্বত্ব ত আছে ঐ যাহাকে সিধে ভাষায় 'বার্থ রাইট' বলে অর্থাৎ "মানুষ হয়ে জন্মেছ যাহা ইচ্ছা করতে পার, তাহাতে বাবাবেটাদের কিছু বলবার অধিকার নাই ;" তুমিও মানুষ তোমার বাবা বেটাও মানুষ। তাহার কি অধিকার আছে, তোমার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে ? তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ তুমি যাহা ইচ্ছা করতে পার।

হতিস :—সেই জন্যই বাবা এই অবস্থায় এসে পৌছিয়াছি, এখন বাপেরও নই শ্বশুরেরও নই এখন সাধারণের।

হট্টেশ্বর :—বাবা আমারও একটা ভোট, আমার ঠাকুরদাদা তেজচন্দ্রেরও একটা ভোট; আর তেজচন্দ্রের কোচমানেরও একটা ভোট। বেঁচে থাক আমার উন্নতিশীল দল আমার দেশটা যদি আমেরিকা হত, তাহলে বাবা পুলিস কমিশনারের বাছাইএর সময় ভোট দেবার আগে সর্ত্ত করে নিতাম যে মাতলামি করলে পুলিশ আমায় ধরবে না।

শ্যামলাল :—তুই বেটা প্যাঁচি মাতাল; ও ছোট কথায় নজর দিস্ কেন? মদ খাবি বাগান পার্টিতে, তা রাস্তায় মাতলামি করবি কেন? ও ত ছোটলোকেই অমন করে।

হতিস :—রাজুদা, কি ভুল করেই এই ভূতের দলে মিশে ছিলে, ইহকাল পরকাল দুকালই গেল।

হট্টেশ্বর :—দূর বেটা ইহকালে আমরা যা মজাটা করলাম, আর দেখলাম, তা ক বেটা কেষ্ট বেষ্টো করেছে? বেটারা কেষ্ট বেষ্টো হয়? আর লুকিয়ে লুকিয়ে বাগান পার্টি করে, সমাজের তাহারা আদর্শ। আমরা বেটারাও সেই স্ফূর্ত্তি করি তবে আমাদের কেহ আদর্শ বলে না, বেটা আঙ্গকার দিনে সব ভণ্ডামি, সব পর্দ্দার আড়ালে কেবল কুত্তার নাচ, শিক্ষায় ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই, তাই ফলও সেইরূপ, বাবা, বাঙ্গালায় "সেণ্টাল মিডি" বৎসরে কত বিক্রী হয় জান।

হতিস :—আমার বাবা মনে হয়, এ সহরে কত সভাসমিতি আছে গোশালা, ঘোড়াশালা, পাঠশালা কত শালা আছে; যদি একটা "নিরীহ বালক রক্ষক সভা" হয় ত আমি সেই সভার সভ্য হয়ে দুগ্ধপোষ্য বালকদের এই ছেলে ধরাদের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি। এই নিরীহ বালকদের রক্ষা করতে পার্লে সমাজের যে কত উপকার হয়

তাঁহার আর ইয়ত্তা নাই। মনের শান্তি হয়, সমাজের উপকার হয়, আর ভগবানের রাজত্বে এ যে সব উই পোকা ধরেছে সে গুলির নাশ হয়।

রাজীবলোচন :—হতিস, তুই লাক কথার এক কথা বলিছিস্। আমি অনেক দিন থেকে ঐ রকম একটা চিন্তা করছিলাম। ঐরূপ একটা চেষ্টা চরিত্র করতে পারলে, সমাজের প্রভূত উপকার হয়। তবে কি জান সমাজ আমাদের মত হতচ্ছাড়াদের কথা শুনবে কেন? একটা নাম জেয়াদা নেতা ফেতা যোগাড় করতে পারলে হয়।

হতিস :—বাবা, তোমরা যদি টাকা তুলতে পার, আমি আমাদের পাড়ার উড্ডীয়মান উকীলকে তোমাদের দলে চাঁই করে দিতে পারি।

রাজীবলোচন :—হতিস, তুই বড়ই ভুল করেছিস্। আমাদের বোকামি ও দুষ্ট বুদ্ধিই তাহাদের রুটি, তারা কি তা ছেড়ে আমাদের মত বেল্লাল্লাদের শোধরাতে আস্‌বে।

রামময় :—আমাদের আর শোধরায় কে? আমরা ত শোধরাবার বহুদূর বাহিরে এসে পড়েছি, জীবনে ভাল অংশ শেষ করে এনেছি, আছে কেবল এখন অনুতাপের দিন। ভালর দিকে ইচ্ছা থাকলেও শরীর অপটু ; শরীরের বা দোষটা কি, যে অত্যাচার ইহার উপর হয়েছে "লোহা হলে গলে যেত," তবে কথা বালকদের জন্য।

হট্টেশ্বর :—তা দুপয়সা পেলে ধর্ম্মের ভাণ করবার লোক আমাদের দেশে অনেক পাবে, দুপয়সা রোজকার, তার সঙ্গে সঙ্গে ৩নং সমাজ সংস্কারক বলে খ্যাতি এতে অনেক পাখীর ডানা আটাকাটীতে আটকাতে পার।

শ্যামলাল :—ঠিক বলেছিস্ হটুডিয়ার তুমি বাবা হট্টবার ছেলে নও, তোমার নামটী অপনাম নয় এই দেখনা নরী যখন ষ্টেজে নেমে বেশ্যাবৃত্তির

বিপক্ষে বক্তৃতা করে, তখন মনে হয় তার সাত পুরুষে (অবশ্য তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ মাতৃগত) কেহ কখন বেশ্যা ছিল না ; যদিও তাহার কখনও ভুলক্রমে পদস্খলন হইয়া থাকে তাহার জন্য সে বিশেষ অনুতপ্তা কিন্তু ষ্টেজ থেকে গ্রিণ রূমে যেতে না যেতেই মুখের রং পৌছার পূর্ব্বেই হুইস্কি পেগ চাইই আর ইয়ারটীকেও চাই।

রাজীবলোচন ঃ—তা যা বল ভাই আমার জীবনটাত মরুভূমি, শান্তি সুধা প্রাপ্তির ত কোন সম্ভাবনা নাই। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি আর ভদ্রবংশেই জন্মেছি (তাহার ত আর কোন সন্দেহ নাই) আমি নিজেই না হয় ওলাক্ষেণে উন্‌পাজুরে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ত সব সাধু পুরুষ, একবার চেষ্টা চরিত্র করে দেখ্‌ব, যদি পাঁচ দশটা লোককে সৎপথে ফেরাতে পারি, তা হলে জীবনে কতকটা শান্তি পাব, এ বেটারা এ সব কাজে, কেউ হাত দেবে না। কে আর যে গাছে বস্‌বে, সেই গাছ কাটবে! কিন্তু আমি বাবা একবার দেখব পারি কি হারি। হতিস্ এদলের মধ্যে থেকে তুই আমার সঙ্গে এ কাজে লাগতে পারবি, তোর লাগবার মতন ধরণ ধারণ আছে, কি বলিস্ ?

শ্যামলাল ঃ—আরে শুনেছিস্ সমরেন্দ্র ঘোষের বেটা রাম ঘোষ, যে ইনজিনিয়ারিং কলেজে পড়ত, সে একবারে তলিয়ে গেছে, ছোঁড়াটা ছেলে বেলায় খুব ভাল ছিল বখামির নাম গন্ধ জানত না, সে এখন পদীর প্রেমে হাবু ডুবু, আহা ডবকা ছোঁড়া বছর ২৩।২৪ বৎসর বয়স খুবলালের পাল্লায় পড়ে একেবারে তার দফা রফা, ছোঁড়াটা একেবারে অধঃপাতে গেছে।

রামময় ঃ—খুবলাল বেটা অতি পেঁচি, অতি পাজি ; বেটা গরীবের ছেলে ধরলে কেন ? ছুঁচ মেরে হাতে গন্ধ কেন বাপু। সে গৃহস্থের ছেলে ছাপোষা লোকের ছেলে তাকে ধরলি কেন ?

হট্টেশ্বর ঃ—ধরলে কি সাধ করে, নিজের জান বাঁচাতে, বাবা নিজের জান বাঁচাতে ; "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" 'যোগ্যের জয়'।

রামময় ঃ—নে বেটা তোর হেঁয়ালী ছাড় কথাটা খুলেই বল।

হট্টেশ্বর ঃ—কথাটা হচ্ছে এই খুবলাল পদীটাকে অনেক দিন থেকে রেখেছিল। মা, সরস্বতী তাহাকে অনেক দিনই ত্যাজ্য পুত্র করেছিলেন ; তাহার জন্মদাতা পিতা, শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে তাহাকে ছেড়ে চলে গেলেন। কয়েক বৎসর বাদ তাহার বিমাতা লক্ষ্মীদেবীও তাহাকে পরিত্যাগ করলেন। তাহার পর পদীর মা ঝেঁটা ধরল। পদীর বাটীতে তিষ্ঠান তার দায় হয়ে উঠল, অথচ অন্য অবলম্বন সমস্তই একে একে ছেড়ে গেছে, যদিও সরস্বতী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীমন্ত পিতা স্বত্ব ত্যাগ করল, মায়াবী দয়ালু ষষ্ঠীদেবী তাহাকে ত্যাগ করল না। ক্রমে বাপের ও সাধারণের চুরি চামারি করিয়া যাহা কিছু ছিল সব পদীর গর্ভে অন্তর্হিত হইল, আর সেই গর্ভ হইতে বহির্গত হইল তিনটী পুত্র কন্যা। খুবলালের সব গেল, কেবল পদীর মার পদীর ও তাহার পুত্রকন্যার মুখ, জিব আর উদরগুলি রহিয়া গেল, কাজেই এই পঞ্চপাণ্ডবের তাড়নায় দুঃশাসন খুবলাল ত্রাহি মধুসূদন ডাক ডাকিয়া পশ্চাৎপদ হইবার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইলেন। অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া কাহাকেও না পাকড়াইতে পারিয়া শেষ গরীব রামলালের উপর নজর পড়িল। পদীর মা খেঁদী পাজি বেটীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপন হইল, সেই সন্ধির ফন্দি বলে রামের পূর্ব্ব সুনামের লোপ, আর তাহাকে ভেড়া বানাইয়া পদীর পাঁকে পোতা। রাম এখন একেবারে তিন সন্তানের বাপ আর পদীর বাবু। কলেজের ক্লাস হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ, বাপের কাছে ভাণ স্বাস্থ্যভঙ্গ। এই অবস্থায় সে জীবনরণে ভঙ্গ দিয়া যাত্রাদলের কাটা সৈন্যের ন্যায় পদীর ঘরে ঘুমাইতে আরম্ভ করিল ; আর

খুবলাল এখন পদী বেটীর বাজার হাট করে, ছেলে বয়, আর পদীর মা খেঁদীর পা টেপে। বাবা নাচারে পড়ে সে রামকে বধ করিল, স্বেচ্ছায় নয়, আমি অনেকবার বারণ করেছিলাম, সে বলে সে রামকে ছাড়তে রাজি আছে, তবে আমি যদি তার একটা কোন উপায় করে দিই। তা বাবা "আমি খাই ঘাটে জল সে খায় মাঠে" আমি তার কি উপায় করব? আমার উপায় কে করে, ভায়া যে আমি তার উপায় করব?

রাজীবলোচন :—এ সব জেনে শুনে তুই ঐ ভদ্রলোকের ছেলের মাথাটা খেতে দিলি? তুই খুবলালকে বারণ করলি না কেন?

হট্টেশ্বর :—অনেক বলেছিলাম বাবা তাহাতে খুবলাল বল্‌লে উপায়ান্তর নেই। সে বল্‌লে 'আমিও ভদ্রঘরে জন্মেছিলাম, আমার সর্ব্বনাশ করলে আর একটী ভদ্রঘরের অপগণ্ড। আমিও পূর্ব্বতন প্রথা অনুসারে নিরীহ ভদ্রলোকের সন্তানের সর্ব্বনাশ করিয়া আপাততঃ নিজের একটু সুবিধা করিয়া লইলাম। যাহা অপরের কাছে শিখিয়াছি, সে শিক্ষা তৃতীয়ের উপর প্রয়োগ করিলাম। এ ত হিসাব শোধ বাবা, এ ত কেবল হিসাব শোধ।

রামময়। শুন্‌বে রাজু, ছেলেটাকে ধরলে কেমন ক'রে। ছেলেটা শঠতার কিছুই জানেনা ও জাতের ভাল কিছুই বোঝে না। তিন ছেলের মা পদীটাকে বেশ ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে, ভাল জমকাল রকম পোষাক পরিয়ে, হাতে একখান বই দিয়ে শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদের মতন সাজিয়ে, বন্ধুর এক মোটরগাড়ি জোগাড় ক'রে, গড়ের মাঠের ষ্ট্রাণ্ডরোডে নিয়ে গিয়ে হাজির। জোগাড় যন্ত্র ক'রে রামের এক পাড়ার ছোঁড়াকে দিয়ে রামকে সেইখানে হাওয়া খেতে নিয়ে যায়। বেড়াইতে বেড়াইতে ছুঁড়ীটার সঙ্গে প্রত্যহ দেখা হয়, আর মায়াবিনী তাহাকে দেখে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে। শেষে একদিন হঠাৎ তার ফিট্ হ'য়ে গেল।

মোটর থাম্‌লো। দু'চার জন লোক জমে গেল। খুবলাল পদীকে নিয়ে গঙ্গার ধারের বেঞ্চে শুইয়ে দিলে ; তাহার সঙ্গীর প্ররোচনায় রাম নাইট এরাণ্ট হ'য়ে দুঃস্থা রমণীর সাহায্যে গেল। রমণী তাহার সম্ভাষণে বিশেষ সন্তুষ্টা, মাথায় হাত বুলাইতে বলিল। সঙ্গীর ইসারায় আর রমণীর সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় তাহার কপালে হাত দিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের সর্ব্বনাশ করিল। পূর্ব্বে কখন অপর যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গে হাত দেয় নাই। শরীর দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক স্রোত চলে গেল। তাহার কোমল হস্তস্পর্শে যুবতী অনেক সুস্থা বোধ করিল। তাহার পর আলাপ। বৈকালে রেষ্টুরেণ্টে একত্রে সান্ধ্যমিলন, তৎপরে বায়োস্কোপ দর্শন, রাত্রে বিখ্যাত ইম্পিরিয়্যাল হোটেলে একত্রে রসনানন্দ ভোজন, ভোজনান্তে মোটরে বায়ুসেবন। কিছুদিন এইরূপে চলিলে পর, রামের পতন ও মৃত্যু।

এই কয়দিন একত্র মিলনের খরচার অনেকটাই খুবলালকে ধার কর্জ্জ করিয়া চালাইতে হইয়াছিল, তারপর কার্য্যসিদ্ধি।

রাজীবলোচন। আরে খুবলাল বেটা একেবারে ছেলেধরা। আমি তাইত ভাবছিলাম ছেলেটাকে ধর্‌লে কিরূপে।

রামময়। যেরূপ ষড়্‌যন্ত্র ও জোগাড় যন্ত্র, তাতে ছেলে ত ছেলে, ছেলের বাবা শুদ্ধ বধ হ'য়ে যায়।

রাজীবলোচন ঃ—চল হট্টেশ্বর, এই পাজি বেটীর আস্তানায় ঘুরে আসা যাক। দেখা যাক রামচন্দ্রের পাতাল দর্শনের খেলা কি রকম জমলো। চল হে হতিস্‌ তুমিও চল।

হট্টেশ্বর ঃ—চল হতিস্‌ পদীর বাটীতে পায়ের ধুলা দিয়া আসা যাক। পূজা আগত প্রায়, ধুলা কাজে লাগিবে।

হতিস্‌ ঃ—হটুর আমাদের ধর্ম্ম লইয়া ঠাট্টা। যার মানে বোঝ না,

সারবত্তা জান না, কারণ বোঝ না, তাহা নিয়ে ঠাট্টা কেন? যত ঠাট্টা বেওয়ারিশ হিন্দু ধর্ম্ম নিয়ে। কোনও মুসলমান তার ধর্ম্ম নিয়ে ও রকম ঠাট্টা করে না। চল যাওয়া যাক দেখা যাক মজাটা কি বাবা জমাট বেঁধেছে।

হট্টেশ্বর :—বাবা ঐ মজা দেখতে, রগড় দেখতেই ত প্রথমে লোক ওস্থানে যায়। কেহ পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়, কেহ পাঁকে বসে যায়। যাচ্ছ মজা দেখতে, শেষে যেন মজে যেওনা। ওত বাবা আগুন লয়ে খেলা, প্রায় পুড়ে মরে, কখন কখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

হট্টেশ্বর :—আমাদের আর পোড়বার বাকি কি? আমরা এখন ফায়ার প্রুফ। আর কেহ যাবে।

শ্যামলাল রামময় আর আর সকলে—না বাবা ও সব কাজে বাজে সময় নষ্ট করিব না আজ ঘোষ সাহেবের আস্তানায় মাইফেল, সেইখানে চল্লুম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকলহীন বন্ধন

রাজীবলোচন হতিস ও হট্টেশ্বর তিনজনে মিলিয়া মজ্‌লুমিয়ার আস্তাবলের পার্শ্বে, সরকারী পাইখানার সম্মুখে, মজলিস্ কুমারীর বাটীতে গিয়া উঠিলেন। বাটিটী ত্রিতল, গুণ্‌তিতে অনেকগুলি কামরা ; ত্রিতলায় অনেকগুলি টালি খোলার ঘর। ইহার কতকগুলি রসুইঘররূপে ব্যবহৃত হয় এবং বাকিগুলিতে সস্তা ভাড়ায় ভাড়াটিয়া থাকে। মজলিস্ কুমারী একজন নামজাদা বাড়ীওয়ালী। দেশ বিদেশের অনেক মান্যগণ্য লোক এই বাটীতে দিনেরেতে অনেক সময় কাটাইয়া গিয়াছেন। অনেক ভদ্রবংশের ধনী-সন্তান নিজেদের পৈতৃক সুরম্য-হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া দিবসের কতক সময় ও রাত্রের অনেক সময় এই বাটীতে অতিবাহিত করিতেছেন। এই বাটীতে কি মধু আছে তাহা বলা বড়ই কঠিন ; মধু আছে নিশ্চয় তাহা না হইলে, তাহাদের স্ব স্ব রাজপ্রাসাদের ন্যায় সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও তদনুযায়ী আসবাব পোষাক ছাড়িয়া, এই অজ পুতিগন্ধময় বাটীতে আসিয়া বাস করিবেন কেন? এখানে সমাজের, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অতি সামান্য ও নগণ্য লোকগণের সহিত সমান ভাবে মিলিত হইয়া সাম্যবাদের জয় ঘোষণা করেন। এখানে সব সমান। এক ঘরে অফিসের বড়বাবু, তাহার পার্শ্বের ঘরেই বাবুর পাড়ার বদ্ধ বকাটে ছোঁড়া, তাহার পার্শ্বেই উকীল প্রবর, তাহার পার্শ্বে নামজাদা ডাক্তার, তাহার পার্শ্বেই নামকাটা সিপাই কৌন্সিল প্রবর, তাহার পার্শ্বে পাড়া-গেঁয়ে জমীদার, তাহার পার্শ্বে কলেজের প্রফেসার, তাহার পার্শ্বেই কোম্পানীর কাগজের হাটের দালাল, তাহার পার্শ্বে বেলেঘাটার দালাল, সকলেই সাম্যবাদের

দোহাই দিয়া নিঃসঙ্কোচে এ বাটীতে বসবাস করিতেছেন, ইহাদের দেখিলেই মনে হয়, এত হরেক রকমের চিড়িয়া, এই এক খাঁচাতে বাস করিতেছে কেমন করিয়া ? এই স্থানের কি গুণ আছে! আর যে সব দুষ্টাসরস্বতী এই সব ঘরে বাস করে তাহারা পরিচয় দেয় তাহাদের নিজ নিজ বাবুদের বিবি বলিয়া। কেহ বসুদের বড়-বৌ, কেহ বাঁড়ুজ্যেদের ছোট-বৌ ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘরের সামনে বারন্দায় সারি সারি দাঁড় আছে, প্রত্যেক দাঁড়ে এক একটি মূল্যবান বা অমূল্যবান পক্ষী কোনটা ছোলা খাইতেছে, কোনটা ছাতু, কোনটা বা ফড়িঙ্গ কিরিং খাইতেছে, কেউ বা শিকলী দিয়ে বাঁধা, কোনটা পিঞ্জরে আবদ্ধ, কাহারও পলাইবার উপায় নাই। পাখীর অধিকারিণীরা অনেক পূর্ব্বে শিকল কাটিয়া এখানে আসিয়া আস্তানা পাইয়াছেন। আর এই বিবিদের বাবুরা, নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষের মানইজ্জতের শিকল কাটিয়া, পূর্ব্বমায়া ত্যাগ করিয়া, স্বেচ্ছায় বিনা শিকলে এখানে বাঁধা পড়িয়া আছেন। বাবু ও বিবিদের মধ্যে বাহ্যিক কোন ধাতুময় বা রজ্জুময় বন্ধন না থাকিলেও আন্তরিক অদৃশ্য বন্ধন খুব দৃঢ় ও শক্ত; প্রায়ই কাটে না, ছেঁড়ে না, অনড়, অটুট।

হট্টেশ্বর অন্ধকার সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চ্‌লাইট জ্বালিলেন। এবং উঠিতে উঠিতে ডাকিতে লাগিল খেঁদীবিবি কোথায় গো ? উপরে উঠিয়াই একজনা দেখেন, নথনাকে, গৌরবর্ণা. নাতিদীর্ঘা নাতি ক্ষুদ্রা, দেখতে মন্দ নয়, কাপড়ে চোপড়ে অঙ্গ বেশ ভাল করে ঢাকা, শরীরটা এক রকম সোণা ও জহরতে মোড়া, শরীরের অঙ্গ সৌষ্ঠবের চেয়ে, বসন ভূষণের সৌষ্ঠব ঢের বেশী, দেখিলেই বোধ হয় যেন ইনি কাপড় ও জহরতওয়ালাদের দর্শনডালী পুত্তলিকা। এক সময়ে হয় ত সুন্দরীই ছিলেন, এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

হট্টেশ্বর এই পোষাক জহরৎ সুশোভিনী রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই যে রেজিষ্টার মাসী কেমন আছ? রেজিষ্টার মেসোর খবর কি?

রেজিষ্টার মাসী :—কি হে হট্টেশ্বর বাবু, খবর কি? অনেক দিন দেখি নাই, তুমি এখন লুপ্ত অকারের স্থায় কখন দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য হও, ভাল আছ ত? সেদিন মেসো তোমার খোঁজ নিচ্ছেলো, বললে হট্টেশ্বর বাবু অনেক দিন এদিকে আসেন নাই।

হট্টেশ্বর :—মেসো এখন কোথায়? মন্দিরে আসেন নাই?

রেজিষ্টার মাসি :—ইস্! তা কি হবার যো আছে, আফিস থেকে বেরিয়ে দশমিনিটের মধ্যেই এখানে এসেছিলেন, তার পর এই খানিকক্ষণ হ'ল বাড়ী গেছেন; আজ তার ছেলের পাকা দেখা কিনা, বাটীতে না থাকলে দেখায় খারাপ, তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

হট্টেশ্বর :—মাসীর নতুন গয়না-টয়না হ'ল?

রেজিষ্টার মাসী :—দুর বাপু, গয়না পোষাক হয় কোথা থেকে? মোটে ত মাহিনা ১০০০৲ টাকা আজকাল আবার পাহাড়ে যান না। ভাতার হার কমে গেছে বলেন; নিজের সংসার খরচ আর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ বলে তা থেকে তাকে মাসে মাসে আড়াই শত টাকা দিতে হয়, তার উপর ইনকাম টেক্স, লাইফ্ইনসিওরেন্স সব বাদ দিয়া রহিল কি? রাত্রে এখানেই খান তারও খরচ আছে, বলি আজকাল আক্রাগণ্ডার দিনে থাকে কি? অনেক দিন থেকে তাহাকে বলছি এবার একটা বাড়ী কিনে দিতে হবে, তিনি রাজিও হয়েছেন, তবে কি জান, নেই ত কিছু, মাহিনাটাই সম্বল; পৈতৃক বসতবাটী তাহাও ছাপান্ন বখরা "চটকস্য মাংস" শুনতেই নাম ডাক এদিকে "লবডঙ্কা।"

হট্টেশ্বর :—মাসী সত্য কথা বলতে কি, তুমি নাকি খুব ভালমানুষের

মেয়ে, গোবেচারা তাই কোনরূপ টানাটানি নেই, যা দেয় তাতেই সন্তুষ্ট ; তা দেখনা তোমাকে যদি একটা ভাল বিলাতী হোটেলে রাখত তাহলে এ টাকাটা ত পেট ভাতার টাকা। থাকবার খাবার বিল দিতে আঁটে না। এই যে সার্জ্জেন টেপী যে? কেমন আছ? নমস্কার নমস্কার। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া হট্টেশ্বর এই নূতন অভিবাদন করিল সে একটী ফুট্‌ফুটে, কুঁড়িতে মোচড়ান, কৃষ্ণকলির ফুলের মতন, কতকটা সুখ্‌নো চিম্‌সে, আলতা দিয়া লাল রং ফলান, অল্পবয়স্কা, রসিকা ; নাম টেপী ; ক্ষুদ্রকায়া, সুখ্‌নো ঠক্‌ঠকে বলিয়া তাহার সার্জ্জন সাহেব তাহাকে "মাই লিটিল্ ডার্লিং" বলিয়া আদর করেন, তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যৌবনকাল কালধর্ম্মের অনুরোধে তাহাকে দখল করিতে আসিয়াছিল কিন্তু সেই সময়ের টেপীর বন্ধুরা তাহার সহিত লড়াই করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। তবে কালের স্বধর্ম্ম জোর জবরদস্তি করিয়া তাহার দখল বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল সেই জন্য এখনও তাহার দখলের কতক কতক ত্যক্ত চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। টেপী এখনও নাম জাদা ডাক্তারের ও তাহার আয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ডাক্তার বাবুর সরকারী চাকরী আছে, তাহা কেবল নামকাওয়াস্তে ; কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাকটিস খুব জোরেই চলেছে, তাহার ডাক্তারীতে বিশেষ পসার ; অনেক বাঁধা ঘর, সময় খুব কম, তবে যেটুকু সময় পান, তাহা এই টেপীর ঘরেই কাটে। অনেক ভদ্র পরিবারে হঠাৎ রাত্রে বেয়ারাম হইলে, এই টেপীর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গতি নাই। টেপী বলিয়া দিলে তবে ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে জান। সময়ে সময়ে টেপীকেও সিন্নি দিতে হয়।

সার্জ্জেন টেপী :—কি গো, হট্টেশ্বর দাদা যে, কি ভাগ্যি, পথ ভুলে নাকি?

হট্টেশ্বর :—পথ ভুলব কেন ? ঠিক পথেই ত এয়েছি "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" বলি পদীর বেটী, পাঁচী বিবি কোথায় ?

সাঃ টেপী :—সে এখন একটা নূতন ফড়িং ধরেছে ; এখন তারা উপরে রসুই ঘরে।

হট্টেশ্বর সসৈন্যে ত্রিতলের রসুই ঘরে গিয়া হাজির। সেখানে গিয়া দেখে রামবাবু মাথায় গামছা বেঁধে মাংসের হাঁড়িতে খাতা দিচ্ছে, পাঁচী ময়দা ঠেসছে, আর খুবলাল রসুই ঘরের সামনের ছাদে এনামেলের প্লেট ও গেলাস মাজ্‌ছে। এই দৃশ্য দেখিয়াই হট্টেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল "জয়রাম" "জয়রাম" ; তুমি যে দাদা ট্রিপল প্রমোশন পেয়েছ, আমরা এত বৎসরে যা পারি নাই, তুমি যে দু' মাসেই আমাদের টপ্‌কে গেলে ; কি খুবলাল তুমি ত একজন ভেটার্‌ণ ; মনে পড়ে, তুমি কি এত অল্প দিনে এত মেধাবী হয়েছিলে "এ যে বন্‌ থেকে বেরুল টিয়ে সোণার টোপর মাথায় দিয়ে" বেশ বেশ আর দিন কতক গেলেই তুমি ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, পাষ্ট মাষ্টার হয়ে যাবে ; তা "কি মধু পাইয়ে যাদু এ ফুলেতে বসিলে ?"

খুবলাল :—হটু, তুমি বাবা মাত্রার বাইরে চলে গেলে, এ.যে বাবা এটিকেটের বাইরে, আর মনে রেখো "প্রেজেণ্ট কম্‌প্যানী অলওয়েজ এক্‌সেপ্‌টেড"।

হট্টেশ্বর :—মাইরি বাবা, ওর পছন্দের তারিফ করতেছিলাম, উনি জহুরী বটে "যেখানে হেরিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার লুকান রতন" এ লোকটা খুঁজে খুঁজে লুকান রতন বার করেছে। মাইরি বলছি, রামবাবু, তুমি একজন উঁচুদরের জহুরী।

রামবাবু :—আমার প্রফেসাররা বরাবরই তা বল্‌ত।

হট্টেশ্বর :—নিশ্চয় রামবাবু নিশ্চয় আমরাও ত এ লাইনের

প্রফেসার আমরাও সে কথা বলি। কি বলহে, রাজীবলোচন, কি বল?

রাজীবলোচন :—বলব কি বাবা, আমার বাক্‌শক্তি রোধ হয়ে গেছে, আমায় বুঝতে দাও, সমজাতে দাও, আমি কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে ঠিক দেখছি। রামবাবুকে খুব ভাল ছেলে বলেই জানতাম, সে এ দলে এসে জুটল কেমন করে, হঠাৎ কলেজ ছেড়ে একেবারে পলায়ন······

খুবলাল :—কেন বাবা ওকে ছেলে মানুষ পেয়ে একেবারে এত লেক্‌চার কেন?

পার্শ্বের ঘরে রেজিষ্টার সাহেব, তাহার পার্শ্বে সার্জ্জেন জেনারেল, তাহার পার্শ্বে প্রফেসার, তাদের বেলায় কোন কথা নাই আর এর বেলাই যত গোলমাল কেন বাবু, ও ত সৎসঙ্গেই আছে বরঞ্চ এতদিন গণ্ডীর বাহিরে ছিলেন এখন গণ্ডীর ভিতরে এসেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আপন জন চেনা

রাজীবলোচন :—মহাশয়, আপনার রাম বলে ছেলেটী গোল্লায় যেতে বসেছে, একটা পতিতা মাগীর ঘরে গিয়ে জুটেছে, আপনি ভদ্রলোক তাই জন্য খবর দিতে আসিয়াছি যদি কিছু করতে পারেন দেখুন।

হতিস :—মহাশয় আমরা আপনাকে চিনি না, জানি না ; তবে জানি আপনি একজন গৃহস্থ ভদ্রলোক ; ছেলেটী গোল্লায় যাচ্ছে এই দেখে শুনে আপনাকে সাবধান করতে এলাম।

সমরেন্দ্র :—বলেন কি, মহাশয়, বলেন কি ? আমি ত এর বিন্দু-বিসর্গ জানি না, সন্দেহ পর্য্যন্ত মনে হয় নাই। এও কি কখন সম্ভব, আপনাদের কথায় বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

রাজীবলোচন :—তা মহাশয়, এর দস্তুরই এই, যাহার বুকে ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গে সে ছাড়া সকলেই টের পায়। আপনার ছেলেটী উৎসন্ন যাচ্ছে, আপনি ছাড়া সকলেই সে কথা জানতে পেরেছে, কেবল আপনি জানেন না, আর জানতে পারবেন না। এ সংসারের নিয়মই এই, তাহা না হলে এ রকম হবে কেন ?

তাহার কারণ, অপ্রীতিকর যন্ত্রণাদায়ক সত্য, কেহই বিশ্বাস করিতে চায় না, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, যাতনা হয়, প্রাণে ব্যথা পায়, কাজেই বেদনা দায়ক ঘটনার অস্তিত্ব সহজে স্বীকার করিতে চায় না, মনকে চোখ ঠারিয়া বলে, ও মিছে কথা, এইরূপ করিয়া নিজের শান্তি বজায় রাখে,

আত্মপ্রসাদ ভোগ করে, কোন অপ্রিয় সংবাদকে অবিমিশ্র অবিশ্রান্ত আরামের অন্তরায় হইতে দেয় না।

হতিস :—তা এতদিন তা জানতেন না, এখন ত জানতে পাল্লেন এখন ইহার উপায় করুন।

সমরেন্দ্র :—তা মহাশয়রা কে ?

রাজীবলোচন :—তা নাইবা জানলেন, নাই বা শুনলেন, জেনেও কোন উপকার নাই, তবে এইটুকু শুনে রাখুন, আমরা ভদ্রবংশের সন্তান আমাদের পিতাও আপনার ন্যায় স্বীয় পুত্রকে অগাধ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ফলে অনেক মনঃকষ্ট পেয়েছিলেন। আপনার ছেলের কুসংসর্গের ঠিকানা দিয়ে গেলাম, যদি পারেন কিছু উপায় করুন। নমস্কার মহাশয়, তবে আমরা এখন আসি ; কাজটা বড় শক্ত, দেখুন, যদি কিছু করতে পারেন।

রাজীবলোচন ও হতিস সমরেন্দ্রের বাটী হইতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিয়া পঁহুছিল। রাজীবলোচন হতিসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, চল হে হতিস আমার বাটীতে চল, সেথা কিছু জলযোগ করে তারপর বাড়ী যাইবে।

হতিস :—আর ভাই বাটী যাইবার কিছু সুখ আছে, বাটীর সকলের উপর কি অত্যাচারটা না করা হয়েছে ; পিতাকে যে দুর্ব্ব্যবহার করা হয়েছে তাহার ত আর কথাই নাই ;—আত্মীয়গণেরও উপর তদ্রূপ ; যখন জন্মিয়াছিলাম মার মুখে শুনতে পাই বাটীতে কি আমোদ, কি আহ্লাদ, হাসির ফোয়ারা উঠেছিল। আত্মীয় স্বজন লোক জনদের কি হাসি, কি খুসী, বোধ হয় অপর কিছুতেই এত উল্লাস, এত স্ফূর্ত্তি হয় নাই, আমি যেন কি একটা অদ্ভুত এসে পহুঁছিয়াছি, আমার আগমন প্রতীক্ষায় যেন আমার মাতাপিতা, পিতামহ, পিতামহী, আত্মীয় স্বজন

সকলেই আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন ; আমি যেন তাহাদের ভব বন্ধনের উদ্ধারকর্ত্তা হয়ে আসছি এই অন্ধ বিশ্বাসে; আমি যেন পৃথিবীর যাহা কিছু মঙ্গলময় সেগুলির সমষ্টি এইরূপ মনে করিয়া আমার আসার আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। যেমন আমার মর্ত্তে আগমন, অমনি হৈ হৈ কাণ্ড, দুন্দভি ধ্বনি, শ্রীচৈতন্যের জন্মে তাঁহার মাতা পিতা, যত আনন্দিত হইয়াছিলেন, আমার মাতাপিতা যেন তাহাদের অপেক্ষা অধিক আনন্দিত, তাঁহারা বিশেষ ধনশালী সেই কারণেই আনন্দ প্রকাশে, কম সংযত। ক্রমে যতই বর্দ্ধনশীল বালক হইতে লাগিলাম, তাঁহাদের আশা ততই পুষ্ট হইতে লাগিল। আমি মানুষ হইলে তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা যেন অনেক গুণে বাড়িয়া যাইবে। আমি একাই ভবিষ্যতে সহস্রপোষী হইব। এইরূপ কত কি উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া যাহাতে আমি শীঘ্র শীঘ্র মানুষ হইয়া উঠি তাহার জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত। আমি যখন বয়ঃস্থ হইয়া উঠিলাম, তখন আমার ব্যবহারে আনন্দ উৎসবের পরিবর্ত্তে, নিরানন্দ হা হুতাশ ও ক্রন্দন সুরু হইল। পিতামহ পিতামহী সরিয়া গিয়া আমার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইলেন, মাতাপিতা, মনের ক্ষোভে আক্ষেপে ও দুঃখে মৃতকল্প, সহধর্ম্মিণী জীবনে মরণে একই রূপ। আমার ধর্ম্ম যখন বখামি ও পরের ছেলে বখান, তখন সহধর্ম্মিণীর আবার প্রয়োজন কোথায়? জীবনে পুণ্য কর্ম্ম বা ধর্ম্মকর্ম্ম করি নাই, কাযেই সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন হয় নাই। মাতাপিতা বিবাহ দিয়া আনিয়াছিলেন, মাতার কাছে শুইয়াই তাহার জীবন কাটিয়াছে, সে আমার পায়ে ধরিয়া কত কাঁদিয়াছে, কত মিনতি করিয়াছে। তাহার ক্রন্দনে, তাহার মিনতি বচনে, কর্ণপাত করি নাই, আর এখন কি সুখে বাড়ী যাইব? সেখানে রেখেছি কি? কেবল অভাব, অভিযোগ, ক্রন্দন, হাহুতাশ, আর্ত্তনাদ। আমার বাটীর গণ্ডীর

মধ্যে সন্তোষ নাই, শান্তি নাই, সোয়াস্তি নাই, সেখানে যাব কি সুখে ?

রাজীবলোচন :—আমার ভাই ও সম্বন্ধে কপাল ভাল। এ জীবনে আমিও যা করেছি, তাহা তোমার ত অবিদিত নাই ; বাটীর সকলকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছি, কিন্তু ভাই বলতে কি, আমার গৃহিণী যেন ময়দার তাল, যতই ঠেসেছি, কসেছি, ততই যেন সে আরো মোলায়েম হয়েছে। বলতে কি, ভাই টাকা কড়ি, ধন সম্পত্তি, মান ইজ্জত, সবই গিয়াছে কিন্তু সে সকল অভাব সত্ত্বেও আমার গৃহিণীর যত্ন, সোহাগ, শুশ্রূষার গুণে মনে হয়, আমার কিছুরই অভাব নাই। আমি নিজদোষে ও সাঙ্গোপাঙ্গের গুণে হৃতসর্ব্বস্ব, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি যা গৃহিণী পেয়েছি তাহাতে সুখের অবধি নাই। চিরকাল তাহাকে জ্বালিয়েছি, পুড়িয়েছি, দুঃখে কষ্টে জর জর করেছি, কখন সদ্ব্যবহার করি নাই, কখন সোহাগ করি নাই, কখন একটী মিষ্ট কথা বলিয়াও আদর করি নাই, কিন্তু আমার গৃহলক্ষ্মী যেন অগ্নিস্নাতা সুবর্ণের ন্যায় আরও উজ্জ্বল আরও মসৃণ হয়ে উঠেছে। আমার সব গেছে কিন্তু যাহা আছে, তাহাও যদি ভগবান আমার কাড়িয়া লন তাহা হইলেও আমি সুখে থাকিব। বিশেষ ক্ষোভের ও দুঃখের কারণ থাকিবে না। কেবল যদি ভগবানের দয়ায় আমার এই গৃহলক্ষ্মী বাঁচিয়া থাকে। আমার সব গিয়াছে কিন্তু সব হারাইয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমি ধনী ও সুখী ; দুঃখ কেবল, এতদিন তাহাকে চিনিতে পারি নাই। সংসারের দুঃখের কোষ্টি পাথরে ঘষিয়া জানিতে পারিয়াছি, আমার গৃহিণী পাকা সোণা ; সর্ব্বস্ব হারাইয়া যে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি, তাহাই আমার পরম লাভ ; নিজের বুদ্ধির দোষে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি, কিন্তু একটী পরম বস্তু লাভ হইয়াছে, মানুষ চিনিতে পারিয়াছি। আপন জন চিনিয়া লইয়াছি, ইহা কি কম লাভ ! রাজীব-

লোচন বাড়ীতে আসিয়া জগা চাকরকে ডাকিলেন। জগা খোঁড়া, কাজেই ল্যাংচাইতে ল্যাংচাইতে আসিয়া উত্তরীয় বস্ত্র ও ছাতাটী বাবুর হাত থেকে লইয়া, বৈঠকখানায় যথাস্থানে রাখিয়া দিল, আর জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, তামাক দিব কি? রাজীবলোচন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল কি বোধ হয়? জগন্নাথ একছিলিম তামাক পেতে পারি কি? তাহার পর হতিসকে উত্তরীয় খানি রাখতে অনুরোধ করিয়া, ফরাস বিছান বিছানায় বসিতে বলিল, আর জগন্নাথকে ফুকরিয়া বলিল জগন্নাথ কিছু জলযোগের বন্দোবস্ত করিতে বল, তোমার মাঠাকুরাণীকে বল একজন বন্ধু সঙ্গে আছে, বুঝলে কিনা?

জগন্নাথ :—আজ্ঞে দেখিয়াই বুঝিয়াছি। পঁচিশ বৎসর এই সংসারে চাকরী করছি তাহা আর বুঝি নি। এই বলিয়া সে অন্দর মহলে চলিয়া গেল, বাটীটা আয়তনে ছোট, অন্দরমহল আর বহির্মহলে ব্যবধান একখানি পর্দ্দা। বহির্মহলের সদর দরজা হইতে পর্দ্দা ঢাকা, গলির ভিতর দিয়া অন্দরমহলে যাইতে হয়। সেই গলির শেষভাগে আর একখানি পর্দ্দা, সেই পর্দ্দার অপর পার্শ্বে অন্দরমহল; জগন্নাথ ভিতরে গিয়া বলিল বাবু আসিয়াছেন, আর তাহার সঙ্গে অপর একজন বাবুও আছেন; জলযোগের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন আমাদের বাবুর সব গিয়াছে কিন্তু এখনও মেজাজটী বেশ আছে, প্রত্যহ সঙ্গে দুই একটী বাবু আনা চাই। এই পাঁচ বেটা উপবাবুতেই বাবুকে ঘাল কল্লে। কিন্তু তবুও তাদের সেবা চাইই চাই।

কমল :—দুর পাগল ছেলে; ওকথা কি বলতে আছে? মানুষই ত লক্ষ্মী (বলা বাহুল্য এই কমলই রাজীবলোচনের গৃহ-লক্ষ্মী।)

জগন্নাথ :—এক আধ জন হলে লক্ষ্মী, কিন্তু দলে দলে হলেই যে আলক্ষ্মী হয়ে দাঁড়ায় মা।

কমল :—না বাবা ও কথা বলতে নেই। এই বলিয়া কমল রন্ধনশালায় গিয়া অতি অল্প সময় মধ্যে খানকত গরম গরম লুচি, কিছু আলু ভাজা, কতকগুলি চিনের বাদাম ভাজা, দুখানা থালায় সাজাইয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে গরম গরম মোহনভোগ সাজাইয়া রাখিয়া জগন্নাথকে দরজায় ঠোকা দিয়া ডাকিল। জগন্নাথ দুটী জলের গেলাস ও দুখানি সাজান থালা লইয়া ঘরের একপার্শ্বের একটী টেবিলে রাখিয়া বলিল, বাবু, আপনারা হাতে পায়ে জল দিন ; সেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ু করিয়া পা ধুইবার জল ও দুইখানি গামছা আনিয়া দিল। বাবুদ্বয় পা হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিতে বসিল। ইতিমধ্যে জগন্নাথ খানকতক পাঁপড় ভাজিয়া আনিয়া দিল আর তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু আচারও আনিয়া হাজির করিল। রাজীব-লোচন্ খাইতে খাইতে বলিল, হতিস ভায়া অনেক ভাল ভাল ডিনার নবান্ন ও সাপার খাইয়াছি, এখন আর সে সব জোটে না কিন্তু যাহা জোটে তাহা ইতিপূর্ব্বে যে সব খাইয়াছি, তাহার চেয়ে ঢের ভাল। দুঃখ, তখন এসব বুঝতে পারি নাই, পার্থক্য চিনতে পারি নাই, ছায়ের গাদায় লুকান রতন ছিল। এখন আমি বেশ সুখেই আছি, ধন-সম্পত্তি সব গিয়াছে কিন্তু যাহা আছে তাহাতেই আমি বেশ সুখী ; সব চেয়ে বেশী সুখী গৃহিণীকে চিনিতে পারিয়া।

হতিস :—আমার, ভাই, সে সৌভাগ্য হয় নাই আমি ও বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে বেশ চিনিতে পারিয়াছি, কিন্তু গৃহিণী আমাকে এত ভাল চিনিয়াছেন, যে এখনও বিশ্বাস করেন না। দেখ রাজীবলোচন, আমি নিজ কর্ম্মদোষে, স্বভাব দোষে, আর সঙ্গদোষে নিজের ক্ষতি যত

করিয়াছি, অপরের ক্ষতি তাহার শতাংশের এক অংশও করি নাই, অথচ অধিকাংশ লোকই আমাকে ঘৃণা করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, আমার কাছ থেকে সরে যায়, তাহাতে আমি মর্ম্মাহত, দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে, জর্জ্জরিত; কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ অর্দ্ধাঙ্গিনীর ব্যবহারে। আমি যদি তাকে আদর করে সম্ভাষণ করতে চাই, সে অমনি ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ফোঁস করে উঠে, তেড়ে আসে; বলে "আর কোথাও স্থান না পেয়ে এখন বুঝি আমাকে মনে পড়িল, বলি আর রেখেছ কি? সব ত শেষ করেছ, এখন নজর কি কেবল আমার গায়ে যে দু একখানা আছে, তাহারই দিকে? সেই জন্যই ভালবাসার ভাণ ও মায়া। আরে আমার মায়াবীরে! শপথ করে বলছি, আমার এখন বেশ শিক্ষা হয়েছে, অবশ্য একটু দেরীতে; তা যাহাই হউক, আমি এখন আপন জন চিনিতে পারিয়াছি, আপনার ইষ্ট বুঝতে পেরেছি। আমি হৃদয়ের ফুস্ ফুস্ ছিঁড়তে রাজি আছি; কিন্তু ওর গহনা লইতে নয়; তবু কিন্তু অবিশ্বাস; আর অবিশ্বাসের দোষই বা কি। বিবাহ রাত্র হইতে আজ পর্য্যন্ত বিশ্বাসের কাজই বা কি করিয়াছি! হিন্দু স্ত্রী না হইলে কবে আমায় ফারখৎ দিত। রাজীববাবু তুমি বিশেষ ভাগ্যবান, আমি বাটীতে বন্ধু নিয়ে গেলে, আহ্বান, সম্মার্জ্জনী দ্বারাতেই হইত। গৃহিণীর যদি একটু স্নেহ মমতা পাই আমার এই মরুময় জীবনে এখনও একটু শান্তি জল পাই।

রাজীবলোচন:—ভাই সহিষ্ণুতার চেয়ে গুণ নাই; একটু সহে যাও, তাচ্ছিল্যের পরিবর্ত্তে ভালবাসা দাও, আদর দাও, তোমার হারান মাণিক ফিরে পাবে। এতদিন ধরিয়া জীবনের আবেগগুলি অস্থানে স্থাপন করিয়াছ, সব বৃথা গিয়াছে। ভালবাসা আদর যত্ন ঠিক স্থানে ন্যস্ত কর নাই, ফলে ঈর্ষাদ্বেষ, হিংসা অনাস্থা পাইয়াছ।

এখন যোগ্য-স্থানে মনোবৃত্তিগুলি ন্যস্ত কর, আরাম পাইবে, শান্তি পাইবে, সুখী হইবে। বলছিলাম কি হতিস, একদিন তোমার গৃহিণীর সঙ্গে আমার গৃহিণীর দেখা করাইয়া দাও—ফল ভালই হইবে। সে আমার পরেশ পাথর, যাহাকে ছুঁইবে তাহাকেই সোণা করিয়া দিবে। আমিও আমার গৃহিণীকে একবার বলে দেখি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেবী মন্দিরে

পদী ঃ—তা, বাবা হরেক চাঁদ, যাই বল, আমার লীলা, আসল নীলা ও যে সে মেয়ে নয়। এই তুমি আসা অবধি সে আর তোমা বই জানে না। আর এসব সংঘটন দেবতাদের লীলা খেলা ; তুমি জহুরীর ছেলে, আমার নাতনীর মন তোমার উপর পড়বেই বা না কেন ? তুমি আসবার মাস খানেক পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপের মহারাজার নাতি এসে সাধাসাধি, সে কি বল্লে শুনবে। সে বললে, ঠাকুরমা, এ আমার বর নয় ; আমি হেসে আর বাঁচি না, আমি বললাম সে কি রে ছুঁড়ী ? তুই হলি আমার নাতনী, তোর আবার বর কিলো। তাতে সে কি বললে জান ? হা হা হা কি বললে জান ? বললে কেন গোবর বনে কি পদ্মফুল ফোটে না ? কেন ভাল হবার আমার ত একটা জন্মগত অধিকার আছে, আমি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হব কেন ? জম্বুদ্বীপের মহারাজার নাতি, সে ত উড়ো ফুলের মধু খেতে এসেছে, সে ত পোষ মানবে না, ধরাও দেবে না ; সে আমায় চায় কিন্তু আমি তাকে চাই না। এই কথা শুনেই আমি বললাম, বাবা, সরে পর। এখানে তোমার স্থান নাই ; তখন ছেলেটী মুখ চুণ করে চলে গেল। এই দেখনা, তোমার কথা খুবলাল আজ ছয়মাস থেকে বলছে, তা তাতেও কি সে রাজি। আমরা অনেক বলে কয়ে, বুঝিয়ে শুজিয়ে তবে তাকে রাজি করেছি। তবে দেখ, বাবা, একটু মন জুগিয়ে চলো, ছেলেমানুষ কিনা তা নইলে সে রাজিই হবে না। বাবা, আমি ত গৃহস্থের মেয়ে কপাল দোষে না হয় এপথে এসেছি। দোষ সে

আমার নহে আমার স্বামীর ; সে আমাকে যত্ন করে রাখেনি আমিও পোষ মানিনি। তোয়াজ করা চাই ত, বাবা তবে ত মেয়েমানুষ বশে থাকে আমরা অভদ্র নহি, আমরা অসতী নহি। উদ্দেশ্য আমাদের বরাবরই সৎ, তবে যে মাঝে মাঝে হাত পাল্টাই হয়, তাহা আমাদের দোষ নয়, সেটা অপর পক্ষেরই দোষে। ভাল করে, যত্ন করে, রাখতে পারলে, এক হাতেই জীবনটা কেটে যায়।

খুবলাল ঃ—তা ঠিক, তা ঠিক,আমি এদের অনেক দিন থেকে জানি, এদের ব্যবহার অতি উচ্চ, অতি শ্রেষ্ঠ। হরেকচাঁদ বাবু! কিছুদিন ব্যবহার করে দেখুন জানতে পারবেন। এদের গোষ্ঠি পদী বললেও চলে। পুরুতে খালি বিয়ে দিবে না, তাছাড়া তোমরা বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মত থাকবে। পুরুত ও নাপিত ছাড়া, বিবাহের আর সবই থাকবে। সে তোমা বই জানবে না।

রাজীবলোচন ঃ—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে ; আর মন্ত্র তন্ত্র, তা, খেঁদী দেবী আছে, পদী দেবী আছে ; আজকাল ভদ্রলোকের পাড়ায় দাসী, আর এ পাড়ায় সব দেবী। দাসী একেবারেই নাই। তাহারা বাঘের মন্ত্র, সাপের মন্ত্র কত রকম জানে ; তাহাতে বাঘ বশ হয়, সাপ বশ হয়, তা তুমি ত ভদ্রলোকের ছেলে, তোমার আবার কি কথা ; তুমি না হয় বাপ খুড়োরই বশ হলে না, খেঁদী পদীদের বশ হবার জন্যই ঘুরে বেড়াচ্ছ, সঙ্গী ত সব জুটিয়ে নিয়েছ ; অধ্যাপক খুবলাল স্বয়ং তোমার ভার লইয়াছেন ; তোমার ঘাড়ের ভার, আর তোমার পিতা পিতামহের ঘাড়ের ভার শীঘ্র নামিয়ে দেবেন। ওসব গুরুভার তোমাকে আর বহন করতে হবে না। তারপর মাষ্টার পিসু আছেন, মাষ্টার খেবু আছে, দিনকতকের মধ্যেই তোমায় মানুষ করে দেবেন ; বিয়ের সাতপাক্, তাহার জন্য ভেবনা চাঁদ। তোমাকে শীঘ্রই ৭ × ১৩ = ৯১

পাক খাইয়ে ছেড়ে দেবে, আর জহুরীর ছেলে হলেও আজ থেকে কলির ব্রাহ্মণ, এ পাড়ার দেবীর দেব, তোমাকে আর পায় কে ?

পদী :—রাজীববাবুর সবেতেই ঠাট্টা। ছেলেমানুষ জামাই তার সঙ্গে ঠাট্টা।

রাজীবলোচন :—দেখ দেখি, বাবা, কি রকম দরদের শাশুড়ী পেয়েছ ! তোমার গর্ভধারিণী মা তোমাকে এর অর্দ্ধেক যত্ন করেন নাই। আর ঠাট্টার কথা যা বল্লে, সে ছেলেবেলায় হয়ে গেছে, এখন আর ভুলেও ঠাট্টা করি না। যা বলছি সব সত্যি। শাস্ত্র বাক্যের ন্যায় সত্যি ; মিথ্যা, বাবা তোমাদের ভিটেয় বসে ? মিথ্যা বললেও স্থান মাহাত্ম্যে সত্যি হয়ে যায়, বাবা একি কম স্থান, এ যে পীঠস্থান ; যে একবার এখানে পা দিয়েছে, তার সাত পুরুষ সশরীরে স্বর্গে গেছে। লজ্জার হাত থেকে এড়াবে, মান ইজ্জতের কোন ভয় নাই, ধর্ম্ম অধর্ম্মের কোন কথাই নাই, মা-বাপ, স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন কাহারও ভাবনা নাই, একেবারে ফ্রিমিস্কার, হাওয়ার ন্যায় চিন্তাশীল। কোন বাধা বিঘ্ন নাই সিধা চলে যাও ; যাহা ইচ্ছা কর, যাহা ইচ্ছা বল, যাহা ইচ্ছা ভাব, ভুল ধরবার কেহ নাই।

খুবলাল :—রাজীববাবুর আজ রাত হয়ে গেছে উনি আজকাল ভাল ছেলে, বেশী রাত্রে বাটীর বাহিরে থাকেন না।

রাজীবলোচন :—কি বাবা খুবলাল, ভুলে একটা সত্যি কথা বলে ফেল্‌লে ? এ তোমার কুষ্ঠিতে লেখে নাই। আমাকে তাড়াতে চাও, তার জন্যে অত ব্যস্ত কেন বাবা ? আমি আপনিই যাচ্ছি, আজ হতিসের মুখে শুনলাম তোমাদের এখানে বিয়ে, তাই কন্যাযাত্রী হিসাবে এখানে এসেছিলাম। বাসনা, বলি হলে প্রসাদ পাব তা বাবা, থাক, আর একদিন দেখা যাবে। অপূর্ব্ব মিলনের কথা শুনে নিজেদের

পূর্ব্বেকার কথা মনে পড়ে গেল। মনে করিলাম দেখে আসি, একটা কচি ছেলের বলি কেমন হয়। আর, রাত্রে বাহিরে থাকার কথা যা বল্লে—তা ঠিক, এত রাত্রি বাহিরে কাটিয়েছি যে, যদি আর এক রাত্রিও বাহিরে না থাকি তাহলেও ত পাল্লার পাষাণ ভাঙ্গবে না। চল্লুম বাবা চাঁদ, তুমি ফাঁদে পা দিয়েছ, আটাকাঠীতে আটকে পড়েছ এখন ত দিন কতক পোষা পাখীটীর মত হাতে বসে ছোলা খাবে, এর পর ছট্‌ফট্ করলেও উড়তে পারবে না, কেননা তখন ডানা কাটা, তাহার উপর আফিংয়ের মৌজ। বাবা, একদিন তোমার মত ময়ূরে চড়ে কার্ত্তিক সেজে এদেরই এক বোনের বাড়ী বিয়ে করতে এসেছিলাম। ঠিক তোমারই মত বাপ ছিল, মা ছিল, ধন সম্পত্তি ছিল, লক্ষ্মী ছিল; তোষামুদে ছিল, পারিষদবর্গ ছিল, রূপ ছিল, যৌবন ছিল, বল ছিল, তার পর রাম রাজা হবার পূর্ব্বেই চৌদ্দ বৎসর বনবাস। একরকম বেহুঁস, যখন চৈতন্য হ'ল, চেয়ে দেখি আমি কেবল আছি, আমার সব গিয়েছে। আছে কেবল দুঃখের স্মৃতি, নরকের যন্ত্রণা.........

পদ্মী:—রাজীব বাবু বড় বাড়াবাড়ি করচেন, লেকচার দিতে হয় ত ব্রাহ্ম সমাজে যান না, এখানে কেন?

রাজীবলোচন:—ঠিক বলেছ বাবা, বেঁচে থাক, এর পর তোমরা স্বমূর্ত্তিতে আহ্বান করবে, আমার ঊর্দ্ধতন চৌদ্দপুরুষকে স্বর্গে পাঠাইবে। না বাবা, এই বেলা সরে পড়ি। চাঁদ! বাবা পার যদি তুমিও সুবিধা মত সরে পড়ো; এখন ত পারবে না বাবা। এখন যে তোমার ঘোর বিকার; ৪২ দিন ত ভুগতে হবেই, তার পর ভগবানের হাত। মা লক্ষ্মীরা চললাম। খুবলাল ভায়া, দেখো খুব সাবধান, বাবা চাঁদ পার ত অল্পদিনের মধ্যে নিজের লোক চিনে নিও। পারবে না, বাবা, এ যে বিকার, ঘোর বিকার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সর্ব্বস্ব খুইয়ে সুখী

কমল ঃ—দুঃখ করে কি হবে, দুধ চলকে পড়ে গেছে এখন আর আক্ষেপ করে লাভ কি? দেখ, বুদ্ধির দোষে সব গেছে; প্রাণটা ত আছে, তা হলেই হ'ল। তুমি যে আমার হারানিধি; তোমাকে যে পেয়েছি এই আমার স্বর্গলাভ; স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ হিন্দু স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব; তার উপর আমি তোমার আদর পাচ্ছি, সোহাগ পাচ্ছি, আমার আর সর্ব্ব সুখের বাকি কি? দেখ বিবাহের পর থেকে কখন একটা মিষ্ট কথা পাই নাই, মিষ্ট ব্যবহার ত দূরের কথা; তখন অর্থ ছিল, সম্পদ ছিল, এলবাস পোষাক ছিল, দাস দাসী ছিল, কিন্তু তুমি নিজে ছিলে না। এখন সে সব কিছুই নাই, কিন্তু তোমাকে পেয়েছি; সে সব গিয়াছে, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই। তোমাকে পাইয়াছি এই আমার পরম লাভ। আমার প্রতি ভগবানের অসীম দয়ার জন্য আমি কায়মনোবাক্যে, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি, এক পাল্লায় পৃথিবীর যথা সর্ব্বস্ব, আর অপর পাল্লায় তুমি স্বয়ং। সে দিন মহাভারতে পড়ছিলাম সত্যভামা একদিন ব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তুলে বসাইলেন। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ অন্যদিকে গৃহে যত ধনরত্ন ছিল, সব চাপান হইল—কিন্তু কিছুতেই পাল্লা সমান হইল না। তাই বলি, তুমি যে পাল্লায়, সে পাল্লা অনেক ভারী। তোমার একটা মিষ্ট কথা, একটা আদরের ঠোণা সকল সম্পদের চেয়ে আমি অধিক ভালবাসি; পয়সা ত হাতের ময়লা; শরীর রক্ষার জন্য কতকটা প্রয়োজনীয়, তা ছাড়া তাতে আর আছে কি?

মনে করলেই হ'ল ইম্‌পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা আমার; শরীর ধারণের জন্য, প্রয়োজনীয় বস্তুর আহরণার্থে, যতটুকু দরকার; তাহা ছাড়া অধিক টাকা, রাস্তার ধূলা ভিন্ন আর কিছুই নয়; তাহাতে স্বামীর ভালবাসা কিনিতে পারা যায় না। আজ পনের বৎসর ধরে, আমি দিন রাত ভোলানাথের আরাধনা করিতেছি; তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য, তোমার মতি গতি ফিরাইবার জন্য, কায়মনোবাক্যে তাঁহার কাছে দয়া প্রার্থনা করিয়াছি ও করিতেছি। তিনি সতীর প্রার্থনা কখন অস্বীকার করিতে পারেন না, তিনি নিজে যে সতীর জন্য পাগল। তিনি কি সতীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহ্য করিতে পারেন? তাঁহাকে দয়া করিতেই হইবে। তিনি রুদ্র অবতার, কিন্তু সতীর প্রার্থনার কাছে, তিনি শীতল চন্দ্রমা; সতীর ঐকান্তিক প্রার্থনা কখন বৃথা যায় না।

রাজীবলোচন:—কমল আমার আরো অধিক কষ্ট, তুমি মুখ বুজে জ্বালা, যন্ত্রণা, কষ্ট সব সহ্য করেছ। যদি তা না কর্‌তে, তাহা হইলে হয়ত এখন এত অধিক অনুতাপ হইত না। আমি তোমাকে গালি দিয়াছি, তুমি হাসিয়াছ; আমি তোমাকে তাড়না করিয়াছি, তুমি সে তাড়না উপেক্ষা করিয়াছ; আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে তুমি আমাকে দ্বিগুণ যত্ন করিয়াছ। আমি তোমাকে ঘৃণা করিয়াছি, তুমি তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে ভক্তি ও ভালবাসা প্রতিদান করিয়াছ। তখন আমি বিকারগ্রস্ত রোগী। কিছুই বুঝতে পারি নাই। এখন রোগমুক্ত হয়ে, কতক কতক স্মরণ হচ্ছে, কি অন্যায়ই আমি করিয়াছি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয়, আমার এক জীবনে শেষ হইতে পারে না। মনে পড়ে, কমল, একদিন সন্ধ্যার সময় আমি বাটী হইতে চলিয়া যাইতেছি, তুমি আসিয়া আমার পা দুটী ধরিলে, পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিলে "আজ বাহিরে যেও না। এক

দিনের তরে মনের সাধ পুরণ কর। তুমি স্বামী, আমি তোমার দাসী। তুমি আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিলে আর কে করিবে? আমি তোমার পায়ে পড়ি আমায় ছাড়িয়া যাইও না। "শেবে অনেক ধস্তাধস্তির পর, বলতে লজ্জা করে ক্ষোভে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইয়া যায়, শেষে তোমার সোণার অঙ্গে পদাঘাত করিয়া, নীচ কাপুরুষের ন্যায় পা ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেলাম। তাহার পর, রাত্রে খুব আমোদের ফোয়ারার মধ্যে, যখন এই কথা মনে পড়িল, সেই বীভৎস নৃত্যগীতের মধ্যে আমাকে যেন শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল; চারিপার্শ্বে আমার পাপের ফোয়ারা। অবশেষে ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান, জ্ঞান, কৃত্রিম উপায়ে লোপ করিয়া তবে সে জ্বালা যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাই। পরে মনে হ'ল, পুনরায় যখন দেখা হবে তোমার চক্ষু থেকে ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ উদ্গার করবে। সামান্য কয়েকখানা নাটক নভেল পড়িয়া যাহা শিখিয়াছিলাম, তাহা হইতে আমার এই জ্ঞানই ছিল। কিন্তু একি, সব ভুল! ফের যখন সাক্ষাৎ হ'ল, তখন আবার সেই মিষ্ট ভাষা, আবার সেই ভিক্ষা, আবার সেই কোমল ব্যবহার, আবার নয়নে সেই মৃদু অভ্যর্থনা, আবার মুখে সেই হাসির রেখা। কৈ সমান ব্যবহার প্রতিদান কোথায়? ঘৃণার পরিবর্ত্তে ভালবাসা, তাচ্ছিল্যের পরিবর্ত্তে তন্ময়তা।

কমল:—তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি হিন্দুর মেয়ে; আমাদের শিক্ষা স্বামী পরম গুরু। স্বামী দেবতাশ্রেষ্ঠ, স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা। যে সমাজে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলা প্রভৃতি শত শত পতিরতা পতিপ্রাণা রমনী জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন; আর এখনও যে সমাজে কত শত সতীসাধ্বী হিন্দু-রমণী হিন্দুর গৃহকে সুখের আগার করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সমাজেই আমার আগমন। স্বামীর মঙ্গলের জন্য তাঁহারা কি না সহ্য করিয়া-

ছিলেন, আর আমি, তাঁহাদের তুলনায় অতি যৎ সামান্য কষ্ট সহ্য করিয়াছি মাত্র, সেত কিছুই নয়। গ্রহ বৈগুণ্যহেতু নল রাজা কিনা কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। আর নলরাজার সহধর্ম্মিণী দময়ন্তী তাঁহার দুঃখের অংশ অকাতরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতৃসত্য পালন হেতু শ্রীরামচন্দ্র কষ্ট পাইলেন, সীতাদেবী অমনি সেই দুঃখের অংশভাগিনী হইলেন। দেবীর কোপে, পড়িয়া নখিন্দর জীবন হারাইলেন। সতীকুল অগ্রণী গন্ধবণিক নন্দিনী বেহুলা, মৃত স্বামীকে বুকে ধরিয়া, ভেলায় চড়িয়া গাঙ্গুয়ের জলে হেলায় জীবন ভাসাইয়া দিলেন। স্বামীর জন্য স্ত্রীকে ত কষ্ট পাইতেই হইবে। প্রিয়তম! বিবাহের সময়ে বরকন্যা কি বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করে তাহা ত জান। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগে শোকে উভয়ে উভয়ের অংশভাগী। কর্ম্মদোষে, বুদ্ধির দোষে বা দৈব দুর্বিপাকে পড়িয়া স্বামী দুঃখে পড়িয়াছেন, সে অবস্থায় স্ত্রী, বিপন্ন পতিকে ছাড়িয়া কখনও কি সুখে থাকিতে পারে? ইহা হিন্দু রমণীতে সম্ভবেনা। তাহা হইলে বিবাহ শপথ যে মিথ্যা হইবে, হিন্দু রমণীর চির জীবনের শিক্ষা ও সাধনা যে বৃথা হইবে, গ্রহের কোপে পড়িয়া তুমি উচ্ছৃঙ্খল, আত্মবিস্মৃত, সে অবস্থায় তোমার সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য, কাছে থাকিয়া গ্রহবৈগুণ্যের উপশম করিবার চেষ্টা করে। তাহা না করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া যাইব, সেকি সহধর্ম্মিণীর কাজ? হিন্দু স্ত্রীর নিজস্ব অধিকার স্বামী সেবা। সে আমার জন্মগত অধিকার; সে জন্মগত অধিকার হইতে কে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে?

রাজীবলোচন ঃ—দুঃখ, আমাদের সমাজের যাহা শ্রেষ্ঠ দান, তাহারই লোপ করিতে, আমরা বিশেষ যত্নবান্। অধুনা আমাদের অন্দর মহলটী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে আমরা বিশেষ তৎপর। হিন্দু রমণীকে ভেঙ্গে চুরে এক অদ্ভুত জীব প্রস্তুত করিতে আমরা আড়েহাতে লাগিয়াছি।

সেটা আমাদের নিজেদের বুদ্ধির দোষ। "ভাল করতে পারব না, মন্দ করবো কি দিবি তা বল" ইহাই আমাদের সমাজ সংস্কারকদের এখন সবিশেষ চেষ্টা। সেদিন আমার সঙ্গে এক পণ্ডিতের কথা হইতেছিল, তিনি বলিলেন, বাবা আসল কথা বোঝে না বলেই, আমাদের স্বনিয়োজিত সংস্কারকেরা চেঁচিয়ে মরে, বলে আজকালকার সাম্যবাদের দিনে রমণী-দিগকে সমান স্বাধীনতা দিবে না কেন? আরে মর কে বলছে, তাহাদের সমান স্বাধীনতা নাই। তাহারা পত্নী, সহধর্ম্মিণী, সন্তানের জননী গৃহকর্ত্রী, গৃহলক্ষ্মী, তাহাদের এ জন্মগত অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত করে কে? করবার কথাই বা বলে কে?

কমল:—আমাদের যা অধিকার আছে তাহাই যথেষ্ট, এর বেশী আমরা চাই না, পাইলেও সুখী হইব না। আমাদের সংস্কারকেরা কি রকম জান; কোন লোকের খাটিয়াটীতে ছারপোকা জন্মিয়াছে, রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত করে, অতএব খাটিয়াটী জ্বালাইয়া দাও। আরে, শোব কোথায়? তা আমরা জানিনা ছারপোকা ত মলো।

রাজীবলোচন:—তাত বুঝলাম কমল। এখন পেট চলবে কি করে?

কমল:—তুমি পুরুষমানুষ তোমার যখন চেষ্টা আছে, পুরুষকার আছে, সদিচ্ছা আছে, দৈব তোমাকে সাহায্য করিবেনই। আমাদের অভাব হবে না; চেষ্টা করে অভাবের সংখ্যা কম করব। তাকে বেঁধে ফেলব; বাড়তে দিব না, তাচ্ছল্যহেতু আমাদের অভাবের আপনি তিরোভাব হবে। ভগবানের প্রতি নির্ভর কর, তিনি দয়াময়, আমাদের দয়া করিবেনই করিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লীলার লীলা

হরেক চাঁদঃ—বাবা খুবলাল, তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার কে ছিলে বাবা? তুমি যে ছায়ার ন্যায় আমার পিছনে লেগে আছ, মনে হয় তুমি নল রাজার শনি। কদিন থেকে মনে করেছিলাম, বাটীতে বকাবকি ঝকাঝকি করেছে, আর বাটী থেকে বেরুব না। কাল বাটীতেই ছিলাম আর আজ বাটীতেই থাকব, কিন্তু তুমি বাবা মূর্ত্তিমতী কুমতি। আমার কাণে কুমন্ত্রণা দিতে এলে; বলছ সে এক ভদ্রলোকের মেয়ে কাঁদছে, প্রথমতঃ একথা সত্য নয়। তারা কাহারও জন্য কাঁদে না, আমার জন্যও কাঁদছে না, কাঁদে খালি অর্থের জন্য; আর কান্নায় যদি মন গলে, তবে আমার নিজ বাটীতে ত অনেক কান্না; সতী স্ত্রী কাঁদছে, বাপ কাঁদছে, মা কাঁদছে, আত্মীয় স্বজন কাঁদছে! কান্নায় যদি গলে যেতাম তবে অনেক দিন আগে আমার বাটীর হাহাকার থেমে যেত।

খুবলালঃ—তা বাবু আমার কি বল; কাল থেকে কৃষ্ণের জীব খায় নি, উঠেনি, অনেক সাধ্যিসাধনা করলাম্। কিছুতেই খেলে না। তার মা কাঁদতে লাগল, বল্লে যাও জামাইকে বলগে, তাকে হীরা জহরত দিতে হবে না, সুধুহাতেই আসতে বল, মেয়েটা কেবল তাহার জন্য পাগল, তা না হলে, হকচাঁদ নাহকচাঁদ এসে ডবল কবুল করে, সাধাসাধি; তা বাবা; মেয়ে বলে বর আবার কয়জন হয়? বাবু আসে ত খাব, তা না হলে প্রায়োপবেশন করলাম। একটা সমস্ত মেয়ে ভগবানের জীব ঘরে, সেইজন্য এসেছি; ইচ্ছা হয় তাকে

বাঁচাও, না খেয়ে অনেকেই মরে, না হয় একটা গুস্তিতে বাড়ল। এই যে মুনিমজি আসছে, বাবু সাহেব আমি এখন আসি।

চিরঞ্জিলালঃ—কিহে শকুনি মামা, তুমি আবার এ ভাগাড়ে কেন? বাবা অন্য একটা ভাগার টাগার দেখে শুনে লও না; তুমি বেটা ছিনে জোঁক, হরেক চাঁদকে ধরে বসেছ, এখন ত রক্ত খেয়ে পেট পুরে গেছে। বেটা এইবার একে ছাড়। বেটা যেন কুমন্ত্রণার জেয়ার্ন্ত মূর্ত্তি। শনি খুবলাল তুমি হরেকচাঁদকে ছাড় তা নহিলে ঝেঁটিয়ে তাড়াব।

খুবলালঃ—আমি কি করব মুনিমজি? দয়া পরবশ হয়ে আসা, নহিলে আমার আর এতে স্বার্থ কি? একেই বলে "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে উলু খড়ের প্রাণ যাবে।"

চিরঞ্জিলাল ঃ—খুবলালজি, তোমারও মরণ নেই; আর তোমার ভাল মেয়েমানুষের মেয়েদেরও মরণ নেই। বাবা তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে, বাপ দাদাকে দশজনে চিনত, বাটীতে রোজ ৫০ খানা পাতা পড়ত, আর তুমি তাদের ছেলে ও নাতি হয়ে "ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট-মন্দিরে" যে ভদ্র ঘরের ছেলের মান গেছে তার প্রাণ যাবার নয়, মান যাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রাণ যায় ত আলাহিদা কথা; নতুবা ও তোমাদের বিড়ালের জীবন। নয়টা প্রাণ আছে কয়টা যাবে? আর খুরিয়া ভুলেও কখন সত্য কথা বলেছ কি?

হরেকচাঁদঃ—মুনিমজি এত কথা কি বানান যায় হয়ত কথাটা সত্য, ছুঁড়ীটা আমাকে ভালবাসে, ওর মা বেটী, দিদিমা বেটী, পয়সা পয়সা করে, কিন্তু বেশ্যা হইলেও কতকটা সতী, আমার উপর ওর টান আছে।

চিরঞ্জিলালঃ—চাঁদজি তোমার উপর তার টান আছে। আর তাহার উপর তোমারও টান আছে; তোমাদের মত ডবকা বাবুদের টান একটু

ঝোড়ো হাওয়া টানের মত ; সামনে যাহা পড়ে, সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায়, কেবল দিক বদলাচ্ছে, আর উহাদের যে টান সেটা কবির ভাষায়

"মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে শান্ত করল বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি হেরি সাপের চোখে।"

খুরিয়া যে কথাটা বললে সেটা ছেড়ে দাও, ভুলেও সে কখন সত্য বলে না। চাঁদজি, একবার বিলাত থেকে একখানা নুনের জাহাজ বাঙ্গলায় আসছিল, তাতে সব নুন জোটেনি, কাপ্তেন খুব হুঁসিয়ার লোক। অনেকটা খালি জাহাজ আনলে লোকসান হবে ; ভেবে আকুল, এমন কি জিনিস আছে যাহা বাঙ্গলায় নিয়ে গেলেই তখুনি বিক্রী হয়ে যাবে ; অনেক চিন্তে সে ঠিক করলে আচ্ছা ৫০০০ টন মিছে কথা ল'য়ে যাওয়া যাক। বিলেতে এ জিনিষটা খুব সস্তা আর বাঙ্গলায় ওটার এখন খুব কাটতি, দরেও বিক্রী হবে। বলব কি বাঙ্গলায় খিদিরপুরের ডকে যেমন জাহাজ এসে পহুঁছিল অমনি দলে দলে লোক এসে খুবই বেশী মূল্যে মিছে কথা খরিদ করে ল'য়ে গেল। খানিক বাদে জন দশ লোক এসে পড়ল। তখন সব মাল কেটে গেছে ; কি হবে ? সেই সব আগত লোক-গুলা ত কেঁদেই আকুল। এমন সময় আশুতোষ স্বয়ং সেই রাস্তা দিয়ে যাইতেছিলেন, ভোলানাথকে দেখিয়া তাহারা তাঁকে ধরে বসল। অনেক স্তব স্তুতি আরম্ভ করলে। আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন, তিনি অন্তর্য্যামী সব কথা তলাইয়া বুঝিয়া-ছিলেন। তাহারা ক্রন্দন স্বরে বলিল ভূতনাথ আমাদের একটু দেরী হয়ে গিয়েছে, আমরা সময়ে আসতে পারি নাই। ৫০০০ টন মিথ্যা কথা আমদানী হয়েছিল। আমরা এক সেরও পেলাম না। আমাদের মধ্যে আছে, ভদ্রবেশে বেশ্যার দালাল, বেশ্যার উপযুক্তা মেয়েদের পিতা, হিসাব

রক্ষক ও গার্জ্জেন। প্রথমে বাবু হয়ে সুরু করি, ক্রমে এই অবস্থায় আসিয়া পহুঁছিয়াছি। "বেশ্যার বাবু, শুঁড়ী আর ভণ্ড ছাঁদন দড়ি।" আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন তোমরা উপযুক্ত পাত্র বটে, তোমাদের অভাবও অনেক, দুই চারি মণ মিথ্যায় তোমাদের কি হইবে? দুদিনের খরচ চলিবে না, বহুদিনের ত কথাই নাই। আমি সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আজ হইতে তোমরা যা বলবে সে সমস্তই মিথ্যা, তোমাদের মুখ হইতে যাহা নির্গত হইবে, সবই অসত্য। খুবলাল আমাদের এই শ্রেণীর লোক; ও সত্য মনে করিয়া বলিলেও তাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে।

হরেক চাঁদ :—চলনা মুনিমজি একবার দেখেই আসা যাক্। যদি মিথ্যা হয় তো খুবলালকে খুব আজ সাজা দেওয়া যাইবে।

চিরঞ্জিলালঃ—চাঁদজি তুমি বালক। বেশ্যাদের দুষ্টামি ধরা তোমার কাজ নয়; আমার বয়স তোমার বাবার চেয়ে অধিক, আমিই ওদের মায়াকান্নার জাল ভেদ করতে পারি না। হ্যারে খুবলাল, একি বাবা ওদের "অন্তর্জ্জলিন ছিনালি" চল চাঁদজি তোমার খেয়াল হয়েছে চল দেখে আসা যাক।

অবশেষে হরেকচাঁদ, চিরঞ্জিলাল ও খুবলাল তিনজনে মিলিয়া পাঁচী বিবির বাটীতে গিয়া হাজির। খুবলাল দ্রুতগতিতে একটু আগেই আসিয়াছিল। হরেকচাঁদ ও চিরঞ্জিলাল আসিয়া দেখে বাটীতে মরা কান্না পড়িয়া-গিয়াছে। পদী আসিয়া, মুনিমজির পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল, বলিল রক্ষা কর, বাবা রক্ষা কর; আমার দশ নয়, পাঁচ নয় একটা মেয়ে না খেয়ে মরতে বসেছে। মুনিমজি দয়া কর, হরেক চাঁদকে বল, সে মনে করলেই মেয়েটাকে খাওয়াতে পারবে। বাবু আজ তিন দিন আসেন নাই সে জলস্পর্শও করে নাই। খেতে বললে খালি কাঁদে, বলে বাবু যখন ছেড়ে

গেলেন,তখন এ পাপজীবন কাহার জন্য রাখব। বলে যদিও আমি তোমাদের কন্যা ভগবান আমাকে তাঁরই জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। হয় আমি তার ভোগে লাগব, আর না হয় পঞ্চভূতে আমার শরীর ফের মিশে যাক। চাঁদ ছাড়া আমার এ দেহ, আর কেহ ভোগ করবে না, ওগো মুনিমজি আমার কি হবে গো ?

চিরঞ্জিলালঃ—হেরে পদী ও তোর পেটের মেয়ে না, তোর পেটের দায়ের মেয়ে ?

পদী ঃ—ওমা, ওকি কথা গো ! ওকে যে আমি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছিনু, ও হ'ল পৃথ্বীশ বাঁড়ুজ্জ্যের মেয়ে। আজ না হয় আমার এমন দশা। ওগো আমার কি হবে গো ?

চিরঞ্জিলালঃ—তোমার অক্ষয় স্বর্গ হবে ; বাধ্য হয়ে চিত্রগুপ্তকে তোমায় সেখানে পাঠাতে হবে। নরকে ত আর স্থান নাই। ভরপুর। তীর্থযাত্রীর ট্রেনের মতন সেখানে "ন স্থানং তিল ধারণং" সহজেই যায়গা ত দিতে হবে, স্বর্গ একেবারে খালি, একটীও লোকনাই, কাজেই স্থানের অভাবে তোমাকে সেখানে পাঠাবে।

পদীঃ—ওগো আমার কি হবে বলিয়া হরেক চাঁদের পায়ে পতন ও পদদ্বয় ধরিয়া ক্রন্দন।

চিরঞ্জিলালঃ—আগামী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তোমার কিছু ভাবনা নাই। তাহার পর যাহা হউক একটা তোমার জন্য হবে। তুমি নহুশের প্রেত আত্মার ন্যায় শূন্যে থেকো। আর তোমার যে লীলার কথা বলছ, সে ত লীলা করতেই জন্মাইয়াছে। বলছ সে তিন দিন খায় নাই ; তাহাকে খেতে দিয়েছিলে, রসগোল্লা, লেডিকেনি, রাবরি, দুধ, পায়েস, এসব ত তাহার পেটে সহ্য হবে না, তাহাকে পান্তভাত দাও, পেঁয়াজের ফুলুরি দাও, লঙ্কাবাটা ঝাল ফুলুরি দাও তবে ত তাহার

পেটে যাবে মুখে ভাল লাগবে। এ লীলা, শীগ্‌গির শীগ্‌গির খাও, তা নহিলে আমি চাঁদকে নিয়ে চল্‌লুম, আয় চাঁদ আয়।

মুনিমজি জামাই বাবু এয়েছেন? আর কোন ভাবনা নাই, লীলা এখনি খাবে।

চিরঞ্জিলালঃ—সোণার চাঁদ, সত্যনারায়ণের সিন্নির জন্য কলির পুরোহিত ঠাকুরের উপবাস। লুকিয়ে সারাদিন সব খেয়েছেন, কেবল পাণটী নয়, যজমানের কাছে প্রকাশ উপবাস, আর তাহার উপবাস দরুণ দক্ষিণা এক টাকার বেশী, আরে চাঁদজি একটা মতির মালা টালা উপবাস দক্ষিণা দাও, এ উপবাসে তোমার পিতৃপুরুষ স্বর্গে যাবে, সশরীরে, দৌড়ে। যাও চাঁদজি যাও, পয়সা ছড়াও, পরকালের কাজ কর, জহুরীর ছেলে কসবীর ঘরে, এর চেয়ে আর অধঃপাতে যাবে কি করে? যাও সোজা পথে চলে যাও।

নবম পরিচ্ছেদ

"বাবাগিরি চাকরী সব চেয়ে গুখুরি"

ভৈরবচাঁদ :—তারা, আমার এক ব্যঞ্জনে নুনে বিষ হ'ল ; এক মাত্র ছেলে, সেটা দুশ্চরিত্র হ'ল, এখন উপায়। আমি বেঁচে আছি, এক রকম চলছে, আমি মলে সে কিছুই রাখবেনা, সব অন্যায়ভাবে নষ্ট করবে, কোন কার্য্যেই লাগবে না।

তারা :—তাইত শেঠজি এটা কি হ'ল, আমাদের সংসারে কখনও ত এ রকমটী হয় নাই। পুরুষানুক্রমে আমাদের বংশে এরূপ দুষ্ট সন্তান কখন জন্মায় নি, এখন উপায় কি ?

ভৈরবচাঁদ :—অনেক চেষ্টা করলাম কিছুতেই ত কিছু করে উঠতে পারলাম না। পেয়ারী আমার যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। মার সবই ভাল, সে অত ভাল বলেই বুঝি তাহাকে কিছু করে উঠতে পারলে না। অত ভাল হলে অত বড় দুশ্চরিত্রকে কি বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে ?

তারা :—সে কচি মেয়ে, তার দোষ দাও কেন ? তুমি আমি তার মা বাপ হয়ে কিছু করতে পারলাম না, আর সে একটা কচি মেয়ে সে তাকে শোধরাইবে।

ভৈরবচাঁদ :—কি জান তারা, সে হ'ল শক্তির অংশ, যদি শোধরাতে পারে ত, সেই পারবে। মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। দেখি বৈবাহিক করমচাঁদকে আসতে বলেছি, তিনি কি বলেন ?

করমচাঁদ মেহরা এলাহাবাদের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ইনি ও ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ জহুরীর কর্ম্ম করিয়া প্রভূত অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের

অনেক বড় বড় জমিদারী, সে জমিদারীগুলি নিজেরাই দেখেন। জমিদারী দেখিবার জন্য কর্ম্মচারী আছেন, সত্য, তথাপি সে সব জমিদারী সম্পর্কীয় সকল কার্য্য করমচাঁদ বাবু ও তাঁহার ভ্রাতারা তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবার কিন্তু এখনও সকলে এক অন্নে আছেন। সংসারে ধর্ম্মকর্ম্ম ক্রিয়াকলাপ বারমাসই আছে। সেই সব ক্রিয়া কলাপে দশজনকে আমন্ত্রণ ও তাহাদের অভ্যর্থনা, অতিথি সৎকার তাঁহাদের বংশের প্রধান ধর্ম্ম। সত্যবাদী বলিয়া তাঁহাদের বিশেষ খ্যাতি। ব্যবসাদার হইলেও সদাচারী, সত্যবাদী, স্পষ্ট বলিয়া দেন এই জিনিষের এই দর লইব ; ইহার কমে বেচিব না। পাকা দোকানদারের ন্যায় কখন বলেন না, তোমার জন্য আমি লোক্‌সান করিয়া এই জিনিষ বেচিতেছি। তিনি বলেন ব্যবসা ব্যাপার আমার উপজীবিকা, অতএব তোমার জন্য লোক্‌সান করিয়া বেচিতেছি এ মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। "ধর্ম্মে জয়, অধর্ম্মে ক্ষয়" এই কথা আন্তরিক বিশ্বাস করিতেন ; তাঁহার অভিধানে অধর্ম্ম মানে কেবল জাল, জুয়াচ্চুরি, প্রতারণা, ঠকবাজী নয় ; যে কোন কর্ম্ম, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, নীতি বিরুদ্ধ, শাস্ত্র বিরুদ্ধ, বিবেক বিরুদ্ধ, তাহাই তাঁহার নিকট অধর্ম্ম। তাঁহার দৃঢ় ধারণা অধর্ম্মে কখন মঙ্গল হয় না। ভগবানের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস, যে কোন কার্য্য করিতেন তাহাতেই ভগবানের দয়া ভিক্ষা করিতেন। তিনি জানিতেন ন্যায়সঙ্গত, ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যে ভগবানের দয়া পাওয়া যায়। অন্যায় কার্য্যে বা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে ভগবানের দয়া ভিক্ষা করা ভণ্ডামি মাত্র। ভগবানের করুণা সংসারের মঙ্গলের জন্য, অমঙ্গলের জন্য নয়।

ভগবানের দয়া অমঙ্গলের কারণ হইতে পারেনা, আবার ভগবানের কৃপা না হইলে মঙ্গল হইতে পারে না। তিনি জানিতেন ভগবান মঙ্গলময়

অমঙ্গল উদ্দেশে কেহ তাহার কৃপা পাইতে পারে না। যাহা তাঁহার প্রিয় নয়, সে কার্য্যে কখন কাহারও মঙ্গল হইবে না। তিনি আরো জানিতেন, দৈবের সহিত পুরুষকারের সংযোগ হওয়া চাই অথবা প্রকৃত কথা বলিতে গেলে পুরুষাকারের সহিত দৈবের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন; তুমি চেষ্টা করিবে না, তুমি কর্ম্ম করিবে না, অথচ তুমি সফল-কাম হইবে ইহা হইতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস—চেষ্টা, যত্ন, কর্ম্ম ও দৈব কৃপা এই কয়টী একত্রিত হইলে তবে সফল-মনোরথ হওয়া যায়, তিনি প্রায়ই বলিতেন, একত্রে যোগ ও বল; পার্থক্যে দুর্যোগ ও হতবল, পাঁচ ভাই একত্রে থাকিলে এক হাঁড়ীতে চলিবে। একটা হাঁড়ীর মূল্য চারি পয়সা, ৫টার দাম পাঁচ আনা, পৃথক হইলে এক আনার স্থলে পাঁচ আনা খরচ হইয়া যাইবে, একত্র থাকিলে একজন পাচকে পাঁচ ভাইয়ের রন্ধন চলিবে। একজনের ব্যারাম হইলে এক সঙ্গে থাকিলে আর চারজনে দেখিতে পারিবে। পুত্র কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে কারণে অনেকগুলি চক্ষুর প্রয়োজন। একের অপেক্ষা পাঁচজনের পরামর্শ অনেক স্থলে মূল্যবান ও স্বল্প ভ্রমাত্মক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেখিয়া ঠেকিয়া ও জানিয়াই একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। একদিন তাহার সহিত তাহার বন্ধু রমেশচন্দ্রের এ বিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা হইতেই তাহার মনের ভাব স্পষ্ট বোঝা যায়।

রমেশ ঃ—দেখ করম চাঁদ আমাদের এ হিন্দুদের এই একান্নবর্ত্তী প্রথা, পূর্ব্ব অবস্থার পক্ষে ভাল হইতে পারে, কিন্তু এখনকার অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে নয়; পূর্ব্বকালে সে প্রথার যে উপকারিতা ছিল, তাহা এখন আর নাই।

করম চাঁদ ঃ—কেন? তাহার কারণ?

রমেশ :—কারণ ইহাতে মানুষকে কুড়ে করে। মানুষ যখন দেখে একজন একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত লোক না খাটিয়া বসিয়া থাকিয়া অপরের উপার্জ্জিত অর্থে জীবনটা আরামে কাটাইয়া দিতে পারে, তখন সে খাটিবে কেন ?

করমচাঁদ :—সে তোমার একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার দোষ নয়, সে তোমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মহীন শিক্ষার দোষ। মনোবৃত্তি এরূপ অবৈধ ভাব ধারণ করে কেন ? একজন খাটিয়া মরিবে, আর একজন সচ্ছন্দে বসিয়া অন্যের উপার্জ্জনে জীবন রক্ষা করিবে, এ নীচ প্রবৃত্তি মনে জেগে উঠে কেন ?

রমেশ :—আমার বোধ হয়, এরূপ ইচ্ছা—স্বভাবজ ; কাহাকেও শিখাইতে হয় না। বরং যদি শিখাইতে হয়ত শ্রমশীলতার উপকারিতা। অন্যদিকে আমার যাহা ভাল লাগে, আমার সংসারের অপর একজনের হয় ত তাহা ভাল লাগিতে না পারে, আমি যাহা ভালবাসি অপরে হয় ত তাহা পছন্দ করে না।

করমচাঁদ :—যাহা সৎ ও মঙ্গলপ্রদ, প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিই তাহা ভালবাসে। অন্ততঃ সৎসঙ্গ ও সৎশিক্ষা পাইলে মনের এরূপ বিকার সম্ভব নয়। মনে থাকে, তুমি সামাজিক জীব, বনবাসী বনচারী নও। যখন অনেকগুলি মনুষ্য, সমাজে একসঙ্গে থাকিতে পারে, তখন এক পরিবারে, এক রক্তে জন্মলাভ করিয়া অল্প সংখ্যক লোক এক সঙ্গে থাকিতে না পারিবে কেন ? উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে অবশ্যই পারিবে। দেখ, আমাদের অনুষ্ঠানগুলি আমাদের সামাজিক গঠনের উপযোগী। থাকিতে পারে ইহাতে কিছু কিছু অসুবিধা—কিন্তু মোটের উপর লাভই অধিক। দেখ—এতদিন আমাদের সাধারণ হাঁসপাতালের প্রয়োজন ছিল না, কারণ বাটীতেই রোগীর শুশ্রূষার বন্দোবস্ত ছিল এবং সেবা

শুশ্রূষা অর্থ দ্বারা মাপা হইত না। প্রাণের টানে সম্পন্ন হইত। আমাদের বেতনভোগী সেবিকার প্রয়োজন ছিল না, সেই জন্য ঐ শ্রেণীর সেবিকাও তৈয়ারী হয় নাই। আমাদের বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া খুড়ী জেঠাই, মাসী, পিসী, ঠাকুরমা, দিদিমা প্রত্যেকেই রোগীর সেবা বিষয়ে সিদ্ধহস্তা ছিলেন। তোমরা একটী ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা শুনিয়া ভাবে গলিয়া যাও, আর আমাদের প্রত্যেক সংসারেই কতগুলি কষ্টসহিষ্ণু, পরসেবারতা, পরহিতব্রতা রমণী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের জীবনের মহৎব্রত সমাধা করিতেছেন তাহা কেহই লক্ষ্য করে না। হয়ত তুমি বলিবে বিভিন্ন বাটী হইতে আনীতা, বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্না রমণীগণ এক বাটীতে বাস করিবে কেমন করিয়া? তাহার উত্তরে বলিতে হয়, আজকাল এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে এক বাটীতে পাঁচটী বিভিন্ন জাতীয়া, বিভিন্ন স্থান হইতে আগতা, বিভিন্ন প্রকৃতির রমণী বাটী ভাড়া নিয়া একত্র বাস করিতেছে কেমন করিয়া? এক এক পরিবার দুই তিনটী মাত্র ঘর লইয়া, একই বাটীতে পাঁচ ছয়টী গৃহস্থ পরিবার একত্রে বাস করিতেছে কিরূপে? শাশুড়ী ননদের সহিত বনিল না, আর অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর সহিত বাস করিতেছে কিরূপে? তুমি বলিবে অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া; আমি বলি অবস্থার ব্যতিক্রম হেতু, বাধ্য হইয়া যাহা করিতে পার, সৎশিক্ষার গুণে তাহা স্বইচ্ছায় নিজ পরিবার মধ্যে করিবে না কেন? স্বভাবজাত কোন বাধা নাই, তবে ঈর্ষাজাত বাধায় এরূপ ব্যতিক্রম হয় কেন? একা থাকিতে বড় মজা, কিন্তু বিপদে, রোগে, শোকে যে একা থাকিয়াছে সে হাড়ে হাড়ে ভুগিয়াছে এবং প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে ইহাতে সুখ নাই। মুখে যাহাই বল আপন পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণকে খিদমদগারের বা চাকর চাকরাণীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাইতে তোমার সৎ সাহস নাই; সে অবস্থায় পড়িলে বুঝিতে পার

তোমার নিজ পরিবারের আরো পাঁচজন এক জায়গায় না থাকার বি অসুবিধা, বোঝ নিশ্চয়, তবে তর্কের খাতিরে স্বীকার করিতে চাহ আর নাই চাহ।

ভৈরবচাঁদ ও তারার এইরূপ কথোপকথনের দুই দিন পরে, করমচাঁদ ভৈরব চাঁদের আর একখানি চিঠি পাইলেন। চিঠিতে লেখা তিনি যত শীঘ্র পারেন, কলিকাতায় ভৈরবচাঁদের বাটীতে অতি অবশ্য আসেন, কোন এক বৈষয়িক ব্যাপারে তাহার সহিত আশু পরামর্শের প্রয়োজন। করমচাঁদ পত্র পাইয়া একটু মর্ম্মাহত হইলেন, অপরের সাংসারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তিনি একেবারেই নারাজ। তাহার মত প্রত্যেকেই নিজের নিজের বৈষয়িক ব্যাপার নিজে দেখুন। কুটুম্বের পরামর্শ যত কম নিতে ও দিতে হয় ততই মঙ্গল। তিনি বলেন আমার সংসার আমি নিজে দেখিব ও বন্দোবস্ত করিব। আমি চাহি না অপরে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে; তবে আমি অন্যের বৈষয়িক ব্যাপারে কেন হস্তক্ষেপ করিব? যাহাহউক যখন বৈবাহিক তাহার পরামর্শ চাহিতেছেন, তিনি যাইতে বাধ্য, পরামর্শ দেওয়া বা না দেওয়া পরের কথা। পূর্ব্ব হইতেই নিজ জামাতার সংসর্গ দোষের কথা কতকটা অবগত ছিলেন, উপায়ান্তর না থাকায় সে বিষয়ের ভার ভাগ্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। করমচাঁদবাবু এলাহাবাদেরই পক্ষপাতী, পারতপক্ষে কলিকাতায় আসিতে নারাজ; তাহার বিশ্বাস কলিকাতা অপেক্ষা এলাহাবাদে তিনি ভালই থাকেন।

তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য হুসিয়ারনাথ কেবল তাহার সঙ্গে আসিল; সে দেহাতের লোক দেহাতেই তাহার জন্ম। কেবল চাকরী সূত্রে মুনিবের কাছে থাকে। সে কলিকাতায় ধন বাহুল্যের কথা ও সহর সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়া আসিতেছিল, আরও শুনিয়া-

ছিল পশুশালার কথা, থিয়েটারের কথা, বায়স্কোপের কথা, ট্রামের কথা টেলিফোনের কথা, বড় বড় অট্টালিকার কথা, তার চেয়েও শুনিয়াছিল বড় বড় লোকজনের কথা, সেই কারণে মুনিবকে বলিয়া কহিয়া তাঁহার সঙ্গে আসিল। কলিকাতায় আসিয়া করমচাঁদ তাহাকে হুসিয়ার হইয়া খুব সাবধানে থাকিতে পরামর্শ দিলেন, বলিলেন কলিকাতা অতি বিপদ-সঙ্কুল স্থান। ঐখানে ডাঙ্গায় হাঙ্গর—কুম্ভীর অনেক; আর চলিয়াছে বুনো শুয়ারের মতন মোটর গাড়ীর সার, সর্ব্বদাই দৌড়াইতেছে, একটু অসাবধান হইলেই আর রক্ষা নাই, প্রাণান্তক। করমচাঁদ বাবু ভৈরব-চাঁদের নিকট জামাতার সমস্ত নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ও নিকৃষ্ট ব্যবহারের কথা আনুপূর্ব্বিক শুনিলেন। শুনিয়া প্রাণে বিশেষ ব্যথা পাইলেন এবং অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে বলিলেন, বলেন কি বেহাই মহাশয়—বাবাজিটি একেবারে গোল্লায় গেছে এখন উপায়?

ভৈরবচাঁদ :—সেই জন্যই ত আপনাকে আসিবার জন্য এত অনুরোধ করা। আমার ত কিছুই বুদ্ধিতে আস্‌ছে না।

করমচাঁদ। (কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া)—এ তিনটি দোষই সাংঘাতিক, পান দোষ, বেশ্যাসক্তি ও জুয়াখেলা। "কসবি, জুয়া, পান, উচ্ছন্নের পথে জোরে দেয় টান" এ তিনটাই সমান, কোনটাই কম নয়। যাহা শুনিলাম তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, বিপদ ঘোরতর। আচ্ছা, বৈবাহিক মহাশয় ইহাকে টাকা দেন কেন? টাকা না পেলে ত এত দুষ্ট হইত না। জহুরীর ছেলে এরকম হল কেন? শুনিয়াছি এসব ত বাঙ্গালীর ছেলের রোগ।

ভৈরবচাঁদ :—বৈবাহিক মহাশয় আমরা ত প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী; বাঙ্গালার জল হাওয়া, কয়েক পুরুষ হইতে পান ও সেবন করিয়া আসিতেছি। বাঙ্গালী আমাদের প্রতিবেশী, বাঙ্গালী আমাদের বন্ধু বান্ধব,

আমরা ত প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী তবে বাঙ্গালীর দোষ দেন কেন? দোষ আমাদের অদৃষ্টের। দোষ আমাদের নিজ নিজ কর্ম্মের।

করমচাঁদ:—বৈবাহিক মহাশয় বাঙ্গালার বিশেষতঃ কলিকাতার ব্যবসার ইতিহাস দেখুন। অনেকদিন পূর্ব্বে অন্তর্বাণিজ্য ব্যবসা সমস্তই বাঙ্গালীর হস্তেই ছিল এক পান ও বেশ্যাসক্তি দোষে, পরে সেই সমস্ত ব্যবসা তাহাদের হস্ত হইতে ক্ষেত্রীদের হস্তে গেল। যখন ক্ষেত্রীদের আবার দোষ ধরিল তখন সেই সমস্ত ব্যবসা মারোয়ারীর হস্তে গেল, এখন মাড়োয়ারীদের আবার সেই সব দোষ ধরিয়াছে, এইবার বাণিজ্যলক্ষ্মী কাহাকে কোল দেন, বলা বড় কঠিন। বাঙ্গালীরা এই সময় চেষ্টা করিলে পুনরায় লক্ষ্মীদেবীর কৃপাভাজন হইতে পারেন। নচেৎ ভাটিয়াদের ভাগ্যে নাচিতেছে। আর বাঙ্গালীরা এখন ব্যবসাকে তাচ্ছিল্য করিয়া রাজনৈতিক বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন, কিন্তু অগ্রে অর্থাগম চাই, তবে ত দেশের মঙ্গল করিতে পারিবে। এটা ঠিক মনে রাখিবেন, পান দোষে দুষ্ট, বেশ্যাসক্ত ও জুয়ারী এ তিনজনকে লক্ষ্মীদেবী কখনও কৃপা করেন না। যে ব্যক্তি এই সব দোষে দোষী তাহার যতই অর্থাগম হউক না কেন, তাহা ভোজবাজীর মত উড়িয়া যায়। শত ছিদ্র চালুনীতে যেমন জল আটকায় না, এই সব দোষে দুষ্ট মানুষের অর্থ সংগ্রহ সেইরূপ হইতে পারে না। এই ত্রি-দোষের একটা আসিয়া জুটিলে অপর দুইটীকে যেন আপনা হইতে ডাকিয়া আনে, কান টানিলে মাথা আসার ন্যায়, একটী এলে আর দুটীকে টেনে আনে। জহুরীর ছেলে এত বোকা হয় তা ত, আমি অগ্রে জানিতাম না।

ভৈরবচাঁদ:—বেহাই এখন উপায়?

করমচাঁদ:—চেষ্টা করিতে হইবে; যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। প্রত্যেক পিতারই পুত্রের জন্য মায়া মমতা সমান; তবে কেহ বাহিরে

প্রকাশ করেন, কেহ করেন না, আপনি উহাকে আর অধিক পরিমাণে টাকাকড়ি দিবেন না। প্রকাশ করুন আপনি সমস্ত সম্পত্তি সত্যনারায়ণ জিউর সেবায় অর্পণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিবেন। এবং সত্যসত্যই দুএক মাসের মধ্যেই গৃহত্যাগ করিয়া কোন তীর্থস্থানে চলিয়া যান। বেয়ান ঠাকুরাণীকে আপনার সঙ্গে লইয়া যাইবেন; তাহার স্ত্রী ও দুইটী পুত্র অর্থাৎ আমার কন্যা ও আপনার পৌত্র দুইটী তাহার কাছে থাকিবে। আর প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের একটা ব্যবস্থা করুন যাহাতে সে সমস্ত সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে না পারে। কিছুদিন কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়া অন্যত্র অবস্থান করুন। কেবল হরেকচাঁদ, স্ত্রী ও পুত্র লইয়া এখানে থাকুক। মুনিমজিকে আপাততঃ এখানে রাখিয়া যাইবেন। প্রয়োজন হইলে সেও তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। আপনার পুত্র এখন নিজে পিতা হইয়াছে তাহার কতকটা দায়িত্ববোধ নিশ্চয়ই হইয়াছে। আর আত্মমর্য্যাদা যথেষ্ট আছে। যাহাই হউক মুর্শিদাবাদের আফ্‌তাফ্‌চাঁদের বংশধর ত বটে, কোন ক্রমেই আমার সাহায্য গ্রহণ করিবে না। আর আমার কন্যা ও দৌহিত্ররা তাহাদের যতই কষ্ট হউক, কোন ক্রমেই হরেকচাঁদের সঙ্গ ছাড়িবে না। পেয়ারী হিন্দুর মেয়ে সে স্বামী ছেড়ে কোথাও যাবে না, বাপের ঘরও নয়।

ভৈরবচাঁদ :—তা ত বুঝলাম। সেত এখন মাতোয়ারা, যদি অভাবে পড়িয়া আরো খারাপ হয়, যদি বউমার ও নাতি দুটার উপর অত্যাচার করে।

করমচাঁদ :—যতই খারাপ হউক, সেত আপনার ঔরসজাত তারাবাইয়ের পুত্র, নিজ বিবাহিত স্ত্রী ও নাবালক পুত্রদ্বয়ের প্রতি কখন অত্যাচার করিবে না। সে বুঝিয়াছে, এখনও বাবা আছেন, উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহার স্ত্রীপুত্রের কোন কষ্ট নাই, একটু আমোদ করে লই,

তাতে সংসারের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। তবে সে যদি বোঝে, এতে আপনি বাস্তবিক দুঃখিত, এটা হাসি ঠাট্টার কথা নয় এরূপ করিলে বাস্তবিক তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।

আর যখন তাহার বংশ-মর্য্যাদায় আঘাত লাগিবে, তখন সে নিশ্চয় শোধরাইবে। অর্থাগম কম পড়িলে তাহার বন্ধুরা অর্থাৎ তাহার কুসঙ্গীরা তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। মনে থাকে লক্ষ্মীছাড়ারা লক্ষ্মীর বরযাত্রী যখন জাহাজখানি ডোবে মূষিক পর্য্যন্ত সেখানি ত্যাগ করে, তাহারা যখন দেখিবে হরেক চাঁদের টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা নাই, তখন তাহারা, তাহার পিয়ারের ছুঁচোগুলো ছোঁ ছোঁ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া পলাইবে। তাহারা স্কন্ধ হইতে নামিয়া গেলে, তখন হরেক চাঁদ আপনার উপযুক্ত পুত্র হইতে পারিবে। আর এক কথা সত্য নারায়ণজি আপনাকে এত অর্থের মালিক করিয়াছেন কেন, তাহা জানেন? আপনার হস্তে অর্থ আসিলে সদ্ব্যবহার হইবে বলিয়া। প্রত্যেক নরনারী ভগবানের সন্তান। আপনি আপনার সন্তান কুপথগামী বলিয়া অনেক কষ্ট পাইতেছেন। দেখুন এমন একটী কোন কাজ করিয়া যান, যাহাতে অনেক দুঃখী নরনারীর দুঃখ দূর হয়, জীবনে শান্তি আসে। আমাদের যে সামাজিক অবস্থা তাহাতে ভদ্র-ঘরের বিধবাদের যে কি কষ্ট তাহা আপনি অনুভব করিতে পারেন না, সচ্চরিত্র হিন্দু বিধবার অর্থাগমের কোন সম্ভাবনা নাই। তাহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছে। কাযেই অন্য কোন কাজ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে না। আজ কালকার আত্মীয় স্বজনদের যে মতিগতি, তাহাতে আত্মীয়া বিধবাগণকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়া সুখ শান্তিতে সংসারে রাখিতে তাহারা নারাজ বা অপারগ। আজকাল বিধবা ভগ্নীর, বিধবা ভাগ্নীর, মাসী, পিসীর, এমন কি আপন গর্ভধারিণী মাতারও সময় সময় কি কষ্ট তাহা কি আপনি জানেন?

তাঁহারা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া ক্ষুধায় একমুষ্টি অন্ন পান না, শীতের এক-খণ্ড বস্ত্র পান না। জানি তাঁহাদের অভাব অতি স্বল্প। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের অভাবের সীমা নাই, দুঃখের অবধি নাই ; এমন কি যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিও তাঁহারা পান না। তাঁহাদের "দিনরাত কান্না," পেটে ভাত তাহাও জুটে না। যদি জিজ্ঞাসা করেন এরূপ হয় কেন তাহার কারণ অনেক।

১ম। মানুষ ভাবে, যে সে নিজের প্রতিভাবলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাহার কর্ত্তব্য করা না করা তাহার নিজের ইচ্ছাধীন, না করিলে কোন দোষ নাই।

২য়। ভগবানে বিশ্বাস নাই অথবা যদি থাকে তবে এত অল্প যে নাই বলিলেও চলে।

৩য়। সে জানে মানুষের আইনে এসব কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য তাহার বিরুদ্ধে নালিশ চলে না। মনুষ্য কৃত আইনে এসব কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য কোন বিশেষ শাসন নাই।

৪র্থ। অধুনাতন ধর্ম্মহীন শিক্ষার দোষে মানুষের বিশ্বাস যে, অন্যের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলে, যদি মানুষকৃত আইনের কব্‌জির মধ্যে না পড়ে, তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণ নিস্তার, আর কোন ভয় নাই।

৫ম। যিনি জোরে বা আইনের বলে, বাধ্য করিতে না পারেন, তাঁহাকে আবার সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়োজন কি ?

৬ষ্ঠ। চারিদিকের আদর্শের অনুকরণে তাহার সৎ মনোবৃত্তিগুলি একেবারে মৃত অথবা নষ্ট হইয়া যায়।

৭ম। লোকে খালি নিজের সুবিধা খুঁজিতেছে। ধর্ম্ম বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে অথবা সমাজের নিকট দায়িত্ব আছে ইহাতে তাহার বিশ্বাস আদৌ নাই।

৮ম। "মাকড় মার্লে ধোকড় হয়।" কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিলে, আইনে যদি অত্যাচারীকে আটকাইতে না পারে, তবে তাহার কোন প্রতিকার নাই, এই মহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। অনেক সময় তাই এই সকল দুঃস্থা অসহায়া আত্মীয়া বিধবাদের নিকট হইতে শত শত টাকার মূল্যের উপকার পাইয়াও সামান্য এক টাকা দিতেও নারাজ।

তাই বলিতেছিলাম যদি পারেন ত তীর্থস্থানে অসহায়া দুঃস্থা হিন্দু বিধবাদের জন্য একটী আশ্রম করিয়া দিন। সেখানে তাহারা থাকিবে, গঙ্গাস্নান করিবে, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণাদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও দেবার্চ্চনা করিবে; অনাথ শিশুদেরও সেখানে রাখিতে পারেন। এক একটী বিধবা এক একটী শিশুর লালন-পালন করিবে এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। অবশ্য খরচ আপনার। আপনার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, সেই কারণেই আপনাকে একথা বলিতেছি।

ভগবানের সেবা, ভগবানের সৃষ্ট জীবের সেবাতেই হইতে পারে, তিনি অনাদি, অনন্ত, অশরীরী, জগতের মঙ্গলই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার সেবা তুমি, মানুষ কি করিবে? তাঁহার সৃজিত জীবগণের দুঃখের ভার কতকটা মোচন করিতে পারিলেই তাঁহার সেবা করা হইল। এই সকল নিঃসহায়া মৌনা অনাথা বিধবাদের সেবার চেয়ে কি বড় সেবা অন্য কিছুতে হইতে পারে? দেখুন পূর্ব্বে যখন মানুষ কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিল, যখন ধর্ম্মশিক্ষা ছিল, যখন তাহাদের ভগবানে যথার্থ বিশ্বাস ছিল, যখন তাহারা দয়াকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানিত, যখন তাহাদের প্রাণ ছিল, তখন এরূপ আশ্রমের প্রয়োজন ছিল না। তখন প্রত্যেক মানুষই নিজ নিকট আত্মীয় বিধবাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করিত। তাহারা সংসারের কর্ত্রী হইয়া থাকিত। ধর্ম্মভাব ছাড়িয়া দিলেও সাংসারিক হিসাবে দুঃস্থা অসহায়া বিধবার চেয়ে তাহার নিজের সুবিধা অধিক, কারণ

তাহাদের কাছ হইতে তিনি সাংসারিক বিষয়ে যে সাহায্য পান তাহা টাকায় ওজন করা যায় না। আজ ভ্রাতা লম্বা কোঁচা করিয়া, সমাজে কৃষ্ণবিষ্ণু হইয়া বিচরণ করিতেছেন, গাড়ী চড়িতেছেন, মোটর হাঁকাইতেছেন, সমাজে একজন মাতব্বর ব্যক্তি, আর তাঁহার অসহায়া অনাথা ভগ্নী না খাইয়া মরিতেছে। সহায়সম্পত্তিহীনা আশ্রয়হীনা মাসী পিসী কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছেন। তাঁহাদের জন্য তাহার ঘরে স্থান নাই, তাহাদের ক্ষুধায় অন্ন নাই, তথাপি কোন সহানুভূতি নাই; আর তাহার স্ত্রীর 'বকুল ফুলে'র জামাই অনায়াসে তাহার বাটীতে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। কেন না প্রথমতঃ, স্ত্রীর অনুরোধ, দ্বিতীয়তঃ তাহার নিজেরও একটু সুবিধা। দুজনে মিলিয়া একসঙ্গে একটু পান করা চলে, আর তাহার আশ্রিতের আত্মীয়দের নিকটও কাহারও নিজ নিজ নাম জাহির হয়। সমাজের এমন হীন অবস্থা যে এ হেন কৃতকর্ম্মের জন্য, কোন সমাজ-শাসন নাই; সকলেই তাহাকে "দোষ প্রমাণ হইল না" বলিয়া ছাড়িয়া দেন, কারণ সে প্রায়ই বলিয়া বেড়ায়, নিকট আত্মীয় যে কষ্ট পাইতেছে সে তাহাদের নিজেদের দোষে; তাহার কোন অপরাধ নাই। ইহার পর বিধবার তরফ হইতে বলিবার কে আছে? যাহার বলিবার কথা সে উল্টা গাহিল; তখন তার তরফে বলে কে? সে হিন্দু বিধবা আপনার অদৃষ্ট ভিন্ন অন্য কাহাকেও দোষ দিতে জানে না বা শিখে নাই; অপর পক্ষে তাহার নীচ, কুটিল, নির্ম্মম, নির্দ্দয় নিকট আত্মীয়গণ ও তাহার উচ্ছিষ্টভোজী সাঙ্গোপাঙ্গ সমূহ ক্রমান্বয়েই তাহার নিন্দাবাদ করিতেছে। সুতরাং এরূপ স্থলে বিধবাদের অবস্থা "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?" মনে থাকে যেন, পয়সা তোমার যতক্ষণ, তোমার সদ্ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ততক্ষণ, নহিলে শত ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছুই করিতে পারিবে না।

আমার আর একটী প্রস্তাব আছে আপনি হয়ত শুনিলে হাসিবেন, আমাকে বাতুল বলিবেন, কিন্তু সে কার্য্যটী বিশেষ হিতকর, ও নিতান্ত আবশ্যক, বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও চলে না—একটী বিপত্নীক আশ্রম স্থাপন করা। আমাদের দেশে যথেষ্ট অসহায় অনাথ নিঃস্ব বিপত্নীক আছে। অনেকের পুত্র কন্যা বা নিকট আত্মীয় নাই; থাকিলেও অনেক সময় নিকট আত্মীয়েরা তাহাদের ভার লইতে অনিচ্ছুক, যদি কোন তীর্থস্থানে কিম্বা স্বাস্থ্যাবাসে এই দুঃস্থ নিঃসহায়দের জন্য আশ্রম করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক অসহায় বৃদ্ধের বিশেষ উপকার করা হয়, এই সব আশ্রমে একটী দুইটী বা ততোধিক ধর্ম্মশিক্ষক রাখিয়া দিলে এই সব আশ্রমের লোকদিগকে ধর্ম্ম-চর্চ্চা বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে, এরূপ করিলে তাহাদের প্রভূত উপকার করা হয়। অনেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ আছে, যাহাদের জীবনের শেষদিনগুলি অতিশয় অন্ধকারময়, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, কোন দিকে আলোর রেখা দেখা যায় না, মনে হয় যেন এই অসহায় জীবগুলি ভগবানের সৃষ্ট নয়। তাহাদের স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, অথবা থাকিয়াও নাই, আত্মীয়স্বজনও তদ্রূপ নিজের সন্তান সন্ততি লইয়া সদাই ব্যস্ত; হয় ইচ্ছা নাই, না হয় সুবিধা বা উপায় নাই। বহু পুত্র কন্যা ভারাক্রান্তের পক্ষে সময়ে সময়ে বৃদ্ধ পিতার বা বৃদ্ধ আত্মীয়ের সেবা করা একেবারে ক্লেশদায়ক। এসব বয়ঃস্থ নিরুপায় বিপত্নীকের স্থান কোথায়?

দেখুন, বৈবাহিক মহাশয় নিঃসহায়া নিঃস্ব বিধবা ও বৃদ্ধ বিপত্নীকদের অবস্থা দেখিলে বিশেষ ভাবিবার কথা; মনে হয় তাহাদের আত্মীয়স্বজন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, অর্থ পিশাচ সমাজ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ভগবানের ধর্ম্ম মন্দিরের ধর্ম্ম যাজকেরা তাহাদিগকে

পরিত্যাগ করিয়াছে। মনে ভ্রম হয়, যেন ভগবানও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতার ন্যায় পৃথিবীর মত বড় সহরে তাহাদের স্থান নাই; ধর্ম্ম মন্দিরে তাহাদের স্থান নাই, ধরমশালায় তাহাদের স্থান নাই, আত্মীয় স্বজনের বাটীতে তাহাদের স্থান নাই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকায় তাহাদের স্থান নাই, কুঁড়ে ঘরেও তাহাদের স্থান নাই।

বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য রুগ্ন, শোকে দুঃখে, অর্থকৃচ্ছ্রতার তাড়নায় ভগ্নস্বাস্থ্য, এসব লোকের স্থান কোথায়? কেবল ভগবানের ক্রোড়ে; কিন্তু যত দিন পতিতপাবনী, গঙ্গাদেবী, তাহাদিগকে ক্রোড়ে স্থান না দেন, ততদিন তাহারা থাকে কোথায়? তাহারাও ত ভগবানের সৃষ্ট জীব। একদিন যাহারা জীবন যুদ্ধে যতদূর সম্ভব নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়াছে, যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়াছে, তারাও তোমার মত ঈশ্বরের অনুগ্রহকণা লইয়া এ জগতে আসিয়াছিল। যতটুকু সম্ভব দুঃখে সুখে আশায় হতাশায় জীবন যাপন করিয়াছে; এখন তারা যায় কোথায়?

তোমরা চিড়িয়াখানা করিয়াছ জানোয়ার রাখিতে ও পালিতে; তোমরা যাদুঘর করিয়াছ মরা জীবজন্তু রাখিবার জন্য। ধরমশালা করিয়াছ বিদেশীকে সাময়িক আশ্রয় দিবার জন্য। গোশালা করিয়াছ রুগ্ন দুর্ব্বল বৃদ্ধ গোজাতির জন্য। ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে যাত্রিগণের বিশ্রামাগার করিয়াছ। জাহাজে উঠিবার আগে, অল্প সময় কলিকাতা সহরে অপেক্ষা করিতে, ইডেন গার্ডেনের পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্ব্বকুলে, পান্থের কষ্ট লাঘবের জন্য বিশ্রামাগার পর্য্যন্ত করিয়াছ, কিন্তু হায় নিজ দেশে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আগন্তুক, যাহাদের সব আশা ভরসা মিটিয়া গিয়াছে; আত্মীয়, স্বজন, আশা, ভরসা, বৈভব, সম্পদ্ সব যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহারা কেবলমাত্র ভগবানের কোলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের বিশ্রামাগার কোথায়?

তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? বৈবাহিক মহাশয় আপনি তাহাদের জন্য একটী বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করুন। একটা পান্থনিবাস প্রস্তুত করুন। ইহাতে অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিবেন, দেখুন আমি নিজে বিপত্নীক; বিপত্নীকদের অভাব অভিযোগ ভাল বুঝিতে পারি। আমার পয়সা আছে সত্য, কিন্তু আমাকে দেখবার আছে কে? বেতনভোগী লোকজন, অর্থক্রীত সেবক, ধনলোলুপ আত্মীয় স্বজন, তাহারা সকলেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত, সকলেই নিজের স্বার্থ অনুসন্ধানে সচেষ্ট, আমাকে দেখে কে? তাহাদের মতিগতি অন্য-দিকে। যখন আমি আর একজন সমবেদনায় ব্যথিত বিপত্নীককে দেখি ও আলাপ করি, তখন নিজের অবস্থা বেশ বুঝি, ও বেশ অনুভব করি, আর একটু সহানুভূতির আরামও লাভ করি। আমারও মনে হয় প্রভূত অর্থ সত্ত্বেও যদি এই আরাম আশ্রমে আমার ন্যায় ভুক্তভোগী আরো অনেক মনঃকষ্ট-ক্লিষ্ট লোকের সহিত খানিকক্ষণ মিলিত হই, তখন কতকটা আরাম পাই। আমার অর্থ আছে সামর্থ্য আছে সেই জন্য অনেক সময় লোকে নানান রকম আবেদন অভিযোগ লইয়া আমার কাছে আসে, কিন্তু সেই দলের মধ্যে একজনও কি আমার কষ্টে সমবেদনা অনুভব করে? কখনও না। তাহাদিগের নিজ নিজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, আমার সহিত সমবেদনা দেখাইবার তাহাদের সময় কোথায়? যে দিন মাতাঠাকুরাণী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সেদিনই নিঃস্বার্থ ভাবে সেবার লোক চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর যে দিন আমার সহধর্ম্মিণী আমাকে রাখিয়া অগ্রগামিনী হইয়াছেন, সেই দিনই তিনি আমাকে জীবনের সুখসাগরের অপর পারে পহুঁছিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন জনাকীর্ণ নির্জন গৃহারণ্যে আমাকে বাস করিতে হইতেছে, আমার মনোবেদনা বুঝিবার ক্ষমতা, বুঝি আমার ন্যায় যে অভাগা সে ছাড়া আর কাহারও নাই। বৈবাহিক

মহাশয় আপনি এইরূপ দুর্ভাগাদিগের জন্য একটী আশ্রম করিয়া দিন। ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন।

এই সময়ে হুসিয়ারনাথ আসিয়া উঁকি মারিয়া দরজার কাছ থেকে বলিল—শেঠ-জি যদি হুকুম দেন আমি একবার গঙ্গাস্নান করিয়া আসি। করমচাঁদ বলিলেন হুসিয়ার, হুসিয়ার হয়ে কলিকাতার রাস্তায় চলো, দেখো যেন, মুস্কিলে পড়ো না।

হুসিয়ার :—শেঠ-জি, আমি একজন সামান্য গরীব নকর, আমার আবার বিপদ কি? আমার আর বিপদের আছেই বা কি?

করমচাঁদ :—হেরে হুসিয়ার, কিছু না থাকলে কি বিপদ হয় না?

হুসিয়ার :—গাড়ী চাপা বা ধাক্কা খাওয়া, এ ছাড়া বিপদ আর আমাদের কি হতে পারে শেঠ-জি?

ভৈরবচাঁদ :—যদি যাবে তবে সঙ্গে একটা লোক নিয়ে যাও।

হুসিয়ার :—না শেঠ-জি, লোকের আবার কি দরকার? আমি একাই যাচ্ছি রামচরণ এখন এখানে হাজির থাক।

হুসিয়ার :—(করমচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া) শেঠ-জি একটী বাবু আপনার সহিত দেখা করিতে এসেছেন।

করমচাঁদ :—কে রে? আমি যে এখানে আছি সে জানলে কি করে?

ভৈরবচাঁদ :—প্রয়োজন, অভাব, অভিযোগ এর মধ্যে যা হয়, একটা কিছু তাহাকে এখানে তাড়িয়ে এনেছে।

করমচাঁদ :—আচ্ছা, পাশের ঘরে বসতে বল। আমি ত, নিজের প্রয়োজন, অভাব অভিযোগ নিয়ে ব্যস্ত, সে আবার তাহার প্রয়োজন অভাব অভিযোগ নিয়ে আমার কাছে কেন? একি রহস্য? অভাবের নিকট অভাবের অভিযোগ। অযোগ্যস্থানে দুঃস্থের প্রার্থনা।

দশম পরিচ্ছেদ

"বড় সহরে বড় বিপদ"

হুসিয়ার অনেক দিন ধরিয়া করমচাঁদ বাবুর খানসামা, সে তাহার নিজ কাজে বিশেষ হুসিয়ার। লেখা-পড়া জানে না নিরক্ষর বটে, নিরক্ষর হইলেও নিতান্ত গণ্ডমূর্খ নয়। তাহাকে যে সকল কাজ করিতে হয়, তাহা সে বেশ বুঝে, আর সুন্দর ভাবে সম্পাদন করে। তাহার প্রধান গুণ সে অলস নয়, কাজ করিতে ভয় পায় না, গতর খাটাতে খুব মজবুত, কাযেই কোন কর্ম্মে পেছ্‌পা নয়। পাড়ার লোকে বলে তার বাপ মা বুঝে সুজে তাহার নাম রেখেছিল হুসিয়ার। নামের সার্থকতা আছে। হুসিয়ার বিবাহ করিয়াছে; তাহার স্ত্রীর নাম ক্ষেতিয়া। করমচাঁদ বাবুই তাহার বিবাহে বেশীর ভাগ ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন। তাহার জাতে, মেয়ে কিনিতে হয়, বিবাহের জন্য মেয়ের বাপকে পয়সা দিতে হয়। সেই জন্য কন্যাকে আদর করে, কেননা কন্যার জন্ম, মাতাপিতার সর্ব্বস্বান্ত হইবার নোটিশ নয়, তাহারা ভগ্নাকে যত্ন করে স্ত্রীকে ভালবাসে। কখন স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে না। কারণ একটী গেলে আর একটী মিলা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যয়সাধ্য। আজকাল ভদ্র ঘরে বিপুল যৌতুকসহ বধূ আনিয়া অবশেষে পুত্রবধুকে অযত্ন করিতে দেখা যায়, এমন কি সময়ে সময়ে প্রহার করিতে বা অন্য নানা প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিতেও শোনা যায়। অনেক সময় বলিতে শুনা যায় এ বধূটা তেমন মনের মতন হয় নি, তত অধিক অর্থও আনে নাই, তেমন কর্ম্মিষ্ঠা নয়, এটা যায় যাক্‌, আর একটা বধূ আনা যাবে। আসল মনের

ভাব কিছু অধিক অর্থাগম হবে। আজকাল ভদ্র সমাজে বিবাহের কালে বেচা কেনা হয়; ছোট লোকের ঘরে কন্যা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বধূর যে যত্ন আছে, ভদ্রঘরে তাহা নাই। বধূর জন্য বধূর যত্ন নাই বলিলেও চলে, বধূর পিতার নিকট হইতে অর্থাগমের অবলম্বন বলিয়া যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন ততটুকু সহ্য করে; আন্তরিক আদর যত্ন বড় একটা নাই, সে যাহাই হউক হুসিয়ার ক্ষেতিয়াকে ভাল বাসিত, যত্ন করিত। হুসিয়ারের মা ও বহিন সকলেই ক্ষেতিয়াকে পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত। হুসিয়ারের মা প্রায়ই বলিত বহুমা না হইলে আমার বংশ থাকিবে কি করিয়া? আমার বুড়া বয়সে দানা পানি দেবে কে? ব্যারামের সময় দেখবে কে? হুসিয়ার বউকে লইয়া সংসারি হবে। এই সব ছোট ঘরে এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া, পুত্র পুত্রবধূরা শ্বশুর শাশুড়ীর বৃদ্ধ বয়সে, দানা পানি দেয়। ব্যারামের সময় দেখে। অন্যদিকে পুত্রবধূ এত ভালবাসে বলিয়া, শ্বশুর শাশুড়ীও এত যত্ন করে। আর ভদ্রঘরের মা লক্ষ্মীরা অধিকাংশ সময়ে সে সেবা ও যত্নটুকু নিজে না করিয়া, বিশেষ দয়াপরবশ হইলে, চাকর চাকরাণীর হাতে ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। সেই কারণে শাশুড়ী ঠাকুরাণীরা গোড়া হইতে তাহাদের আগমনে একটু ত্রস্ত হন। হুসিয়ার চাকরী করিয়া ক্ষেতিয়াকে কয়খণ্ড রূপার গহনাও দিয়াছিল। দুই এক টুকরা সোণার গহনাও দিয়াছিল। হুসিয়ারের নিজের গলায় একখানি সোণার পদক ও হাতে এক গাছা রূপার অনন্ত ছিল। তাহাদের বিশ্বাস অলঙ্কারের সার্থকতা আছে। বর্ত্তমান অর্থনীতিজ্ঞ পাণ্ডাদের মতের সঙ্গে এ শ্রেণী লোকের বিশেষ মতভেদ আছে। অর্থনীতিজ্ঞ পাণ্ডারা বলে গহনায় যে টাকা আবদ্ধ থাকে, তাহাতে সেই অর্থ পুনরায় বাচ্ছা পাড়ে না, কিন্তু হুসিয়ারের সমশ্রেণী লোকেদের বিশ্বাস অন্যরূপ, তাহারা বলে "অলঙ্কার শুধু অলঙ্কার নয়, ইহা সময়ে আভরণ, অসময়ে পেট ভরণ।"

হুসিয়ার ট্যাঁকে চারিটী পয়সা লইয়া বাটীর বাহির হইতেছে, এমন সময় দ্বারবান বলিল, এ হুসিয়ার খুব হুসিয়ার, কলকাত্তামে বহুৎ ঠক জোয়াচোর হায়, কোই না কোই তোম্‌কো ঠকলইকে সব লে লেগা।

হুসিয়ার বলিল দ্বারবান জি, আমি মোটে চারিটী পয়সা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তিলক কাটবো, ঠাকুর দেখবো, আর কাণা খোঁড়াকে দিব। আমাকে আবার ঠকাবে কি ?

দ্বারবান্‌জি হুসিয়ারকে গঙ্গার ঘাটের পথ বলে দিল। হুসিয়ার মনের আনন্দে পথে চলিল। যা দেখে তাতেই আশ্চর্য্য হয়। বাপরে ! এ সহরে কি কেবল দোকান, এত লোক যদি বেচে, তবে কেনে কে ? প্রত্যেক বাটীর তলায় দোকান ঘর, ফেরিওয়ালার চীৎকারে কান ঝালাপালা, ঘুগনিদানা হইতে গেঞ্জি জামা, পর্য্যন্ত সব জিনিসের বিক্রীর আওয়াজ, হুসিয়ারের বিশেষ আশ্চর্য্য, লোকের কানে তালা লাগে না। চলিতে চলিতে হুসিয়ার পাথরের শিল নোড়ার বিপণী শ্রেণী দেখিয়া ভাবিতে লাগিল। একখানি শিল কিন্‌লে সাতপুরুষ চলিয়া যায় এত শিল হয় কি ? কে কেনে ? এসহরের লোকে কি কেবল বেচা কেনা করে, খায় দায় না ; খানিক পরে তাহার নজর পড়িল, কতকগুলি খাবারের দোকানের দিকে। দেখিয়াই, ভাবিল "ইস এত এত খাবার খায় কে ? এ দেশের লোকে কি রাঁধা বাড়া করে না, খালি খাবার কিনে খায়। ঐরূপ যাহা দেখে তাতেই ভাবে ও আশ্চর্য্যান্বিত হয়, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়াছে ; এমন সময় একটা মুটিয়া মোট মাথায় করিয়া দৌড়াইতেছে। হুসিয়ার তাহার সামনে পড়ায় তাহাকে এক ধাক্কা লাগিল, অবশ্য ইচ্ছা করে নয়, চলিতে চলিতে হঠাৎ লাগিয়াছে, কিন্তু ধাক্কা খেয়ে হুসিয়ার একেবারে চিৎপটাং। লোকে তাহার গায়ের উপর দিয়াই চলিয়াছে, কেহ তাহার

জন্ত অপেক্ষা করিল না, কেহ তাহাকে সহানুভূতি করিল না। অতি কষ্টে হুসিয়ার উঠিয়া গা ঝাড়িল। ততক্ষণ মুটে মোট মাথায় করিয়া কত দূরে চলিয়া গিয়াছে। কোনরূপে উঠিয়া গা ঝাড়িয়া সে মনে করিল সদর রাস্তায় চলা সুবিধাজনক নয়, সে কলিকাতার পথ চেনে না, তা না হউক গলির পথেই যাইবে, আবার ভাবিল তাহা হইলে পথ হারাইবে। কাযেই শেষ ঠিক করিল সদর রাস্তা ধরিয়া সাবধানে যাইবে।

খানিক দূর যাইয়া হুসিয়ার চৌরাস্তার মোড়ের কাছে পহুঁছিয়া দেখিল মস্ত চওড়া রাস্তা, এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব নজর হয় না। ট্রাম গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, বয়েল গা ়ী, মোষের গাড়ী, মোটর গাড়ী, ও লোকজনে রাস্তা গিস্ গিস্ কর্‌ছে, দেখিল এক পার্শ্বে একটী লোক রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া কি হাতে করিয়া উণ্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখিতেছে, হুসিয়ার দাঁড়াইয়া গেল, দেখিল ঐ লোকটা একটী সোণার বাঁট কুড়াইয়া পাইয়াছে। সেইটী তুলিবার সময় সে হুসিয়ারের দিকে চাহিল, এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ভগবান তোকে ঠিক এই সময়ে, এই স্থানে আনিয়া দিয়াছেন? সম্মুখে শিবমন্দির, আমি অধর্ম্ম করিব না, তোমাকেও ইহার বখ্‌রা দিব; তবে আমি ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছি আমি বেশী লইব। তোমাকে কিঞ্চিৎ অংশ দিব। চল একটা সেকরার দোকানে যাই, কাটিয়া তোমাকে চারি আনা অংশ দিব; আর আমি বার আনা অংশ লইব। শশাঙ্ক-শেখর তোমার উপর আজ বড় সদয়, না খাটিয়া খুটিয়া এতটা সোণা পাইয়া গেলে, তুমি যথার্থ শিবশঙ্করের ভক্ত, তাই শঙ্কর তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন। তুমি দেখছি ভাগ্যবান্ পুরুষ, তোমার নিশ্চয়ই সতীলক্ষ্মী স্ত্রী আছে। এই সোণায় তাহার গলার একটা হার তৈয়ারি করিয়া দিও, মজুরী আমার বখ্‌রা হইতে তোমাকে দিব, তাহা হইলে

বিনা সোণায় ও বিনা মজুরিতে তোমার বউয়ের গলার হার হইয়া যাইবে। জয় শিবশঙ্কর, জয় শিবশঙ্কর। আমার প্রধান দোষ পরকে সুখী করিবার জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত। এতে আমার আরাম আছে, শান্তি আছে, জয় শিবশঙ্কর।

২য় পথিক :—কি ঠাকুর আমি সব দেখেছি। বাবা দুজনে ফুস্ ফুস্ গুজ গুজ করছ; আসল মাল তোমার হাতে, খুব কম হয়, দুই হাজার টাকা দাম আমার বখ্‌রা চাই। শিবশঙ্কর দয়া করেছেন? আমি রোজ শিবশঙ্কর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া যাই রোজ প্রার্থনা করি 'কুছ দেলায় দে মহাদেব', আজ শিবঠাকুর বেশ কিছু দেলায় দিয়াছেন; এখন বাবা আমায় বখ্‌রা দেও, আর নয়ত যার জিনিষ তাহাকে দেওয়াব, অধর্ম্ম আমার সয় না; পুলিশে খবর দিব; ঐ দেখ পাহারালা সাহেব ঐ মোড়ে দাঁড়ায়ে আছেন, সার্জ্জেন সাহেবও আছেন।

দ্বিতীয় পথিক "বখরা দাও, আর না হয় ত সব হারাও।" এই বলিয়া চাপা আওয়াজে চেঁচাইল—এ পাহারালা জি। "এ" আর "জি" খুব জোরে উচ্চারণ করিল। আর 'পাহারা ওয়ালা' কথাটা খুব আস্তে আস্তে মুখেই রহিয়া গেল। খানিকটা পাহারালার দিকে দৌড়িয়াও গেল, বলে গেল রোস, পাহারালা ডেকে আনি।

১ম পথিক :—হুসিয়ারকে লক্ষ্য করিয়া আস্তে আস্তে কানে কানে বলিল দেখজি, এ এক বেটা হাঘোরে এখানে এসে জুটিয়াছে; এ বেটা সব গোল করে দিবে। তুমি বল্‌বে এ সোণার বাঁট তোমার, আমি তাতে সায় দেব, তাহা হইলে সোণার বাঁটটী তোমারই হবে, আমাকে যা হয় পাঁচ দশ টাকা দিয়ে যেও।

হুসিয়ার :—সে কি করে হবে? জিনিষটা আমার নয়, কি করে

বল্‌ব সেটা আমার জিনিষ? এ মিথ্যা কি করে বল্‌ব? মিথ্যা বল্‌লে জিব খসে যাবে যে।

১ম আগন্তুক :—দূর বেটা ছোটলোক, তোবেটার মিথ্যা বলতে এত ভয়? লোকে কত মিথ্যা বলে, তাতে তাহাদের জিব খসে যায় না; মিথ্যা বল্‌লে, যদি জিহ্বা খসে যেত, তাহলে কল্‌কাতা সহরে, সব ভদ্রলোক জিহ্বাবিহীন হইত। বেটা দেহাতের ছোটলোক কি না মিথ্যা বল্‌তে এত ভয়, এই জন্যই ছোটলোককে বোকা বলে। আরে শোন্ তোকে দেখে আমার দয়া হয়েছে, তোর মতন আমার একটী ভাই ছিল, মরে গেছে, ঠিক তোর মতন, সেই জন্য তোর উপকার কর্ত্তে আমার এত আকাঙ্ক্ষা। পরোপকারেই আমার সব গেল। শোন্ তুই মিথ্যা বলতে না পারিস্, আমি তোর জন্য মিথ্যা বলবো। আমি বলব ও তোর জিনিষ। তুই রাস্তায় ফেলে দিয়েছিস্, তুই তাতে সায় দিয়ে যাস্, আমি তোকে জিনিষটা দিব, তুই আমাকে ১০৲ টাকা দিস্। দেখ জিনিষটার দাম ২০০০৲ টাকা। বেটা বাকি জীবনটা বসে পায়ের উপর পা দিয়ে খাবি। আর তামাকু টানিতে টানিতে আমার কথা একবার ভাবিস্, তোর বড় ভায়ের কথা।

হুসিয়ার :—তা আমার ত দশটা টাকা নাই।

১ম আগন্তুক :—দূর বেটা কম্‌বখত তাহাও নেই?

হুসিয়ার :—না।

১ম ব্যক্তি :—তবে এক কাজ কর, তোর ঐ সোণার পদকখানা দে, সোণার তালটা সব নে, এই কথা বলিয়া সে সোণার বাঁটটা হুসিয়ারের হাতে দিল। হুসিয়ার হাতে করে দেখে যথার্থই সোণার তাল চক্‌মক্ করছে, খুব ভারী, সে সেইটা লইয়া গলা হইতে পদক খুলিয়া দিতেছে এমন সময় দ্বিতীয় আগন্তুক আসিয়া হাজির, আর গম্ভীর স্বরে বলিল

এখনও বলছি আমায় কিছু বখ্‌রা দাও ; অন্ততঃ দশটাকা, না হয় আমি এখনই পুলিশে খবর দিব।

১ম আ :—হুসিয়ারকে লক্ষ্য করিয়া এজি, এবেটা হাঘরে কিছুতেই ছাড়বে না, গোটা দশেক টাকা ওকে দিয়ে দাও, সব পাপ চুকে যাক।

হুসিয়ার :—আমার কাছে দশটা পয়সা নাই, তা দশটা টাকা কোথা থেকে দেব ?

১ম আ :—(কানে কানে) তোমার হাতের ঐ রূপার তাগাটা এই বেটাকে দিয়ে দাও। তুমি ত দুই হাজার টাকার মাল পাচ্ছ। এই বলিয়া তাহার হাত থেকে তাগাটা খুলিয়া দ্বিতীয় আগন্তুকের হাতে দিল। তাহার পর পদকটা নিজে নিয়ে দুইজনে, দুইদিকে চলিয়া গেল। যাবার সময় বলিয়া গেল, দেখ তোরা দেহাতের ছোটলোক, সব মিথ্যাবাদী। তুই বল্‌লি তোর কাছে কিছু নাই, আমি তাগা খুলবার সময় দেখি, তোর টেঁকে কি রয়েছে ; আমি তোর এত উপকার করলা: আর তুই আমার সঙ্গে জুয়াচুরি কর্‌লি।

হুসিয়ার :—ও কেবল চারিটী পয়সা গঙ্গা স্নানে তিলক ও কাপা খোঁড়ার জন্য।

১ম আ :—দে ঐ চারিটা পয়সা দে ঐ পাহাড়াওয়ালার ছোকরাটাকে দিয়ে যাই, কোন গোল হবে না। চলে যাও "জয় শিব শঙ্কর" এই বলে চারিটা পয়সা ট্যাঁক থেকে খুলে নিয়ে চলিয়া গেল।

হুসিয়ার ভাবিল কলিকাতা কি মজার জায়গা, একবার রাস্তায় পা দেওয়া আর দুই হাজার টাকা রোজকার। এই জন্য আমার দেশের যত বাবু ভায়ারা কলিকাতায় আসেন। যত সব লক্ষীছাড়া লোক, লোটা নিয়ে আসে, আর দেশে ফিরে গিয়ে হন শেঠজি, বড় বাবু, রাজা বাবু, ইত্যাদি। কলিকাতায় পয়সা রাস্তায় পড়ে থাকে, বাবুরা সব কুড়িয়ে

নিয়ে যান, তাই কলিকাতায় এত পয়সা সস্তা। সবই ভগবানের দয়া, সবই প্রভুর ইচ্ছা। হুসিয়ার সোণার টুকরাটাকে কোমরের কাপড়ে বিশেষ করিয়া গাঁট দিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর বেশ করিয়া কাপড় জড়াইয়া, গামছাখানিকে উত্তরীয় করিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিল। সঙ্গে প্রায় ২০০০৲ টাকার মাল, কাযেই ভিতরটা একটু গরম; খুব কষ্টে সৃষ্টে সোজা হইয়া চলিতে লাগিল।

বেশী টাকা সঙ্গে থাকিলে, মেজাজটা চন্‌চনে হয়, হুসিয়ারেরও কতকটা তাহাই হইল। সে খানিকদূর নিজের ভাবনা লইয়াই চলিয়াছে, ভাবনা অনেক রকম। এই সোণাখণ্ড সে কলিকাতায় বেচিয়া টাকা করিয়া লইবে, না এলাহাবাদে গিয়া বেচিবে। এত সোণা ক্ষেতিয়ার গহনা গড়াইয়া দিবে, না বেচিয়া জমি কিনিবে। এত গহনা লইয়া ক্ষেতিয়া কি করিবে? ছিঃ আমাদের জাত ভাইয়ের বহুরা ত এত সোণার গহনা পরে না; ২০০৲ টাকা হইলে ক্ষেতিয়াকে গহনায় মুড়ে ফেলা যায়, তবে তাহার জ্ঞাতিভায়ারা যাহা করে না, তাহা সে কেমন করে করিবে? তাহার সমাজে তাহাকে নিন্দা করিবে, হয়ত তাহাকে একঘরে করে দিবে, তাহার জাতের অন্য স্ত্রীলোক যাহা করে না, তাহার স্ত্রী তাহা কেন করিবে? অতএব সে স্থির করিল, সোণা রাখিয়া দিবে, দেশে যাইয়া মনো পোদ্দারের দোকানে সোণা বেচিয়া জমিদারী কিনিবে। জমি কিনিয়া সে জমিদার হইবে। ক্ষেতিয়া ভদ্রঘরের বিবি হইবে। এখন হইতে সে মুসামাত ক্ষেতিয়া বিবি। সোণার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ অনেক ভাবনার বোঝা লইয়া হুসিয়ার চলিতে লাগিল। মানুষের সুখশান্তি, ধনে নয়, মনে। অর্থ সেই সুখশান্তির পাইবার একটী অতি ক্ষুদ্র অবলম্বন। ভগবান মানুষকে যেখানে অর্থ দিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনর্থ, অনেক

ভাবনা, অনেক চিন্তা দিয়াছেন। অর্থরূপ গোলাপের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কণ্টক দিয়াছেন, অর্থের অধিপতি হইয়া সুখে ঘুমান কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? যাহার ভাগ্যে ঘটে, তিনি মনুষ্য সমাজের প্রণম্য।

হুসিয়ার ভাবিতে লাগিল ক্ষেতিয়া অনেক গহনা পরিলে কেমন মানাইবে, সে তাকে আরো কত যত্ন করিবে, এই সব সুখচিন্তার বোঝা ঘাড়ে লইয়া চলিয়াছে ; এমন সময়, একটা লোক আসিয়া বলিল বাবা একটা পয়সা দাও। দুইদিন খাওয়া হয় নাই ; হুসিয়ার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল বাবা মাফ কর আমার কাছে পয়সা নাই। আগন্তুকটী পয়সা না পাইলেও খুব খুসী হইয়া বলিল, বাবা আমি ভিক্ষা না পাইলেও তোমার কথাতে বুঝা যায় তুমি ভাল ঘরের ছেলে, কথা খুব মিষ্ট, হুসিয়ারের বুকটা পাঁচ হাত হইল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল এ লোকটী আমাকে জানে না, চেনে না, কখন আমায় পূর্ব্বে দেখে নাই, আমার বাপ যে ভাল লোক কি করিয়া জানিল ? এই সময়ে ঐ আগন্তুকটী কথার ছলে তাহার নাম, ধাম, পিতার নাম, শ্বশুরের নাম ধাম, দুই পাঁচটী প্রতিবেশীর নাম জানিয়া নিল এবং হুসিয়ারের ও তাহার প্রতিবেশীদের পরিচয় এক রকম মোটামুটি সব শুনিয়া নিল ; তাহার পর রাম রাম বলিয়া চলিয়া গেল।

হুসিয়ার আবার ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে চলিয়াছে। মনে মনে বলিতে লাগিল আমি এই মাত্র টাকা পাইলাম, আর অমনি এ লোকটা বলিল, আমি ভাল লোকের ছেলে। এমন সময় ধোপদস্ত কাপড় জামা পড়া একটী লোক তাহাকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বেশ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, হুসিয়ারও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু চিনিতে পারিল না। আগন্তুকটী তাহার দিকে বেশ করিয়া

দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ও চিনেছি। আমার কি ভ্রম নিজের ঘরের লোককে চিনিতে পারিতেছিলাম না; তা দোষই বা কি কতদিন দেখা নেই; তা বাবা, হুসিয়ার তুমি ভাল আছ ত, আমাদের মেয়ে ক্ষেতিয়া কেমন আছে? তোমার বাপ কেমন আছে? তোমাদের রৌদ্রপুর গ্রামে রামজি, হবিবক্স, লক্ষণ সিং সব কেমন আছে? বাবা ক্ষেতিয়া আমার সম্পর্কে ভাইঝী সে এখন কত বড়টা হয়েছে? তাহার ছেলে পুলে কি? এই আগন্তুকের কথা শুনিয়া হুসিয়ার একেবারে অবাক এ লোকটা বলে কি; দেখতে পয়সাওয়ালা লোক, বলছে সম্পর্কে আমার শ্বশুর, আমার দেশ জানে, গাঁ জানে, বাপকে জানে, গাঁয়ের লোকজনকে জানে, এ অবশ্যই আমার সম্পর্কে শ্বশুর হইবে, কি অন্যায় একে চিন্‌তে পারি নি, যাহা হউক যতদূর সম্ভব সুধরাইয়া লওয়া যাক্, এই বলিয়া হুসিয়ার আগন্তুককে দণ্ডবৎ করিল। এবং রাম, রাম, করিয়া তাহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল; আগন্তুক যথাযোগ্য উত্তর দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল তা বাবা কবে এলে আর কবে দেশে যাবে? হুসিয়ার জবাব দিল ৫ দিন আসিয়াছি আর তিন দিন বাদ যাইব। ইহা শুনিয়া আগন্তুক বলিল তা বাবা, আমি আজই কলিকাতা হইতে বাহিরে যাইব, তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিলাম না। ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু সময় অভাব, যাহা হউক আমার সঙ্গে এস ক্ষেতিয়ার জন্য দুখানা কাপড় আর দুটা আঙ্গরেখা কিনিয়া দিই। তুমি লইয়া যাইও; আর ক্ষেতিয়াকে দিয়া বলিও তোমার ভোজু কাকা দিয়াছে, সে বলিলেই বুঝিতে পারিবে, ভোজুয়া ভোজুয়া মনে থাকবে? কলিকাতায় আমার নাম ভোজনলাল বাবু। আমি আর এখানে কাহার নহি, আমি এখন ছত্রি, দেশে আমি ভজুয়া। এস আমার সঙ্গে এস, এই বলিয়া একখানা চলতি মোটরে হুসিয়ারকে সঙ্গে লইয়া উঠিয়া বসিল।

খানিকটা গিয়াই এক কাপড়ের দোকানের সামনে মোটর থামাইল, আর গাড়ী হইতে নামিয়া হুসিয়ারকে সঙ্গে করিয়া দোকানে ঢুকিল, দশ বার জোড়া ভাল শাড়ী দেখাইতে বলিল। দোকানদার শাড়ী দেখাইলে, সে বেশ করিয়া দেখিয়া, বলিল দেখ, এ কাপড় মেয়েদের জন্য, তাহারাই পছন্দ করিবে আর পছন্দ হইলে এই থেকে ৫ জোড়া লইব। তুমি কাপড়গুলি বেঁধে দাও আমার বাটী এই নিকটেই, জগন্নাথ গলিতে। আমার নাম ভোজনলাল বাবু, আমার লোক রহিল। আমি এখনি আসিতেছি। সকাল হইতে আজ এক পয়সা বিক্রয় হয় নাই, কাযেই দোকানদার বাবু খরিদদার পাইয়া ভারি খুসী, তাহার পর লোক বসাইয়া কাপড় দেখাইতে যাইতেছে, এতে আর আপত্তি কি? এই ভাবিয়া আচ্ছা বাবু তা হোক বলিয়া বার জোড়া রকম বেরকমের শাড়ী বাঁধিয়া দিল। ভোজুয়া হুসিয়ারকে বসিতে বলিয়া বাটীতে কাপড় দেখাইতে গেল; হুসিয়ারকে বলিয়া গেল, দেখ বাবা, তুমি একটু অপেক্ষা কর মেয়েদের কাপড় মেয়েরাই ভাল পছন্দ করে, আমি এখনি দেখাইয়া আসিতেছি, এই বলিয়া কাপড়ের বাণ্ডিল লইয়া মোটরে উঠিয়া চালাইতে বলিল।

হুসিয়ার দোকানে বসিয়া রহিল আর ভাবিতে লাগিল, আজ কি শুভক্ষণেই বাটী হইতে পা বাড়াইয়াছি। সোণা হ'ল, কাপড় হ'ল, আরো বা কত কি হয়, বলা যায় না; আরও ভাবিতে লাগিল, ক্ষেতিয়া ভাল ভাল দুখানা কাপড় পাইয়া কত খুসী হইবে, যখন ক্ষেতিয়া জিজ্ঞাসা করিবে কে কাপড় দিল সে তখন কি বলিবে? ঐ যা সম্পর্কের শ্বশুরের নামটা যে ভুলিয়া গেলাম। কি হাটজা, না ভাগজা, না কি একটা তাই ত মনে হচ্ছে, তা নামে কি এসে যায় কাপড় নিয়ে কাম। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হুসিয়ারের একটু তন্দ্রা আসিল, হুসিয়ার অনেক সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

খানিক পরে দোকানদারের আওয়াজে তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে শুনিল দোকানদার বলিতেছে এত দেরী হ'ল, এখনও তোমার বাবু ফিরে এলনা'? হুসিয়ার বলিল তা আমি কেমন করে জান্‌ব? তোমার সামনেই ত বলে চলে গেল, কাপড় দেখাইয়া আন্‌ছি; দোকানদার তখন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, এত দেরী, গেল কতদূর; আরো এক ঘণ্টা বাদে যখন ভোজনলাল ফিরিল না, তখন দোকানদার একটু ব্যস্ত হয়ে হুসিয়ারকে বলিল, হ্যাঁহে তোমার মনিব থাকে কোথা? তাহার নাম কি? হুসিয়ার বলিল তাহার মনিব এলাহাবাদের করমচাঁদ বাবু; এ লোকটী যাহার নাম খাজা না ভাগজা, তাহার মনিব নয়, সে কোথায় থাকে তাহা সে জানে না, দোকানে আসিবার কিছুক্ষণ আগে সে তাহাকে প্রথম দেখিয়াছে তাহার পূর্ব্বে তাহাকে কখন দেখে নাই বা চিনিত না। দোকানদার শুনিয়া ক্রোধে আকুল, তাহার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল জুয়াচোরেরা তাহাকে ঠকাইয়াছে, আর এ বেটা সেই জুয়াচোরের সঙ্গী, দুই জনে যোগ সাজসে এ কার্য্য করিয়াছে। তাহার পর অনেক প্রশ্ন করিয়া যখন কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইল না, তখন সে চেঁচামেচি আরম্ভ করিল, অনেক লোক জমিয়া গেল; আর সকলে বলিতে লাগিল এ বেটা পলাতক জুয়াচোরের সঙ্গী, এ বেটাকে ছাড়া হবে না; দাও বেটাকে পুলিশে দাও। দুই এক ঘা নরম গরম হলেই বেটা তাহার সঙ্গীর নাড়ীনক্ষত্র সব বলে দেবে, আর বামালও ধরা পড়িবে; এই বলিয়া সকলে মিলে চাঁদা করে তাহাকে চড় চাপড় ঘুসো লাথি মারিতে লাগিল; হুসিয়ার মারের চোটে ত্রাহি মধুসূদন ডাকিতে লাগিল।

এমন সময়ে এক থোপিয়া পুলিশের পাহারালা খালি উর্দ্দিতে যাইতেছিল, সে চোর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিল; তাহার পর

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল বামাল কোথায়? দোকানদার বলিল আমিও ত তাই জান্‌তে চাচ্ছি বামাল কোথায়? বামাল পাওয়া যায় নাই শুনিয়া কনেষ্টবল মাথা নাড়িয়া বলিল, "বামাল না পাওয়া গেলে ইন্‌সপেক্‌টর বাবু খুসী হবেন না। জমায়েত লোকেরা বলিতে লাগিল পাহারওয়ালা সাহেব দু এক ঘা উত্তম মধ্যম দাও, তাহা হইলেই মাল বাহির হবে। পাহারওয়ালা মুণ্ডি হেলাইয়া বলিল তা পারব না, আইন খারাপ, কই কই গান্ধা হাকিম বহুৎ কড়া হায়, আসামীকো মারনেসে সিপাহীকে জেল দে দেতা, হাম্ ফকৎ পুছেগা উস্‌সে, মাল বামাল হায় ; হায়তো বহুৎ আচ্ছা, নেই হয় তো কেয়া করেগা, হোগাত জমাদার সাহেব বেটারি ওটারী লাগায়গা। হাম আসামীকো লে যাগা, ব্যস, নেহি হোনেসে মাল-ওল বড়ামৎ হামসে হোগা নেই।

দোকানদারকে সঙ্গে লইয়া, আসামীরই নিজের গামছা দিয়া তাহার হাত বাঁধিয়া পাহারওয়ালা হুসিয়ারকে থানায় লইয়া গেল, আসামী লইয়া যাইবার সময় দু চারিটা ছোট বড় গুঁতোগাতাও দিল, হুসিয়ার খালি বাবাগো, গেলাম গো বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল ; থানার সাব ইন্‌স্‌পেক্টর ফরিয়াদীর কাছ হইতে সব শুনিল। আসামী কেবল বলিতে লাগিল, হুজুর আমি নির্দ্দোষী কিছুই জানিনা, বাবা।

সাব ইন্‌স্‌পেক্টর (অল্প বয়স) সে বলিল বাবা আমার আজ চার বৎসরের চাকরী। কোন শালা আসামী বলে না, যে আমি দোষী। সব শালাই নির্দ্দোষী, সব শালাই বলে আমি কিচ্ছু জানি না। যখন অনেক ধম্‌কাধমকি করিয়াও কিছু হইল না, তখন হুসিয়ারের ধরণ ধারণ দেখিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত লোকটা নির্দ্দোষী। জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া এইরূপ দশা হইয়াছে ; এমন

সময় অফিসার ইন্‌চার্জ্জ আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বলিল ইহার তল্লাসী লওয়া হইয়াছে ?

অল্প বয়স্ক সাব ইন্‌স্‌পেক্‌টর বলিল এর আর কি তল্লাসী লইব? এর ত খালি পরণে একখানি ধুতি ?

অফিসার ইন্‌চার্জ্জ একটু হাসিয়া বলিল এখনও কাজ শিখলে না, আগেই আসামীর সার্চ্চ করতে হয়। তল্লাসী কথাটা শুনেই হুসিয়ার প্রমাদ গণিল ; মার খাইয়াছে সে আলাহিদা কথা, এই বার যে তার সোণার তাল যায় ? সে সোণার বাঁটটী টিপে ধরিয়া তল্লাসী দিতে লাগিল।

অফিসার ইন্‌চার্জ্জ—পুরাণ ঝুনো ইন্‌স্‌পেক্‌টর। তাহার অমনি সেই দিকে নজর পড়িল। হুসিয়ারের হাতটা দেখে, তাহার কোমরে হাত দিল, দেখিল একটা কি কোমরের কাপড়ে জড়ান, খুলিয়া দেখে একটা সোণার বাঁট ; সে দেখিয়াই বুঝিল এটা পিতলের বাঁট, কলিকাতার একদল জুয়াচোর এইরূপ পিতলের বাঁটকে সোণার বাঁট বলিয়া অনেক চালাক ও আহাম্মক, লোভী লোককে ঠকায়। এই পিতলের বাঁটটী কোমরের কাপড়ে জড়ান ও হুসিয়ারের সেটীকে গোপন করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখিয়া আর কাপড়ের দোকানের সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, এ বেটা জুয়াচোর দলের একজন পিতলের বাঁট লইয়া জুয়াচ্চুরি ফন্দী করে, আবার সুবিধা হইলে, লোক বসাইয়া দোকানদারকে ঠকায় ; পিতলের বাঁট তাহার কাছে পাওয়া যাওয়াতে আসামী যে দোষী সে বিষয়ে ইন্‌স্‌পেক্‌টরের কোন সন্দেহ রহিল না ; তাহার মনে হইল এইবার একটা বড় গ্যাঙ্গ কেস্ হইবে ; এ বেটা হয়ত তাহার সব সঙ্গীর নাম বলিতে পারে ; এইবার ইহাকে ডি, ডি, ইন্‌স্পেক্টরের (D. D. Inspector) কাছে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে ; আর তাই বা পাঠাব কেন, তাহারা বড় কেস ধরিতে পারে, আর আমরা পারি না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মামলা মোকদ্দমার দালাল যতেক অনিষ্টের মূল

শ্যামলালের পিতা জহরলাল ঘোষ, মুখোস পাড়ার জমিদার বংশের সন্তান। তাহার পিতা রামধন ঘোষ দোর্দ্দিণ্ড জমিদার ছিলেন। তাহার জমিদারীতে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, রামধন ঘোষের নাম শুনিলে, তাহার জমিদারীর ২০মাইল পরিধির মধ্যস্থ লোক ভয়ে কাঁপিত। একেবারে যে তাঁহার সদ্‌গুণ ছিল না তাহা নয়, বরং সত্য কথা বলিলে বলিতে হয় অনেকগুলি সদ্‌গুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন; কিন্তু জবরদস্ত জমিদার নাম রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয়ের সদ্‌গুণগুলি সম্যক্‌ বিকাশ পায় নাই। তাঁহার মনটা কোমল ছিল, কিন্তু বাহ্যিক মেজাজটা খুব কড়া; তিনি বলিতেন জমিদারী রক্ষা করিতে গেলে, নরম হইলে তাহা রক্ষা করা অসম্ভব। অনেক সময় বাকি খাজনার দায়ে দুঃস্থ ও নিতান্ত গরীব প্রজাকে উদ্বাস্ত করিবার জন্য, সেপাই পাঠাইতেন, আবার পাড়ায় উমাচরণ ভট্টাচার্য্যকে দিয়া খাজনার প্রাপ্য টাকাগুলি ঐ দুঃস্থ প্রজাকে ধার দেওয়াইতেন।

উমাচরণ ভট্টাচার্য্য রামধন ঘোষের পেটাও লোক, যাহা কিছু ভাল কার্য্য করিতে হইত, উমাচরণ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার গৃহিনী পান্না দেবীর মারফতেই হইত। তাঁহার বিশ্বাস, প্রকাশ্যে দয়া করিলে লোকে প্রার্থনার উপর প্রার্থনার বোঝা চাপাইয়া তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিবে; এমন কি জমিদারীর মালগুজারীর টাকা পর্য্যন্ত আদায় করা সম্ভবপর হইবে না। তিনি কিন্তু বাস্তবিকই দয়ালু ছিলেন, লোকের

কষ্ট জানিতে পারিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পত্নী পান্নাদেবীর আশ্রয় লইতেন, আর তাঁহাদের মারফতে নিঃসহায়ের সহায় হইতেন। বাহিরে যে সময়ে রামধর্ন ঘোষ প্রবল প্রতাপশালী জমীদার বলিয়া খ্যাত, কিম্বদন্তী, সেই সময়ে তিনি ভিতরে ভিতরে ডাকাতের দলের সর্দ্দার ছিলেন; গোপনে তাহাদের সাহায্য করিতেন, আর ডাকাতি লব্ধ মাল চুপিচুপি পাচার করিতেন।

আজকালকার দিনে একদল লোক আছেন, পরস্ব অপহরণ করিয়া নিজের নামে দান জাহির করেন। পাঁচজনের কাছ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, নিজের দান বলিয়া ডঙ্কা বাজান। বিনা খরচে অতি সস্তায় নিজ নামামৃত অন্যকে পান করান। জমিদার রামধনঘোষ সেরূপ ছিলেন না। তিনি দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা, হৃদয়ের কোমলতাও মানসিক দৌর্ব্বল্য বলিয়া বাহিরে আখ্যাত করিতেন; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁহার নিজের উক্ত দুর্ব্বলতার মধ্যেও অনেকগুলি দুর্ব্বলতা ছিল, তবে সেগুলিকে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে দিতেন না। কখন কখন লোকের দুঃখ, কষ্ট দেখিয়া এই সব মানসিক দৌর্ব্বল্যের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ভট্টাচার্য্য দম্পতীর আশ্রয় লইতেন। ভট্টাচার্য্য দম্পতী ও ঘোষ মহাশয়ের মধ্যে একটী বিশেষ সর্ত্ত ছিল; কোন কারণেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় বা তাঁহার পত্নী প্রকৃত কথা প্রকাশ করিতে পারিবেন না; লোকে কোন রকমে যেন জানিতে না পারে যে ঘোষজা মহাশয় দয়া করিতেছেন। গ্রামের সকলেই জানিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়. নিজে না খেয়ে গরীবকে খাওয়ান; নিজে না পরে গরীবকে পরান, এই স্ত্রী-পুরুষের চেয়ে দয়ালু দম্পতী মুখোসপাড়ায় আর কেহ ছিল না। সেই কারণে দেশের লোকে উমাচরণ ভট্টাচার্য্যকে "দয়াল ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিত।

বেনামদারী করিয়া কেবল যে তাঁহাদের সুনাম জাহির হইয়াছিল

তাহা নহে, অর্থ হিসাবে কিছু আমদানীও হইত। কোন দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের জন্য ঘোষজা মহাশয় ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই গরীব ও অনাথের নিকট গিয়া দেখিলেন তাহার দরকার পাঁচ টাকা, ইহার মধ্যে তাহার ১৲ টাকা আছে, তিনি তাহাকে ঐ টাকাটী বাহির করিতে বলিলেন, সেই টাকাটী লইয়া আর নিজের কাছ থেকে ৪৲ টাকা দিয়া পূরা ৫৲ টাকা পূরণ করিয়া তাহাকে দিলেন; একটী টাকা নিজের কাছেই রহিয়া গেল। আবার কখনও বা ঘোষজা মহাশয়ের কাছে আসিয়া বলিলেন, লকাতাঁতীর ছেলের বড়ই ব্যারাম, ৫৲ টাকা না হইলে ডাক্তার ও ঔষধ চলিবে না; কাজেই নিজের কাছ হইতেই ৫৲ টাকা যোগাড় করিয়া দিলাম। ঘোষজা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ ভট্টাচার্য্যের হাতে পাঁচটী টাকা চুপি চুপি দিলেন। ভট্টাচার্য্যও মৃদুমন্দ হাসিয়া টেঁকে গুঁজিলেন।

পান্নাদেবী দয়াল ভট্টাচার্য্যের উপযুক্ত পত্নী। তাঁহার হাতে দানের জন্য টাকা পড়িলেই তিনি মনে মনে এইরূপ বিচার করিতেন। "জমিদার রামধন ঘোষ ত ডাকাতের সর্দ্দার। অত্যাচার করিয়া প্রজা ঠেঙ্গাইয়া, টাকা সংগ্রহ করেন; এইরূপে এ পৃথিবীর সুখ সঞ্চয় করিতে শুধু ব্যস্ত নয়, আবার পরপারের সুখ সচ্ছন্দের যোগাড় করবার জন্য, ধর্ম্ম সঞ্চয়ের ইচ্ছায়, আমাদের মারফৎ দানও করেন, এই গোপন দান, দুঃখীর দুঃখ নিবারণ জন্য। আমি ও আমার স্বামী ত ধনী একেবারেই নহি, বরঞ্চ নিঃস্ব বলিলেও চলে। রামধন ঘোষ গোপনে দান করেন, আমরা যদি তাঁহার অলক্ষিতে কিয়দংশ গ্রহণ করি, তাহাতে জমিদারের ধর্ম্ম সঞ্চয়ের সুবিধার কোন ব্যাঘাত হইবে না। অতএব এই গুপ্ত দান হইতে গুহ্যভাবে টাকার চারি আনা অংশ নিজের

জন্য রাখিয়া দিলে, তাহাতে কোন অধর্ম্ম নাই, ইহাতে ইহকাল পরকাল দুই কালেরই সুবিধা; ইহকালের সুবিধা নিজেদের, আর পরকালের সুবিধা রামধন ঘোষের।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পত্নী পান্নাদেবী রামধন ঘোষের দান ধর্ম্মে এইরূপ সাহায্য করিয়া সুনাম অর্জ্জন, ও সংসার খরচ সচ্ছল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মুখোস পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা জানিত, রামধন ঘোষ জবরদস্ত জমিদার। আর দয়াল ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার গৃহিণী উভয়েই দয়ার সাগর, তাঁহারা নিজের মুখের গ্রাস পরকে দেন; কাহারও দুঃখ দেখিতে পারেন না; তাঁহারা দুজনে দয়ার অবতার, মানুষের বিচার এবং রায় অনেক সময় এই রকমই বটে। যাহা হউক রামধন ঘোষ জমিদার, চির জীবনটা নিজ ইজ্জৎ, প্রতিপত্তি ও জমিদারী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে সেই সবগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া কোন এক অজানা স্থানে গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার চারি পুত্র নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটাইতে না পারিয়া ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয় গ্রহণ করেন; তাহাদের বিবাদ মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধেক অধিক সম্পত্তি উকীল, মোক্তার, কারপরদাজ ও সরকার বাহাদুরের ষ্ট্যাম্প্ রূপে চলিয়া গেল; বাকি অর্দ্ধেক, চারি পুত্র ভাগ করিতে বাধ্য হইল; চারিজনই জমিদার পুত্র, জমিদারী চালে চলিতে লাগিলেন, ক্রমে প্রত্যেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

জহরলাল জমিদার পুত্রের নাম, সম্ভ্রম, দাপট সবই পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্পত্তি হিসাবে রামধনের ⅛ অংশ মাত্র পাইলেন; জমিদারের ছেলে চাকরী কিংবা ব্যবসা করিতে পারেন না। তাহাতে মানের লাঘব হইবে, অথচ তদ্রূপ আয় নাই, ফলে পাওনাদারের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। রামধন ঘোষ অপরকে ধার দিতেন, নিজে কখন ধার করেন নাই, রামধনের পুত্র জহরলাল কিন্তু তাহা পারিলেন না; তিনি অপরকে

ধার দিতে ত একেবারেই পারিলেন না বরং অপরের কাছ থেকে মাঝে মাঝে ধার নিতে বাধ্য হইলেন। পৃথিবীতে যত রকম পাপ আছে, তন্মধ্যে ঋণ পাপ সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ ; জহরলাল সেই পাপে জড়িত হইলেন। ক্রমে ক্রমে একটী দুইটী করিয়া অনেকগুলি সম্পত্তি পরহস্তে চলিয়া গেল ; তাহার চারি পুত্র। শ্যামলাল তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ; জহরলালের বংশ-মর্য্যাদা বজায় রাখিবার মত অর্থ নাই, ছেলেগুলিকে শিক্ষা দিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, বড়, মেজোর, একরকম কিছু হইল, চতুর্থ শ্যামলাল, বড় ঘরের হোৎকা কুমার ; অভিমান যথেষ্ট, শিক্ষা ভাল রকম হইল না, অর্থও স্বল্প ; তবে বংশ-মর্য্যাদার গুণে, আর পুরাণ জমিদার ঘরের ছেলে, কাযেই মরা হাতী লাখ টাকা ; এইরূপ ধনাপ-বাদ হেতু তাহার বিবাহ বড় ঘরেই হইল।

শ্যামলালের গৃহিণীর নাম রেণুকণা ; বাপ একজন বিখ্যাত উকীল। পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট, তবে পসার প্রতিপত্তির অনুরূপ টাকা জমাইতে পারেন নাই ; কারণ রেণুকণার পিতামহ একজন গৃহস্থ লোক ছিলেন। ছেলেটীকে মানুষ করিয়া যান মাত্র, কিন্তু টাকা দিয়া যাইতে পারেন নাই ; রেণুকণার পিতাকেই সব করিতে হয়, রেণুকণার পিতা তাহার পুত্র কন্যাগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন, আর কন্যাগণকে বড় বড় ঘরে পাত্রস্থা করেন। বিবাহের সময় মোটা যৌতুক দেন, আর খুব বড় রকম পাল পার্ব্বণ করেন, কিন্তু অধিক নগদ টাকা দিয়া যাইতে পারেন নাই। রেণুকণা অশেষ গুণে গুণবতী, শিক্ষিতা, কর্ম্মিষ্ঠা, দয়াদাক্ষিণ্য জড়িতা, কর্ত্তব্য পরায়ণা, ধার্ম্মিকা। বাল্যকালে পিত্রালয়ে বিশেষ সুখ সচ্ছন্দে ও আদরে লালিতা পালিতা হইয়া, যখন শ্বশুর বাটীতে আসিলেন, তখন প্রথম অবস্থায় তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর যত্নে ও স্নেহে বিশেষ সুখে কাটিয়া গেল ; শ্যামলাল

বড় একটা সহধর্ম্মিণীর খবর রাখিতেন না; তিনি অনেক রাত্রি অবধি বৈঠকখানায় ও বাহিরে বন্ধুবান্ধবকে লইয়া কাটাইতেন; যখন নিজ কক্ষে আসিতেন তখন প্রায়ই রেণুকণা নিদ্রাভিভূতা থাকিত। আবার অতি প্রত্যুষে যখন রেণুকণা শয্যা ত্যাগ করিয়া শাশুড়ীর নিকট গৃহকর্ম্মে যাইতেন, তখন শ্যামলাল ঘুমাইতেন, ফের তাহার সহিত দেখা অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায়, রাত্রে, নিজ গৃহে আসিয়াই শ্যামলাল হুকুম করিতেন, গা হাত পা টিপিতে, কিয়ৎক্ষণ পরে নাসিকা ধ্বনি করিয়া তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে বুঝাইয়া দিতেন, তিনি সুখে নিদ্রিত। শ্যামলালের বিশ্বাস, তিনি একজন নামজাদা জমিদারের পৌত্র, এ পর্য্যন্ত তাহার উর্দ্ধতন দুই পুরুষ চাকরী বা ব্যবসাদি কার্য্য করেন নাই; পায়ের উপর পা দিয়া প্রজা তাড়না করিয়াই চালাইয়াছেন; অতএব তাহার স্ত্রী তাহার উপযুক্তা নয়; শিক্ষা হিন্দু স্কুলে বাবুর বেঞ্চে এনট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত, দীক্ষা একেবারেই হয় নাই; তাহার ইয়ারের দল তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল, দেখ, স্ত্রীলোককে নাই দিও না; নাই দিলে, কুকুরের মত মাথায় চড়িবে; সেই বিশ্বাসে সে তাহার স্ত্রীর উপর সর্ব্বদাই মেজাজ দেখাইত।

সুখে দুঃখে ছাপ্পান্ন বৎসর কাল জমিদারী চালে কাল কাটাইয়া জহরলাল ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। যখন মারা যান তখন তাহার ঋণভার বেশ ভারী রকম হইয়াছিল; এমন কি শশিকলা এক এক সময় দুঃখ করিয়া বলিতেন ঋণভারই কর্ত্তাকে ডুবাইল; বোধ হয় ঋণ এত বেশী না হইলে তিনি আরো কিছুদিন বাঁচিতেন। আয় কম, মান, ইজ্জৎ, চাল বজায় রাখিতে গিয়া, ব্যয় কমাইতে পারিলেন না, কাযেই জহরলালকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল, বনিয়াদী চাল ছিল, সবই বজায় রাখিতে গেলেন, তাহাদের মধ্যে বার আনা কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর যুক্ত; বাহ্যিক আড়ম্বর

বজায় রাখিতে গিয়া আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য যাহা কিছু আবশ্যক সে সকল যথা সময়ে সংগ্রহ করিতে পারিতেন না; সচ্ছন্দের কোলে লালিত পালিত হইয়া কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার বড় বেশী ছিল না। কাযেই ঋণভারে শয্যাশায়ী হইলেন আর উঠিতে পারিলেন না। কিছুদিন বিছানায় শুইয়া সেই সব ঋণবদ্ধ সম্পত্তি, সুখে দুঃখে কষ্টে পশ্চাতে রাখিয়া, শশিকলার অগ্রগামী হইলেন; তবে যাইবার অগ্রে ছেলেদের ডাকাইয়া শশিকলার সম্মুখে বলিয়া গেলেন; দেখ বাবাজীবন সব, আমি চলিলাম, মনে করিয়াছিলাম ঋণটা শোধ করিয়া যাইব, তাহা চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না; তোমরা জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম দুজনে মানুষ হইয়াছ কাজকর্ম্ম করিতেছ; তৃতীয় রমণলাল ও চতুর্থ শ্যামলাল এখন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক; দেখ, আদালতের আশ্রয় লইয়াই আমার এই অবস্থা; পারত পক্ষে আদালতের আশ্রয় লইও না; সকলে এক সংসারে থাকিবে, তাহা হইলে হয়ত মান ইজ্জত রক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবে; অন্যথা করিলে তোমাদের মান ইজ্জৎ বংশ-মর্য্যাদা, এই যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি সব চলিয়া যাইবে, থাকিয়া যাইবে কেবল ঋণভার; সেই ঋণভার আমাকে ডুবাইল, সাবধান যেন তোমাদের না ডুবায়। চারিজন কাজকর্ম্ম করিয়া বাহির হইতে অর্থ উপার্জ্জন কর, পার যদি বংশ-মর্য্যাদা থাকিবে; আর কতক কতক জমিদারী তোমাদের হস্তে দিয়া গেলাম, পার যদি রক্ষা করিও; এগুলিকে রক্ষা করিলে এগুলিও তোমাদিগকে রক্ষা করিবে।

দৈব দুর্ব্বিপাকে, নিজেদের বুদ্ধির দোষে অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে, চারি ভ্রাতার একত্রে থাকিবার সুবিধা একেবারেই হইল না; দায়ভাগের ভাগের দায়ে, রামধন ঘোষের ৵৹ অংশ সম্পত্তি এক এক ভাইয়ের বখরায় পড়িল; তাহার উপর জহরলালের ঋণের অংশ। সহমানে ভাগ বাটওয়ারা না হওয়াতে উকীল কৌন্সিল মোক্তার ও

আদালতের খরচা কম হইল না; প্রত্যেকের অংশে যে আয় তাহাতে খরচ চলা দায়; এ রকম অবস্থায় শ্যামলাল তাহার নিজের বাটীর কর্ত্তা হইল।

মায়া নিম্নগামী; পুত্র বাৎসল্য কনিষ্ঠ ও অকর্ম্মণ্য পুত্রের প্রতিই অধিক; এই দুই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ও রেণুকণার যত্নে সেবায়, ভক্তিতে, ভালবাসা ও ঐকান্তিক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, শশিকলা শ্যামলালের সংসারেই রহিয়া গেলেন। শ্যামলাল যখন দেখিলেন, তিনি নিজে বাটীর কর্ত্তা, তখন প্রথমটা একটু স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, মনে মনে ভাবিল আমি নিজে গৃহস্বামী; আমাকে বলিবার বা দোষ দেখাইবার কেহই নাই; আমি যা করিব তাহাই হইবে; কিয়দ্দিন গত হইলেই বুঝিতে পারিল বাটীর কর্ত্তা হওয়া বড় সুবিধাজনক নয়; এই সময় তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। রেণুকণার এই দুঃসময়েও আনন্দের অবধি নাই, এই দুঃখের অবস্থায়ও শশিকলার কতকটা শান্তি আসিল। শ্যামলালের মনে আর আনন্দ ধরে না; সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কতকটা দায়িত্ব বোধ জন্মিল, কাযেই ভাবনা আসিয়া জুটিল; শিশুটী সুখে থাকিবে কিসে। সেটীর কোনরূপ অভাব ও অসুবিধা না হয়; কিরূপ হইলে সচ্ছন্দে লালিত পালিত হইবে; অন্ততঃ সে নিজে বাল্যকালে যে রকম লালিত পালিত হইয়াছিল সেইভাবে থাকিতে পারে, এরূপ সুখ চিন্তা তাহার মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। এতদিন সে যে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিল তাহার জন্য মনে মনে ধিক্কার হইতে লাগিল। শিশুর কারণে রেণুকণার প্রতি তাহার আন্তরিক ভালবাসা জন্মিল; তাহার নিজ মাতার প্রতিও যত্ন, ভক্তি ও ভালবাসা বাড়িল; এ সব হইল সত্য বটে, কিন্তু অর্থের অভাবে সংসার অচল হইয়া পড়িল, মায়ের হাতে যে টাকা ছিল ক্রমে তাহা কমিয়া আসিল, জমিদারীর আয় কম, তাহার উপর মামলার খরচা, এই সব খরচা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

তাহার পূর্ব্ববন্ধু হট্টেশ্বর, রামময় প্রায়ই আসা যাওয়া করে, সেও তাহাদের কাছে যায়, কিন্তু রাজীবলোচন ও হতিস আর তত আসে না। যাহাতে ভায়ে ভায়ে মামলা না করিয়া, সকলে এক ভদ্রাসনে বাস করিতে পারে, তাহার জন্য তাহারা দুই জনে চেষ্টা করিয়াছিল ও সৎপরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? হট্টেশ্বর এখন এটর্ণির বাড়ীর দালাল। সর্ব্বনাশের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি; সুবিধা পাইলেই দালালি বুদ্ধি চালাইত; সে প্রয়োজন হইলে জন্মদাতা পিতার সহিত অন্যের মোকদ্দমা বাঁধাইয়া তাহার দালালি অর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ নহে, এ হেন হট্টেশ্বর পরামর্শ দিল তুমি ঘরাও মিটাইও না, তাহা হইলে তোমার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম তোমাকে পূরা বখরা দিবে না। হট্টেশ্বর বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছে, শ্যামলাল কনিষ্ঠ, সে কারণে তাহার পিতা জহরলাল তাহার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে ২৫০০০৲ টাকা আলাহিদা দিয়া গিয়াছেন। সেই টাকা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহমানে স্বীকার করিবেন না। অতএব মামলা অনিবার্য্য। সে তাহার উকীল বন্ধুকে বলিয়া খুব সস্তায় চুল চিরিয়া, শ্যামলালের পূরা বখরা ও সমস্ত প্রাপ্য আদায় করিয়া দিবে। কাযেই মামলা মিটিল না, সহমানে বখরাও হইল না; মামলা বেশ জোরে চলিতে লাগিল; শ্যামলাল উকীল আফিস, আর উকিলের বাড়ীতে যাওয়া আসা করে ঘুরে বেড়ায়; এই সূত্রে তাহার অনেকগুলি নূতন বন্ধু জুটিল, পূর্ব্বে সে সময়ে সময়ে বা কোন একটা পর্ব্বদিনে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইত, এখন সে প্রায় প্রত্যেক রেসের দিনে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইতে আরম্ভ করিল; সেখানে অনেক নূতন বন্ধু জুটিল, বহু পুরাতন বান্ধবেরও সহিত দেখা হইতে লাগিল; প্রধান বন্ধু আশা মরীচিকা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"যাওয়া, জুয়া, একই কথা"

ঘোড় দৌড়ের মাঠ, তুমি সর্ব্বনাশের শ্রেষ্ঠ পীঠ। দূর হইতে তোমাকে আমি প্রণাম করি; ভরসা অধম সন্তানকে তুমি দয়া করিয়া সকল সময়েই দূরে রাখিবে। লোকের সর্ব্বনাশের যতগুলি পন্থা আছে, তাহার মধ্যে তুমি সর্ব্বপ্রশস্ত; তুমি পতনোন্মুখ জীবের আশার কেন্দ্রস্থান; তুমি পতিতপাবন, যখন পতিতকে সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছে, তুমি তাহাকে ছাড় না, আর সেও তোমাকে ছাড়ে না। যে একবার তোমার মায়ায় পড়িয়াছে, কি সাধ্য তাহার, যে তোমার সেই মায়াজাল কাটিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে; তোমার এত বড় বড় প্রেমিক ও সেবক আছে, যে সঙ্গের হিসাবে তোমার স্তাবক দলের একজন হইতে পারিলেই লোকে ধন্য মনে করে; তোমার অধিকার দীর্ঘে ও প্রস্থে বহু যোজন ব্যাপী। যখন তুমি লক্ষ্ণৌয়ে বা বম্বে বা রেঙ্গুনে অধিষ্ঠান কর, কলিকাতা হইতে তোমার স্তাবকদল প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তোমার সেবার জন্য সেখানেও দৌড়ায়, তোমার ক্ষমতা অসীম, আশ্চর্য্যময় ও ছলনাপর।

তুমি কখন কাহাকেও রক্ষা কর নাই অথচ তোমার আশ্রয়ের জন্য সকলেই ব্যস্ত; তুমি কখন কাহাকেও দয়া কর নাই, অথচ তোমার দয়ার ভিখারী, ছোট বড় অনেকেই; তুমি কখন কাহাকেও সুফল দাও নাই, অথচ সুফলের জন্য তোমার কাছেই সকলে ধাবিত; তুমি কখন কাহাকেও সুখ দাও নাই, অথচ সকলেই তোমার কাছে

সুখ কামনা করে ; তুমি কখন কাহাকেও দান কর নাই, অথচ অনেকের কাছে তুমি দাতাকর্ণ। হে ঘোড় দৌড়ের মাঠ, আমাকে বলিয়া দাও, কি গুণে তুমি জগজ্জনকে ভুলাইয়া রাখিয়াছ ? কোন্ শক্তি বলে, তুমি সকলকে ছলনায় মুগ্ধ করিয়াছ ? হে প্রতারক শ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি প্রণাম করি ; হে শঠচূড়ামণি তোমাকে আমি দূর হইতে বন্দনা করি, বলিতে পার তুমি, কি গুণে লক্ষপতি,ও পথের ভিখারী দুজনকেই একসঙ্গে ভুলাইতেছ ?

হে ভিখারী-প্রসবিনি তোমার জঠরে এমন কি আছে যাহাতে তুমি মিনিটে মিনিটে শত শত ভিখারী প্রসব করিতেছ ? লোক তোমার কাছে ধনভিক্ষায় যায়, আর তুমি তাহারই অধিকারের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া, ধনেপ্রাণে মারিয়া তাড়াইয়া দাও। বলিতে পার কুহকিনি ! কি গুণে লোকে তোমার আগুনে স্বেচ্ছায় পুড়িয়া মরিবার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে আত্মবলি দেয় ? বলিতে পার মায়াবিনি ! কি আলো তুমি দেখাও যাহার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ লোক তোমার দিকে দৌড়িয়া যায়—পড়িতে, পুড়িতে, মরিতে, নিঃশেষ হইতে ? যাদুকরি ! কি যাদুমন্ত্রে তুমি সকলকে বশ করিয়াছ ? পৃথিবীপতি হইতে ভিক্ষাগতি পর্য্যন্ত সকলেই তোমার গুণে আকৃষ্ট। তুমি সমাজের যক্ষ্মারূপে মানবকুলকে ধীরে ধীরে, তলে তলে সংহার করিতেছ, আর সুধীসমাজ সদলবলে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত। তুমি সমাজের সর্ব্বনাশকারিণী, তবু সমাজ তোমার সেবায় ব্যস্ত। বলিতে পার কি, কি গুণে তুমি এই অঘটন ঘটাও ?

হে ত্রিকুলনাশিনি তোমার ভেদনীতি সর্ব্বত্রই তুমি সমভাবে খুব জোরে চালাও ? পিতাকে পুত্র হইতে তফাৎ কর ? মাতাকে কন্যা হইতে দূরে রাখ ? ভ্রাতাকে ভ্রাতার কাছ হইতে ছিনাইয়া লও ? স্বামীকে স্ত্রী

ক্রোড় হইতে ফেলিয়া দাও ? অথচ তোমার ভেদনীতির কি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা, নানা জাতি, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, স্বতন্ত্র পেশাবলম্বী, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী, সকলকেই তুমি একত্র কর, সকলকেই তুমি এক কোলে স্থান দাও। সকলেই তোমার সন্তান, সকলেই তোমার প্রজা, তুমিই সকলের একছত্রী রাজা। তোমার শাসন মানে না, এমন লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ও নগণ্য।

হে সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্বকারিণি ! তোমার গণ্ডির বাহিরে আশে, পাশে, চতুর্দ্দিকে আইনের রাজত্ব, আইনের প্রতাপ, কিন্তু তোমার গণ্ডির ভিতর আইনের কোন ক্ষমতা নাই। আইনের হাত, সর্ব্বকর্ম্মে ও সর্ব্বস্থানেই আছে ; খুব লম্বা, রাজার অন্তঃপুরে, ধনশালীর অট্টালিকায়, ভিখারীর কুটীরে সর্ব্বস্থানে পঁহুছায় ; ব্যবসায়, বাণিজ্যে, বিদ্যালয়ে, সভামধ্যে সর্ব্বত্র আইনের সমান আধিপত্য ; কিন্তু তোমার হাতার ভিতর তাহার প্রবেশ নিষেধ। আইনের দাঁত অতি তীক্ষ্ণ, কিন্তু তোমার গণ্ডীর ভিতর সে দন্তহীন ; আইনের মর্য্যাদা আর তোমার মর্য্যাদা এই দুই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আইন হইল—তোমার অধিকার তাহার হুদ্দার বাহিরে ; সকলেই আইনকে ভয় করে, আর আইন তোমাকে ভয় করে।

অতএব হে আইন-ভীতি-প্রদায়িনি, জনসমাজ-সর্ব্বনাশ-কারিণি, অকল্যাণপ্রসবিনি, গৃহবিচ্ছেদকারিণি, সাপিনি, তাপিনি, সমাজ-লণ্ডভণ্ড-কারিণি, পথের ভিখারী প্রশ্রয়িণি, জুয়াচ্চোর গঠিনি, মান-ইজ্জৎ ভয় নাশিনি, অট্ট অট্ট হাসিনি, ঋণভয় দূরকারিণি, তোমাকে আমি দূর হইতে প্রণাম করি।

হে অঘটন-ঘটনকারিণি তুমি অঘটন ঘটাইতে সিদ্ধহস্ত, পত্নীকে স্বামীর কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে পার, পুত্রকে পিতৃগৃহের বাহির

করিয়া দিতে পার, মানুষকে পশু করিতে পার, মুটেকে বাবু করিতে পার, কাণাকে চক্ষুষ্মান্ করিতে পার, আশামরীচিকায় মানুষকে ঘানী গাছের বলদের মত ঘুরাইতে পার। বলিতে পার সর্ব্বদুঃখ-প্রসবিনি তুমি পার না কি? তুমি জ্ঞানীকে অজ্ঞান করিতে পার, ধনীকে ভিখারী করিতে পার, ডাক্তারকে জুয়ারী করিতে পার, উকীলকে তোমার গণ্ডীর মধ্যে অন্ধ করিয়া ঘুরাইতে পার, আফিসের বাবুকে দ্বারবানের ঋণখাতক করিতে পার, প্রবল পরাক্রান্ত আফিসের বড় বাবুকে জমাদারের কাছে হাত পাতাইতে পার, ব্যারিষ্টারকে তোমার স্তব পাঠ করাইতে পার।

হে অষ্টরম্ভা প্রসবিনি এখন বলিতে পার তুমি পার না কি? বলিতে পারিলে না? জবাব খুঁজিয়া পাইলে না? তবে আমি উত্তর দিতেছি শুন তুমি কি কি করিতে পার না; পার না তুমি মঙ্গল আনিতে, পার না তুমি মানুষের উপর শান্তি জল সিঞ্চিতে, পার না তুমি মানুষকে জ্ঞানী করিতে, পার না তুমি মানুষকে বুদ্ধিমান্ করিতে। হে অমঙ্গল জননি! মঙ্গল তোমার কাছে আসে না, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোমার কাছে পঁহুছে না; তুমি অমঙ্গল-প্রসবিনী, অশান্তির গর্ভধারিণী; তোমাকে আমি দূর হইতে নমস্কার করি। হে মাষ্টার টেলার প্রতিপালন-কারিণি, মোটর গাড়ি প্রতিপালিনি, রেস্‌টিপ্ হকারের শুভানুকাঙ্ক্ষিণি, এসেন্স ব্যবসায়ীর মঙ্গল প্রদায়িনি, মহাজনের কুসীদ প্রসবিনি, দূর হইতে তোমাকে আমি প্রণাম করি।

এ হেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, এ হেন রেসকোর্স, শ্যামলালের আশ্রয় স্থান হইল। যখন সকল আশ্রয় তাহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন শ্যামলাল সে এই শেষ আশ্রয়স্থল রেসকোর্সকে বিশেষ করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল, তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী তাহাকে কোন কাজকর্ম্ম করিতে বলিলেই, সে প্রায় বলিত, দেখ আমি প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার-শ্রেষ্ঠ রামধন ঘোষ মহা-

শয়ের পৌত্র ; আমি বিশেষ লেখাপড়া শিখি নাই ; শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা, আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব ; আমাকে ত মান ইজ্জৎ রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে ; আমি জমিদার ঘরের ছেলে আমি ত আর জমি চষিতে বা চাষবাস দেখিতে পারিব না ; অনেক চিন্তার পর স্থির করিয়াছি এই ঘোড়দৌড়ের মাঠ ধরিয়া আমি ফের দাঁড়াইব ; আমার ঠাকুরদাদা মাঠের অধিপতি হইয়াই বড়লোক হইয়াছিলেন, আমিও মাঠ হইতে পুনরায় মানুষ হইব।

রেণুকণা :—হ্যাঁগা ঘোড়দৌড়ের খেলা এটা ত জুয়াখেলা? ইহা কি ভদ্রলোকের পেশা হইতে পারে?

শ্যামলাল :—তুমি স্ত্রীলোক, বাহিরের খবর কিছু রাখ না, এখানে যত ভদ্রলোকই জমায়েত হয় ; ইহা ভদ্রলোকের মেলা, এ স্থানের এমন মাহাত্ম্য, নীচ ও ছোটলোকও দিনকতক যাতায়াত করিলে, ভদ্রলোক হইয়া যায়। এখানে রাজা যায়, জমীদার যায়, পত্তনীদার যায় ; জজ যায়, ম্যাজিষ্ট্রেট যায় ; কৌন্সিলি যায়, উকীল যায়, এটর্ণি যায় ; ব্যবসাদার যায়, দোকানদার যায় ; দালাল যায়, ক্যানভাসার যায় ; ডাক্তার যায়, ইঞ্জিনিয়ার যায় ; যে খুব কাজে ব্যস্ত সেও যায়, যে কাজ করে না সেও যায় ; যে বেকার সে যায়, যে বেগার সে যায় ; যে প্রফেশার সে যায়, যে শিক্ষক সেও যায় ; যে শিক্ষানবিস সে যায়, যে ফড়িয়া সে যায়, যে হেটো সে যায় ; যেই মানুষ সেই যায় ; যে যায় না, সে মানুষ নয়। আর তুমি ভদ্র হও আর নাই হও ভদ্রলোকের মতন হয়ে তোমাকে যেতেই হবে। দেখ রেণু কথায় বলে ভগবান মানুষ তৈয়ারি করেন, আর দর্জ্জী ভদ্রলোক তৈয়ারি করে ; যে ঐ স্থানে যায় সেই মানুষ সেই ভদ্রলোক। সে কোন জন্মে ভদ্রলোক না হইলেও দর্জ্জী তাহাকে ভদ্রলোক তৈয়ারি করিয়া দেয়।

রেণুকণা :—দর্জ্জী তৈয়ারী ভদ্রলোক ওখানে যান, তা ত শুনিলাম, কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে ?

শ্যামলাল :—টাকা ওখানে জন্মায়। ওখানে টাকা নেই ত টাকা আছে কোথায় ? ওখানে ত টাকা বিছান আছে, খালি কুড়িয়ে লও দুহাতে তুলিয়া লও আর পকেটে পোর।

রেণু :—আচ্ছা ওটাত কোন উৎপত্তির ব্যবসা নয়, বিপত্তির পথ ; উৎপন্ন করে না লোককে বিপন্নই করে।

শ্যামলাল :—আমি উৎপত্তি বিপত্তি বুঝি না, আমি এই জানি ওখানে পয়সা আছে, টাকা আছে, সোণা আছে. গিনি আছে, নোটের তাড়া আছে, সে জায়গায় সব রকম ধনসম্পত্তি উড়ে বেড়াচ্ছে, হাত বাড়িয়ে ধরে লও আর পকেটে পোর।

রেণু :—আর আসছে কোথা থেকে ? অন্য এক জনের পকেট থেকে ত ? উড়ছে কোথা থেকে আর একজনের অধিকার থেকে ত ?

শ্যামলাল :—সব ব্যবসাই ত তাই, একজনে দেয়, আর একজনে পায় ; তুমি চিনির সওদা করিলে একজন ঠকিল, আর একজন জিতিল। এক জায়গায় খাল না হইলে আর এক জায়গা ভরাট হয় কোথা থেকে ?

রেণু :—তুমি শস্য উৎপাদন কর, তুলা উৎপাদন কর, জিনিস প্রস্তুত কর, সেগুলা পূর্ব্বে ছিল না তুমি করিলে ; উৎপাদন করিলে বা প্রস্তুত করিলে।

শ্যামলাল :—সে ত চাষার কাজ, সে ত কুলী মজুরের কাজ ; সে ত কলওয়ালার কাজ,ভদ্রলোকের কাজ তা ত নয়। কৌন্সিল উকীল এটর্ণি, দালাল, ব্যবসায়ী,তাহারা ত কিছু উৎপাদনও করে না প্রস্তুতও করে না, অথচ তাহারা সবচেয়ে বেশী অর্থ উপার্জ্জন করে ; তুমি রমণী, তুমি ওসব

বুঝ না, স্থির জেনো, রেসকোসে টাকা আছে; আমি অত শত বুঝি, আর না বুঝি, নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমি দেখ্‌ছি তুমি অতি সুন্দরী, আমি দেখছি খোকা আরো সুন্দর; আমি লোকের কথা শুনিয়া তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি সেখানে টাকার ছিনিমিনি খেলা হয়, নোটগুলা, সাঁওতাল পরগণার ঝড়ের শালপাতার মতন উড়ে বেড়ায়, গিনি গড়িয়ে যায়, আমি নিজ চক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ দেখেছি, তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। রেণু আমার কথা ধ্রুবসত্য কিছুমাত্র মিথ্যা নয়।

রেণুঃ—টাকা যদি উড়্‌ছে তবে ধর না কেন?

শ্যামলালঃ—তুমি মেয়ে মানুষ ভুল বুঝিতেছ। রেণু, পাখা উড়ছে, ধরতে গেলে আটা কাটী চাই, জাল চাই, ফাঁদ চাই। মাছ জলে খেলছে, ধরতে গেলে জাল চাই, না হয় অন্ততঃ একটা ছিপ চাই, সূতা চাই, চার চাই, টোপ চাই; বাহির থেকে কিছু আনিতে গেলে, মোটের উপর অল্পবিস্তর জমা চাই, পুঁজি চাই।

রেণুঃ—এখন পুঁজি পাবে কোথা থেকে? জমিদারী বন্ধক? যা কিছু আয় আছে তাহাতে খরচ কুলায় না; কলিকাতায় ঘর নাই, বাড়ী নাই, ব্যবসা নাই, বাণিজ্য নাই, তেজারতি নাই, টাকা আসে কোথা থেকে?

শ্যামলালঃ—কলিকাতায় যে বাটীর কথা বলিলে যদি আমি দিন-কতক রেস কোর্সে ভাল রকম খেল্‌তে পারি, তবে তুমি মাটির ইটের বাড়ীর কথা কি বলছ, আমি সোণার ইটের বাড়ী কর্ত্তে পারি। রেণু আমায় বিশ্বাস কর আমায় ভাগ্য পরীক্ষা করিতে দাও।

রেণুঃ—আমার কি আছে তোমায় দিব?

শ্যামলালঃ—তোমার সব আছে। এই গতকল্য বড়দাদা মণিঅর্ডার

যোগে সংসার খরচের জন্য যে ১২৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, সেই টাকাটা দাও; আগামী কল্য শনিবার রেসকোর্স; কাল সন্ধ্যাবেলা তোমাকে তোমার টাকা ফেলিয়া দিব; আর আমার হাতে ৩৭৫৲ টাকা থাকিবে; সেই লাভের টাকা হইতে টাকা বাড়াইব; আর তোমাকে ত্যক্ত করিব না; কালকের জন্য টাকাটা দাও।

রেণু:—ও ত সংসারের খরচের টাকা। গোয়ালাকে দিতে হবে, মুদীকে দিতে হবে, ধোপাকে দিতে হবে, নাপিতকে দিতে হবে, লোক-জনের মাহিনা দিতে হবে, তাহারা টাকা না পাইলে দক্ষিণ হস্তের দফারফা, আমাদের নিজের কথা বলি না, তুমি আমি না হয় উপোষ করে রহিলাম, খোকার দুধ বা দাসদাসীর পেট চলে কোথা হ'তে? মায়ের সেবার কি হবে?

শ্যামলাল:—আরে দূর হ'ক, তুমি আমার কথা একেবারেই বুঝ নাই, তুমি ত টাকাটা কাল সকালে দিবে, আমি তোমাকে সন্ধ্যা বেলায় ফেরৎ দিব; তুমি যাহাকে যাহা দিবার, আগামী পরশ্ব দিবে।

রেণু:—সেত,—তুমি যদি জেত? আর যদি হেরে যাও?

শ্যামলাল:—ছিঃ রেণু স্ত্রী হয়ে আমার অমঙ্গল কামনা?

রেণু:—নাথ, আমাদের যে অমঙ্গলে ঘেরেছে, সেই জন্যই আমার সদাই শঙ্কা হয়।

হট্টেশ্বর:—(বাহির হইতে) শ্যামলাল বাবু বাড়ী আছেন? শ্যামলাল বাবু বাড়ী আছেন? দ্বিপ্রহরে অন্দরে; এত মন্দ ভাগ্যের চিহ্ন, বৈঠকখানায় বসব না কেন?

শ্যামলাল:—কে, হট্টেশ্বর ভায়া বস, আমি এখনই যাচ্ছি; দেখ রেণু, সকলে আমায় ত্যাগ করেছে, কেবল হট্টেশ্বর ও রামময় আমার পূর্ব্ববন্ধু, এখনও আমায় ছাড়ে নি।

রেণু :—রাহুগ্রাস করিলে অন্যের আর স্থান কোথায়? হটু বাবু তোমার রাহু, তোমার অমঙ্গল, তোমার শনি।

শ্যামলাল :—দেখ রেণু ও কথা বল না, অন্যায় হবে অধর্ম্ম হবে, রামধন ঘোষের বংশ কখনও অকৃতজ্ঞ হইতে পারে না। রামধন ঘোষের পৌত্র কখন নিমক হারাম নয়, না, প্রাণ থাকিতে অধার্ম্মিক হইতে পারে না।

রেণু :—তাহা হইলে আমার ভাসুরও ত রামধন ঘোষের পৌত্র, তাহাকে অবিশ্বাস কর কেন? তাহার সহিত মামলা কেন?

শ্যামলাল :—সে যে আমার জ্ঞাতি শত্রু।

রেণু :—ও সে যে তোমার মায়ের পেটের ভাই?

হট্টেশ্বর :—ওহে ভাই দেরী হয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে দেরী করে গেলে তার সঙ্গে দেখা হবে না।

রেণু :—আচ্ছা হটু বাবু তোমাকে ভাই বল্‌ছে কেন?

শ্যামলাল :—বুঝলে না ও যে আমার পরম বন্ধু, উপকারী মিত্র।

রেণু :—উপকারী মিত্র পরম বন্ধু হইলে, তবে ভাই বলিবার অধিকার হয়, আর যে নিজে যথার্থ মায়ের পেটের ভাই সে তোমার পরম বন্ধু নয় উপকারী মিত্র নয়?

শ্যামলাল :—এ যে কলিকাল।

রেণু :—সে ত সকলকার পক্ষেই।

শ্যামলাল :—তুমি বড় উকীলের মেয়ে তোমার সঙ্গে তর্কে পারিবার যো নাই; শুন হটু বাবু দাঁড়িয়ে আছে, বস্‌তে দেবার জায়গা নাই, কেননা বৈঠকখানা এ ছোট বাড়ীতে নাই; ও চলে গেলে সব মাটি, তুমি অন্ততঃ আমাকে গোটা দশেক টাকা এখন দাও, টিপ্‌স্‌ যোগার করতে হবে, আর বাকী ১১৫৲টাকা কাল দিও।

রেণু :—টিপস কি ?

শ্যামলাল :—তুমি নেহাত সেকেলে ধরণের মেয়ে মানুষ, তাই টিপস্ কি বুঝ না, এখনকার সকল শিক্ষিতা মেয়েমানুষ টিপস্ বুঝে। টিপস্ হচ্ছে, টাকার বিচি। রেসে টাকা জিতিবার ইসারা।

রেণু :—দেবে কে ?

শ্যামলাল :—রেসের যে ঘোড়া দৌড়াইবে তাহার যে জকি অর্থাৎ সেই ঘোড়ার যে সওয়ার তাহারই খানসামা।

রেণু :—কি খানসামা টিপস দিবে আর তুমি টাকা জিতিবে, সে তবে খানসামাগিরি করে কেন ? তাহার রেস খেলাইলেই ত হ'ত।

শ্যামলাল :—সে জকির খানসামা না হইলে টিপস্ পেত কোথা থেকে ; আর রেস খেলার চেয়ে এই সব টিপস্ দিয়ে তার আয় বড় কম নয়।

রেণু :—টিপস্ ঠিক হয় ?

শ্যামলাল :—হাঁ তা প্রায়ই ঠিক হয়, অনেক সময়ই হয়, তবে কখন কখন হয় না।

রেণু :—তা রেসের এই পূজারী হচ্ছে তোমার খানসামা।

শ্যামলাল :—যাক্ বাজে কথা রাখ, আমায় দশটা টাকা দাও। (উচ্চৈঃস্বরে) হট্টেশ্বর, দাঁড়াও আমি যাচ্ছি, কিছু রেস্তোর যোগার করে নিয়ে যাচ্ছি ; রেণু, দোহাই বলচি দশটা টাকা দাও, তা না হলে আমার সব দিক্ মাটি।

রেণু, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বাক্স খুলিয়া দশটী টাকা বাহির করিয়া শ্যামলালের হাতে দিয়া বলিল ; এই লও খানসামার প্রণামি।

শ্যামলাল টাকাকটি হাতে লইয়া গায়ে তাড়াতাড়ি একটা জামা দিয়া

চাদরখানা গলায় ফেলিয়া বেগে বাটীর বাহিরে আসিল, আর বলিল, চল হট্টেশ্বর এই এসেচি।

হট্টেশ্বর :—বুঝলে কি না, রোস্থল সময় দিয়েছে ৪টা থেকে ৪৷৷টা—তাহার আর ত এনগেজমেণ্ট (engagment) আছে ; দেরী কর্ল্লে আমাদের কার্য্য ফেঁসে যাবে। তা তুমি বাহিরের ঘরে থাক না কেন ?

শ্যামলাল :—বন্ধু ভুলে গেলে সস্তার জন্য এ বাটীতে এসেছি, এখানে বাহিরের ঘর কোথায় ?

হট্টেশ্বর মাথা চুলকাইতে, চুলকাইতে ; তা বটে, তা বটে, তবে ডাক্‌লে পর একটু শীঘ্র এস। কোন কাজেই দীর্ঘসূত্রতা ভাল নহে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"কুড়ের রাজা পরমহংস"

কমল :—হ্যাগা, হট্টেশ্বর বাবুর ছেলেটী কেমন আছে? আহা মায়ের জীবনে ঐ একমাত্র ধ্রুবতারা; সেটীর কিছু হলে তার মায়ের জীবন একেবারে মরুভূমি হয়ে যাবে। ছেলেটী ৫ বৎসরের, দেখ্‌তে যেন ছবিখানি, ভগবান গরীবের ঘরে এমন রত্ন কেন দেন? বোধ হয় অন্য কোন সুখ দেন নাই বলিয়া এমন অমূল্য রত্ন, সেই অভাগিনীকে দিয়াছেন। যেরূপ অবস্থা, বোধ হয়, সে রত্ন যাঁহার দাম তিনিই কাড়িয়া লইবেন।

রাজীবলোচন :—অবস্থা ছেলেটার খুব খারাপ; ডবল নিউমনিয়া, বুকে শ্লেষ্মা ভরা, রামমোহন বাবুর দয়ার শরীর; তিনি প্রাণপণ করিয়া দেখিতেছেন তবে, তিনি বলেন, আর একজন বড় ডাক্তার হইলে ভাল হয়; আজকের দিনে ৩২৲ টাকার কমে বড় ডাক্তার পাওয়া যায়না। অভাগিনী কামিনীর ৩২ পয়সা দিবার ক্ষমতা নাই সে ৩২৲ টাকা পাবে কোথায়? হট্টেশ্বর কাল রাত্রে একবার বাটীতে এসেছিল; সে বলে নারায়ণ তাহাকে অর্থ দেন নাই, সে করিবে কি? সে বলে, আর তাহার কথামত, ভগবানে তাহার অগাধ বিশ্বাস, ডাক্তার কি করিবে; যদি বাঁচিবার হয়, রামকমল বাবুর হাতে বাঁচিবে না হয় নাচার; তাহার স্ত্রী কামিনী অনেক কান্নাকাটা করিয়া বলিল, দেখ গো, এমন সোণার রত্ন হেলায় হারাবো? একবার চেষ্টা কর তোমার এত লোকের সঙ্গে আলাপ, কিছু টাকার যোগাড় করে নিয়ে এস; তাহাতে

হট্টেশ্বর বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিল, কাল শনিবার রেসের দিন সে গোটা কয়েক টাকা নিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করিবে, যদি জেতে, তবে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আস্‌বে। এই বলে ভোর বেলায় সে খোকার গলার বিছেগাছটা খুলে নিয়ে চলে গেছে; ছেলেটার অবস্থা অতি শোচনীয়; কামিনীর হাতে এমন একটী পয়সা নাই, যে রোগীর পথ্য যোগাড় করে। মুমূর্ষ ছেলের গলায় একগাছা পাতলা বিছে ছিল; সেটাও হট্টেশ্বর নিয়ে চলে গেছে। সেটা মানুষ না দানব!

কমল:—বল কি? তা সে পার্ল্লে? আচ্ছা তবে তুমি হরেন কাকাকে ডেকে নিয়ে এস না? তিনি ত বড় ডাক্তার।

রাজীবলোচন:—তাঁকে আনবার জন্ম অনেক চেষ্টা করেছিলাম, প্রথম, তিনি ৩২৲ টাকার কম আসবেন না, দ্বিতীয়, তাঁহার যৌথচাষ কোম্পানীর বাৎসরিক অধিবেশন, পরশ্ব দিবস, তিনি তাহা লইয়া অতিশয় ব্যস্ত আছেন, বলিলেন, তাঁহার মরিবার সময় নাই, তা পরের ছেলে দেখতে যাবেন কি করিয়া?

কমল:—হ্যাগা তিনি ত বড় ডাক্তার, তাহার আবার "কোম্পানীর" প্রয়োজন কি; তিনি তাঁহার পেশা করে সময় পান না, কখন অন্য কাজ কারবেন; তিনি যে বিদ্যা শিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ খায় কে? তাঁহার পেশায় মানুষের উপকার করিবার কত সুবিধা, গরীবকে প্রাণদান দিবার কত সুযোগ, এই সৌভাগ্য কয়জনকার হয়?

রাজীবলোচন:—কমল, যাহার যত অর্থ, তাহার ততোধিক লালসা, তাহার তত অধিক অভাব; তাহার খরচপত্র অনেক, তাহার উপর রেসের ঝোঁক; প্রত্যেক সপ্তাহেই রাশী রাশী টাকা চাই, আর অনেকটা সময় ঘোড়দৌড়ের মাঠেই কেটে যায়।

কমল:—দেশটা হ'ল কি! সকলেই ঘোড়দৌড়, ঘোড়দৌড় করে

দৌড়াচ্ছে। লোকে ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে দৌড়াচ্ছে, আর লক্ষ্মী দেবীও অন্যদিকে পালাচ্ছেন; মা লক্ষ্মী, ঘোড়দৌড়ের দিকে একেবারেই যান না; ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে অনেক দূরে থাকেন, হাগা হট্টেশ্বর বাবু ত, জুয়ারী তার প্রতি লক্ষ্মীর দয়া হবে কোথা থেকে?

রাজীবলোচন:—প্রথম অলস, দ্বিতীয় জুয়ারী, ভাণ ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাস, তিনি কিছুই নিজের জন্য করিবেন না, ভগবান তাহার জন্য যা পারেন করুন।

কমল:—দেখ গো আমার হাতে কিছুই নাই, গলায় এই হার ছড়াটা আছে, এটা বন্ধক দিয়ে ছেলেটার চিকিৎসা করাও, যদি বাঁচে অভাগিনী কামিনীর কোলটা জোড়া থাক্‌বে। ঈশ্বরের একটা জীবও রক্ষা পাবে, সুবিধা হলে হট্টেশ্বর বা কামিনী হারটা উদড়ে দিতে পার্ব্বে, না হয় তোমার সুবিধা হলে খালাস করে দিও।

রাজীবলোচন:—কমল, তা আমি পারব না? তোমার সবই গেছে আমারই দোষে; তোমার হার নিয়ে এক অনাথিনী বন্ধুপত্নীর পুত্রের চিকিৎসার জন্য তোমাকে আরো অধিক দুঃখিনী করতে পারব না, দেখি যদি নিজে কিছু টাকার যোগাড় করতে পারি।

কমল:—তুমি যা বল্‌চ তাহার সময় কোথায়! ছেলেটার অবস্থা খুব খারাপ; তুমি টাকা পেতেও পার, নাও পেতে পার, ততক্ষণ রোগ ত আর অপেক্ষা করে থাকবে না; তুমি পুরুষ মানুষ, নারীর বেদনা কি বুঝ্‌বে? কামিনী আত্মীয়া না হইলেও পরিচিতা রমণী, স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা, অভাগিনীর এই ছেলেটী তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, আমার গলায় হার রইল, আর না রইল, তাতে কিছু এসে যায় না; ছেলেটী বেঁচে গেলে তার প্রাণটা ঠাণ্ডা থাক্‌বে, কোল্‌টা জোড়া থাকিবে; ভগবান আমাকে সন্তান সুখে বঞ্চিত করেছেন, তাহাতে

আমার কোন দুঃখ নাই, অন্যে সন্তান রত্ন পেয়ে সামান্য টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় তাহাকে হারাবে, তা আমি সইতে পার্ব্ব না। তুমিই ত আমাকে বলেছ পরোপকার মহাব্রত তবে আজ এরূপ বল্‌ছ কেন? টাকা হইলে অনেক হার হইবে, কিন্তু সময়ে চিকিৎসা না হলে ছেলেটী বাঁচিবে না। দেখ তুমি ডাক্তার ডাক্‌তে যাও; আর পথ্যের যোগাড় কর, আমি কামিনীর বাটীতে যাচ্ছি, আহারাদি যা হয় হবে, দেখা যাক যদি ছেলেটার কিছু করতে পারি; নিধু মাসীমা আজকের মতন তোমার জন্য রাঁধবেন, তুমি সময়ে খেয়ে যেও, আমার যা হয় জল টল খেয়ে চলে যাবে, এই হার লও।

রাজীবলোচন হার লইয়া পোদ্দারের দোকানে গেলেন। বন্ধক দিয়া ৬০৲ টাকা পাইলেন, তাহার পর রামমোহন ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া রমণ ডাক্তারকে ডাকিতে গেলেন। রমণ ডাক্তারকে সকল কথাই বলিলেন, প্রার্থনা ভিজিট কিছু কম লয়েন; রমণ ডাক্তার, ডাক্তারী হিসাবে খুব ভাল কিন্তু পয়সা হিসাবে, আজ-কালকার অধিকাংশ নামজাদা ডাক্তারদের ন্যায় পিশাচ। মনে মনে বিশ্বাস খুব হুসিয়ার, কেহ তাঁহার মন নরম করিয়া তাঁহাকে ঠকাইতে পারিবেন না; তিনি বলিলেন কি জান রাজীব! তুমি বলিতেছ আমি কিছু কম নিতে পারতাম; কিন্তু আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে একটা শিষ্টাচার, রীতি ও আদব কায়দা আছে, তাহার ব্যতিক্রম করিলে ছোট ডাক্তারদের প্রতি অত্যাচার করা হয়। রোগীর বা তাহার আত্মীয়ের উপকার করিতে গিয়া পেশা হিসাবে আমার ভ্রাতৃবৃন্দের অপকার করি কেমন করিয়া? আমি সে অন্যায় করিতে পারিব না, অতএব ডাক্তার হিসাবে আমার সাহায্য চাও ত আমাকে পুরা ৩২৲টী টাকা দিতে হবে; তবে চেষ্টা কর্‌ব যাহাতে কম বার যেতে হয়।

রাজীবলোচন ডাক্তারকে ঠিকানা লিখাইয়া দিয়া বেদানা, লেবু, মিছরী, ও অন্যান্য পথ্য কিনিয়া লইয়া হট্টেশ্বরের বাটী আসিয়া পঁহুছিলেন। সেখানে আসিয়া দেখেন, কমল তাহার পূর্ব্বেই সে বাটীতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে আর রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন রোগীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কামিনী কাঁদিয়া একবার হট্টেশ্বরকে খবর দিতে বলিল, জানি তিনি আজ বড় ব্যস্ত তবু তাঁহার জিনিষ তিনি নিজে শেষ অবস্থায় একবার নেড়ে চেড়ে দেখে যান। রাজীবলোচন তাহাকে আশ্বাস দিয়া ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে রমণ ডাক্তার আসিলেন; রাম ডাক্তার আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি সমস্ত কেসটী বুঝাইয়া দিলেন, আর কি কি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্যবস্থাপত্র দেখাইলেন; দেখিয়া শুনিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া বলিলেন, ব্যারাম অতি কঠিন, তবে দেখা যাক কতদূর কি করিতে পারা যায়। খানিকক্ষণ পরে রামমোহন ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কিহে রামমোহন বাবু বৈকালে কি আস্‌তে হবে?

রামমোহন:—মহাশয়, এরা অতি ছাপোষা, যদি বিশেষ দরকার হয়, বলে পাঠাব, না হয় কাল সকাল খবর দিব। তাহার পর রমণ ডাক্তার রাজীবলোচনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ছেলেটীর বাপ্ কোথায়? রাজীবলোচন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, হট্টেশ্বর বাবু একটু কাজে বেরিয়ে গিয়াছেন, মহাশয়, ফের যখন আসিবেন যদি ভিজিটের বিষয়ে কিছু দয়া করেন; শুনিয়া রমণ ডাক্তার বলিলেন, রামমোহন বাবু রোগী শুষ্‌ছে, তাহার পিতা রোগী ফেলে কাজে গিয়াছেন অবশ্য পয়সা রোজগার করতে, আর আমরা নিজের কাজ ফেলে পরের ছেলে দেখে বেড়াব, তাতেও লোকে ভিজিট কম নিতে বলে? কি অন্যায়, কি

অন্যায়, তা হবে না, তা হবে না, যদি আস্‌তে হয় পূরা ভিজিট লাগবে। এই বলিয়া রমণ ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

রাজীবলোচন :—রামমোহন বাবু তবে কি হবে?

রামমোহন :—আজ্ঞে আজকের দিন্‌টা কোন রকমে কাট্‌লে তবে বলা যায়।

রাজীবলোচন :—তবে কি রমণ বাবুকে ফের আনতে হবে?

রামমোহন :—দেখুন হাত ভগবানের, তবে অবস্থাটা খারাপ, সেইজন্য সন্ধ্যাবেলায় একবার এলে ভাল হয়।

রাজীবলোচন :—আজ্ঞা অবস্থাটা সকল দিকেই খারাপ সেই জন্যই ত বিশেষ মুস্কিল। কমলের হার বাঁধা দিয়া এ বেলা খরচা চালালাম, ঔষধ পথ্য আর ভিজিট দিয়ে হাতে আছে ২০৲ টাকা; আপনি খুবই দয়া কর্‌ছেন, মনুষ্যত্ব দেখাচ্ছেন। রমণ ডাক্তারকে মানুষ ভেবে কিছু ফি কমাতে বল্‌লাম, তা তাঁহার কথা ত শুনিলেন। ওঃ কি নরপিশাচ! কি অর্থ পিশাচ! তবু একটী পয়সা তাঁহার সঙ্গে যাবে না, আর ছেলেটা ত ঘোর জুয়ারী, উনি দেড়েমুষে লোকের নিয়ে যান্, আর সে সচ্ছন্দে গরীবদের রক্ত উঠা টাকাগুলো অনায়াসে জুয়ার আড্ডায় দিয়া আসে। [illegible] বেলা চারিটা আন্দাজ একবার দেখে, দরকার হয় একখানা চিঠি লিখে দেবেন, তাকে আর একবার আনা যাবে। টাকার যোগাড় যা হয় করে, করছি।

রামমোহন :—রাজীবলোচন বাবু, আজকালকার দিনে আমাদের বড় ডাক্তারদের কথা আর বলবেন না, তাঁহাদের যতই আয় ততই অভাব; হয় ঘোর খরুচে স্ত্রী, না হয় বেজায় ব্যয়শীল পুত্র কন্যা, না হয় অমিতব্যয়ী জামাতা, না হয় উড়োনচণ্ডে শ্যালক, না হয় নিজেই জুয়ারী, যতই আসুন, ডাইনে আনিতে বাঁয়ে আঁটেনা, অভাব সর্ব্বসময়ে; সন্তোষ ও

শান্তি কিছুতেই নেই। অনেক সময়ে ডাক্তার বাবুদের সাকিম, মোটর গাড়ী, নিজের বসতবাটী পর্য্যন্ত নেই, থাকেন ভাড়াটে বাড়ীতে, তবু একখানা মোটর গাড়ী চাই; অন্যায় অভাবে মানুষের চামড়াখানি খসে গেছে; চক্ষুলজ্জা লোপ পেয়েছে, হয় চশমা লাগিয়ে, না হয় চক্ষু খুব ছোট বলে; জিহ্বা খুব লম্বা, সেথায় কিছু বল্‌তে আটকায় না; এদের অনেকেই মানুষরূপে অমানুষ; ভগবান এদের সুমতি দিন।

রাজীবলোচন:—ডাক্তারবাবু রাগ করবেন না, ডাক্তারীটা আমাদের দেশে পরগাছা; পূর্ব্বে কবিরাজদের এত হাকাই ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় গোপীমোহন রায় সিমলার সুবিখ্যাত কবিরাজ শিরোমণি ২৲ টাকা ভিজিটে যথেষ্ট সম্মানে ও সম্ভ্রমে জীবন কাটাইয়াছেন, আর চিরজীবনটা আর্ত্তের উপকার সাধন করিয়াছিলেন।

রামমোহন:—সে দিন চলে গেছে, এখন কবিরাজরাও সাড়ে বত্রিশ ভাজা। ৩২৲ টাকা ভিজিট, তাহার উপর কখন কখন গাড়ী ভাড়া। "স পাপিষ্ঠ স্ততোঽধিকঃ" আমরা অন্যায় করে অভাব বাড়িয়ে কিছুতেই আর দুমুখ সমান করতে পার্‌ছি না।

রাজীবলোচন ডাক্তারকে নমস্কার মহাশয়, বলিয়া বিদায় দিলেন; পরে কমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, বোধ হয় রমণ ডাক্তারকে আর একবার ডাক্‌তে হবে, কাছে ২০৲ টাকা মাত্র আছে, ঔষধ হয় ত কিছু চাই, দেখি কোন রকম করে যদি টাকার যোগাড় করতে পারি।

কমল:—চেষ্টা দেখ, আমিও চেষ্টা দেখ্‌ছি।

রাজীবলোচন হট্টেশ্বরের সন্ধানে গেল; বেলা তখন প্রায় ১১টা, এদিক ওদিক অনেক সন্ধান করিল, কোথাও দেখা পাইল না। শেষে ঘুরিতে ঘুরিতে লালদিঘীর পাশে সেক্‌রেটরিয়েট্‌ আফিসের সামনে এসে দেখে, সে আর শ্যামলাল ট্রাম কোম্পানীর একখানি মোটর বাসে বসিয়া হাস্য

পরিহাস করিতেছে। সে গাড়ীতে লেখা "For the races" রাজীব গাড়ীর কাছে গিয়া, হাত ছানি দিয়া হট্টেশ্বরকে ডাকিল। সে দেখিয়াও দেখিল না, তখন অগত্যা গাড়ীতে গিয়া উঠিল, দেখিল হট্টেশ্বরের হাতে নোটের তাড়া। হট্টেশ্বর ও শ্যামলাল দুইজনে নোট গণিতেছে, আর হাসিতেছে, খুব খুসী, খুব স্ফুর্ত্তি, পান চিবাইতেছে, মুখে হাতীমার্কা সিগারেট, হাঁটুর উপর ওভার কোট। রাজীবলোচন সমস্ত কথাই বলিল, শুনিয়া হট্টেশ্বর উত্তর করিল, তা আমি আর কি করিব? তুমি ত বন্ধুর কাজ করিতেছ, ভগবান আছেন, আর রামমোহন ডাক্তার আছেন; মানুষে কি করিতে পারে? আর আমি তোমার চেয়ে বেশী কি করব? যা শুনিলাম তাহাতে বুঝিলাম ছেলের চিকিৎসা ভালই হইতেছে; দেখ দু নৌকায় পা কিছুই নয়, তুমি যা পার কর আর কামিনী খুব ভাল, তার চেয়ে সেবা আমি আর কি ক'রব? দেখি যদি তারা মুখ রাখেন আর সেলিমের টিপ ঠিক হয়, সন্ধ্যার পর চারিজন ইংরাজ ডাক্তার ডাক্‌ব।

রাজীবলোচনঃ—ততক্ষণ পর্য্যন্ত রোগ তোমার জন্য অপেক্ষা না করতে পারে "এখন মরে লক্ষণ তা ঔষধ দিবে কখন"। তুমি বাটীতে এস, কিছু টাকা দাও, আজ রেসে নাই গেলে? এতদিন ত রেসে চেষ্টা চরিত্র করলে কিছু ত হল না, এখন না হয় ছেলের জন্যে বংশের খাতিরে একদিন রেসে নাই গেলে।

হট্টেশ্বরঃ—তাও কি হয়, আমি বাটীতে থেকে তোমাদের চেয়ে বেশী কি করব, আমার ও রকম মিছে মায়া নাই, আমি মায়াতে মুগ্ধ নহি, আমি এখন মুক্ত, ভগবানের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস, সমস্তই তাঁহার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। ছেলেই বল, স্ত্রীই বল। সংসার ঘরকন্নাই বল, সবই মায়া, সবই ক্ষণস্থায়ী; দেখ রাজীব, আমি অধার্ম্মিক নহি, আমি অবিশ্বাসী নহি; শ্যামলালকে কথা দিয়েছি, তাহার সঙ্গে

রেসে যাব ; আমি সে কথা খেলাপ করতে পারব না ; যাহার কথার ঠিক নাই, তাহার কিছুরই ঠিক নাই ; তুমি আমায় এ অন্যায় অনুরোধ করিও না ; সে আমার উপর বিশ্বাস করে বাড়ী থেকে টাকাকড়ি নিয়ে বেড়িয়েছে, আমি তাহার কাছে অবিশ্বাসী হতে পারব না, আগে ধর্ম্ম তাহার পর স্বার্থ; নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য সকলেই ত ব্যস্ত ; যে পরের উপকারের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে সেই ত মহাপুরুষ।

রাজীবলোচন :—অন্ততঃ তবে গোটা ৩০৲ টাকা দিয়ে যাও ; দেখ "কুড়ের রাজা পরমহংস" তুমি এরূপ করে আত্মপ্রবঞ্চনা করিও না, এইরূপ ভণ্ডামি করিও না, এই তোমার কাছে নোটের তাড়া, আর বিনা চিকিৎসায় তোমার ছেলে মরে, তুমি ঠক্, প্রবঞ্চক, তুমি সে ছেলেকে দেখবে না ? তুমি বিশ্বাসের ভাণ দেখাচ্ছ, বল্‌ছ রেসে না গেলে শ্যামলালের কাছে অবিশ্বাসী হতে হবে। তুমি যখন কামিনীকে বিবাহ করেছিলে, কি বলেছিলে ? তুমি কি শপথ কর নাই তাহাকে সকল সময় সকল অবস্থায় রক্ষা করিবে ? তুমি এখন মুমূর্ষু অবস্থায় নিজের শিশুকে ফেলে নিজের স্ত্রীকে ফেলে, ইয়ারকি দিতে যাচ্ছ ; স্ফুর্ত্তি করতে যাচ্ছ। দেখ যত রকম পাপ ও ভণ্ডামি আছে ধর্ম্মধ্বজীর পাপ সব চেয়ে হীন ও হেয়। দাও, কিছু টাকা দাও, না হয় জোর করে নিয়ে যাব।

হট্টেশ্বর :—কি মনে করেছ, মনে থাকে এটা ইংরাজ রাজত্ব। এখানে জোরজুলুম খাট্‌বে না। বিশেষ গোল করিলে পুলিশ ডাক্‌ব, এই আমি চল্‌লাম কে আমার উপর জোরজারাবাত করে। এস হে শ্যামবাবু এই বলিয়া দুইজনে মোটরবাস হইতে নামিয়া একখানি চলতি মোটর গাড়ীতে উঠিয়া বসে মোটর চালককে রেসকোর্সের দিকে চালাইতে বলিল। রাজীবলোচন তখন দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল।

পরে আস্তে আস্তে লোন (loan) আফিসে গিয়া, নিজের মূল্যবান রিষ্টওয়াচ ও হাতের আংটী বন্ধক দিয়া ৬০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া হট্টেশ্বরের বাটী ফিরিল। সেখানে গিয়া দেখেন রোগী ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কামিনী ক্রন্দন করিতেছে; কমলা রোগীকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, হট্টেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বক্কেশ্বর খবর নিতে আসিয়াছেন। সে রাজীব-লোচনকে দেখিয়া, এই যে রাজীববাবু, আপনি আসিয়াছেন, তবু ভাল; আপনার বন্ধুটী কোথায়? যাহা হউক আপনাকে দেখিয়াও আমার ভরসা হইল, মনে হইল, দেশে ধর্ম্ম এখনও আছে; আপনারা পাঁচ জনে হোটর মাথাটা খেলেন। তা যাহা হউক আপনি উহার পূর্ব্বকৃত উপকার মনে রাখিয়াছেন, এই ভাল; হটোটা চিরকালই হাবাতে, লক্ষ্মীছাড়া। বাবা প্রায়ই বলিতেন বক্কেশ্বর তোমার জন্য ভাবিনা, ভাবনা কেবল হট্টেশ্বরের জন্য। তা, বাবা মরেছেন বেঁচে গেছেন। হটোর দুঃখ দেখ্‌তে হল না।

ছেলেটা মরে তা তার খোঁজ নেই, মার পেটের ভাই নাড়ীর টান; কি করি, থাকতে পারলাম না, দেখতে এলাম, নহিলে এমন ভায়ের আবার মুখ দেখে? বেলা হল কাজ আছে, তুমি রহিলে দেখো, আর তুমি ত বেকার; তোমার বসে থাকলে কোন ক্ষতি নাই, বরঞ্চ পূর্ব্ব ঋণ কতকটা শোধ হবে, আমার কাজ আছে, বেশী দেরী করতে পারব না; যদি সন্ধ্যার পর দেখতে আসতে না পারি সুবিধা করে একবার খবর পাঠিয়ে দিও; দেখ ভাইপো বংশের তিলক, নাড়ীর টান, প্রাণটা কাঁদে তাই খবর শুনতে চাই; দূর হক আমি আর ভেবে কি করব? যা করেন শ্রীমধুসূদন। হরিবোল হরিবোল শ্রীহরি শ্রীহরি। এই বলিতে বলিতে বক্কেশ্বর বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। রাজীবলোচন দৌড়িয়া ডাক্তারের বাটী গেলেন। কামিনী চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা পুলিশ আদালত

বেলা ১০॥ ঘটিকা; কলিকাতার পুলিশ আদালত জম্‌ছে; দলে দলে বিভিন্ন জাতির লোক আদালত প্রাঙ্গণে কাতার দিতেছে; এই প্রাঙ্গণে বিভিন্ন পোষাকে, বিভিন্ন জাতীয় লোক; দেখলেই বুঝা যায় বাঙ্গালী নিজের দেশে বিদেশী; মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী, অধিকাংশ লোকই অপর দেশীয়, বাঙ্গালার পূর্ব্বতন অধিবাসী নয়। বাঙ্গালী সকলকে সমান চক্ষে দেখে, তাহার কাছে "বসুধৈব কুটুম্বকম্‌," কিন্তু বাঙ্গালী ছাড়া অপর সকল জাতীই তাহাদের নিজ নিজ দেশের লোকের উপর বিশেষ টান। নিজ গ্রামবাসী বা প্রদেশবাসীর দাবী তাহাদের কাছে সর্ব্ব প্রথম, তাহার পর অন্যদেশবাসী। বাঙ্গালীই শুধু বিশ্বপ্রেমিক, সকলেরই উপর ভ্রাতৃভাব; সকল দেশবাসীই তাহার ভ্রাতা, নিজের আবাস ভূমি পরকে দিয়া সে এখন ভিখারী, ভোলামহেশ্বর। এখানে মাড়োয়ারের অনেক লোক বাস করে; কাযেই অনেক মাড়োয়ারী আদালতে আসে; অমনি বাঙ্গালী উকীলের কেরাণী মাড়োয়ারী; আর তাহাদের চাকরীর সর্ত্ত খুব কড়া; উকীলের চেয়ে কোন অংশে তাহার প্রতিপত্তি কম নয়। অনেক সময় তাহাদের মধ্যে প্রভুত্ব নির্ণয় করা বড় কঠিন। এই আদালত গৃহ ও প্রাঙ্গণ দেখিলেই বুঝা যায়, অপর দেশের কতলোক বাঙ্গালার ভূমি, জমি, ব্যবসা, বাণিজ্য, পেশা অধিকার করিয়া লইয়াছে। এখানে ভাটিয়া আছে, সুরাটি আছে, মাড়োয়ারী আছে, মান্দ্রাজী আছে, বোম্বাই-ওয়ালা আছে, পশ্চিমের লোক আছে, ভোজপুরী আছে, নেপালী আছে,

কটকী আছে, বিহারী আছে, লাক্ষ্ণৌওয়ালা আছে, চীনে আছে, জাপানী আছে, বর্ম্মিজ আছে, তুর্কি আছে, মোগল আছে, ফিরিঙ্গী আছে, ফরাসী আছে, সিলোনিজ আছে, কোরিয়ান আছে, অষ্ট্রেলিয়ান আছে, বেলজিয়ান আছে, জার্ম্মান আছে, জারমলিন আছে, ইউরোপীয় নানা জাতি আছে, ইহুদী আছে, আর্মেনিয়ান আছে, পাঠান আছে, পেশোয়ারী আছে, মার্কিণবাসী আছে, গ্রীক আছে, পর্ত্তুগীজ আছে, নাই কোন্ জাতি? এরা সকলেই নিজের দেশ ছেড়ে এই দেশে এসে, করে খাচ্চে; আর বাঙ্গালী নিজের দেশে, পরদেশীর মুখাপেক্ষী। পাঞ্জাবের আদালতে যাও, দেখিবে পাঞ্জাবী বেশী; মান্দ্রাজে যাও দেখিবে মান্দ্রজী বেশী; বেহারে যাও দেখিবে বেহারী বেশী, মাড়োয়ারে যাও দেখিবে মাড়োয়ারী বেশী। প্রত্যেক দেশেই তাহার ধর্ম্মাধিকরণে অধিকাংশই সেই দেশের লোক, আর বাঙ্গালায়, সাধের কলিকাতায়, চৌদ্দ আনা লোক বিদেশী। কেবল আদালত গৃহ কেন, কলিকাতার সমস্ত জায়গা ও সমস্ত ব্যবসা পরদেশীর অধিকারে। বেণ্টিঙ্কষ্ট্রীট দিয়ে প্রবেশ কর; প্রথমে ইউরোপীয়, তাহার পর চীনে ও তাহার পর পেশোয়ারী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, মান্দ্রাজী, তাহার পর কাবুলী, অপরাপর জাতি। বাঙ্গালী কোথায়? নুতন সেনট্রাল আভিনিউ, সাধের মধ্য রাস্তা, তাহার দুই পার্শ্বেই বড় বড় উচ্চ প্রাসাদশ্রেণী। সেগুলি যাহাদেরই সম্পত্তি হউক, এটা ঠিক, বাঙ্গালীর নয়। কলিকাতার সমস্ত ব্যবসা বিদেশীর হাতে। ব্যবসার মধ্যে কেবল আদালতে কথার ব্যবসা, কতকটা বাঙ্গালীর হাতে; দালালি ও কথার ব্যবসা কিন্তু সেটা বাঙ্গালীর হাতে একেবারেই নয়, সেটা মাড়োয়ারীর হাতে, ভাটিয়ার হাতে, ইংরাজের হাতে অপর সকলেরই হাতে, কিন্তু বাঙ্গালীর হাতে নয়। বাঙ্গালী তুমি নিজ বাটী হইতে বাহির হইলেই দেখিবে

তোমার উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে সকল দিকেই বিদেশী ; স্বজাতীয় মুখ খুব কম দেখিবে। তোমার প্রকৃতি খুব উদার ; তুমি নিজে না খাইয়া বিদেশীকে খাওয়াও, নিজে না পরিয়া বিদেশীকে পরাও, নিজে না শুইয়া বিদেশীকে শোয়াও ; ফলে পূর্ব্ব পুরুষদের বাসস্থান হইতে উচ্ছেদ হইতেছ ; কার্য্যস্থান হইতে বিতাড়িত হইতেছ ; কি বিহার কি অপর প্রদেশে আর একটী এমন প্রদেশ দেখাও যেখানে "নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে" দেশের অধিবাসীকে বিদেশীর ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় ; তোমার উদার প্রকৃতিই তোমার সর্ব্বনাশের মূল হইল। তুমি তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না ; তোমার সব গিয়াছে তুমি এখন বিদেশীর দোকানে ও গদিতে "বাবু" রূপে বিরাজমান। তুমি সামান্য বেতনভোগী, নিজ নসীব বিক্রয়কারী, আয়েসী, অলস, আত্মাভিমান বর্জ্জিত, সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত—বাবু ; তুমি এখন দেশবিহীন, জাতবিহীন, মজ্জাবিহীন, শক্তিবিহীন, ধর্ম্মবিহীন, কর্ম্ম-বিহীন, অভিমান বিহীন, লজ্জাবিহীন, ঘৃণাবিহীন, আত্মমর্য্যাদা বিহীন, বাবু ; তুমি ঘোর লোভী নিজের, একার স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থে কুঠারাঘাত করিতে ক্ষিপ্রহস্ত। তুমি নিজে দুটা পয়সার লোভে, তোমার একটী গরীব বাঙ্গালী ভায়ের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত ; তাহাতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ কর :না, তুমি সামান্য স্বার্থের জন্য বিদেশীকে তোমার ভাইয়ের ঘরের কথা বলিয়া দিয়া, বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বনাশ কর ; তোমার অবিমৃষ্যকারিতার ফলে, তুমি সব হারাইতে বসিয়াছ, তোমার সব যাইতেছে, শীঘ্রই তোমার শেষ হইবে ; এখনও আত্মমর্য্যাদা যদি না জাগিয়া উঠে তোমার জাতির লোপ অনিবার্য্য।

শুধু পুলিশ আদালতের কথা বলি কেন, কলিকাতার ছোট আদালতে দেখিব তাহাই ; হাইকোর্টের (cause list) কজ লিষ্ট দেখিলে

তাহাই বুঝিবে, তুমি তোমার নিজের দেশে, বিদেশী ; তোমরা নিজের দেশী, সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, ক্ষমতায় নগণ্য ; নিজের দেশে যখন তোমার বিকাশ নাই তখন তোমার গতি কি হইবে ? উকীলদের ঘরে যাও সেখানে একটী মেধাবী জ্যোতিষ্মান্ প্রস্ফুটিত প্রফুল্লমুখের স্থানে ২৪টী কোটরগত চক্ষু, স্ফুর্ত্তিবিহীন, শুষ্ক, ফুটিবার মুখে মলিন, চিন্তাজড়িত মুখ দেখিবে। ইহার মধ্যে অনেককেই এত নিশ্চেষ্ট, যেন জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এ কেবল পুলিশ আদালতে নয়, ইহাই ছোট আদালতে, হাইকোর্টে, সর্ব্বত্রই দেখিবে।

১০॥টার পর হাকিম এজলাসে খুব উচ্চ মঞ্চোপরি আসিয়া বসিবেন, তাহার ঠিক সম্মুখে কিঞ্চিৎ নিম্নে পেশকার ও বেঞ্চক্লার্ক ; তাহাদের পদবী শুনিয়া হাসিবেন না, তাঁহারা সামান্য বেতনভোগী কেরাণী হইতে পারেন, কিন্তু ক্ষমতা প্রভূত ; হুসিয়ার হাকিম হইলে অতবেশী না হইতে পারে, কিন্তু পরিশ্রমকাতর আয়েসী হাকিম হইলে এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীর ক্ষমতার সীমা নাই। ইহাদের ক্ষমতা হাকিমের বুদ্ধিমত্তার বিষমানুপাত। যেমন হাকিম খাস কামরা হইতে আদালতে আসিলেন অমনি কনেষ্টবল রূপধারী নকীব ফুকরাইল, "কৈ নালিশওয়ালা হায়, কৈ নালিশওয়ালা হায়, কৈ নালিশওয়ালা হায় ;" কাতারবন্দি দিয়া নালিশওয়ালা দাঁড়াইয়া গেল ; কেহ উৎপীড়িত হইয়া এখানে আসিয়াছে, কেহ নিরীহকে উৎপীড়ন করিতে আসিয়াছে, কেহ প্রাণের আবেগে আসিয়াছে, কেহ অন্য কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে ; কেহ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আসিয়াছে, কেহ অপরের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসিয়াছে ; ইহার মধ্যে কয়জন প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারে, ভগবান আমায় সুবিচার দিন ? অনেকেই চাহেন মামলায় যেন জয়ী হই ; সুবিচার প্রার্থনা করিবার অধিকার ও ক্ষমতা অনেকের নাই ; অনেকে

ব্যবসা হিসাবে এখানে আসিয়াছে প্রপীড়িত হইয়া নয় ; দুর্ব্বলকে উত্ত্যক্ত করিতে এখানে আসিয়াছে, যথার্থ অভিযোগ লইয়া আসে নাই, কাযেই ভগবানের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে না, কেবল আত্মপক্ষ জয় প্রার্থনা করে, অনেক সময়ে সুবিচার পাইতে হইলে ব্যয় সাপেক্ষ। ভাল উকীল চাই, ভাল কৌন্সিল চাই, বুদ্ধিমান নির্ভীক গুছিয়ে রায় লিখিতে সক্ষম বিচারক চাই, আর সাক্ষী আনয়নের খরচা বহন করিবার ক্ষমতা চাই, এতগুলি বিভিন্ন লোকের সহানুভূতি চাই। আজ এই আদালতে হুসিয়ারের বিচার হইবে ; তাহার মনিব করমচাঁদ বাবু আসিয়াছেন ; তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন তাহার জামাতা হরেক চাঁদ, আর আসিয়াছে তাহার দুইজন কলিকাতার বন্ধু। করমচাঁদ বাবু আসিয়া উকীলদিগের পিছনের শ্রেণীর চেয়ারে বসিলেন।

প্রথম দরখাস্তকারিণী একজন বহুবাজার বিলাসিনীরমণী ; ইহার চেহারা দেখিলে দেশীয় রমণী বলিয়া বুঝা যায়। পরিধানে মেমেদের পরিত্যক্ত পোষাক, কথা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী, তাহাতে ইংরাজীর বুখনী আছে ; বোধ হয় এক সময় হিন্দু না হয় মুসলমান ছিল, এখন আলোক প্রাপ্ত হইয়া দিবালোকে, হট্‌হট্ করে বেড়াইতেছে, ধর্ম্মকর্ম্মের ধার বড় একটা ধারে না ; ছোট থাঁদা নাক, সর্ব্বদাই প্রায় সিকেয় উঠে আছে, সদাই সেট্‌কান, লজ্জাসরম হারিয়ে চোখ দুটো খুব ছোট্ট হয়ে গেছে। স্ত্রীলোক হইলেও আওয়াজ পরুষ ও অতিশয় কর্কশ। চাহনীতে সদাই ব্যস্ততা মাখান, চলনে যেন চরকী ঘুরচে, হাত পা যেন কলের পুতুলের ন্যায়, পুরুষকে ধাক্কা দিতে বিশেষ তৎপরা, তবে নামটা বিলাতি। উকীল তাহার দরখাস্ত পেশ করিলে, হাকিম ডাকিলেন Mrs. Richmond ; মিসেস্ রিচমণ্ড্ ক্ষিপ্রবেগে সাক্ষীর কাঠগড়াতে উঠিল, চলন দেখিয়া বুঝা গেল স্থানটা তাহার পূর্ব্বপরিচিত ;

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন Mrs. Richmond আপনার নালিশ ?

মিসেস রিচমণ্ড :—হুজুর মিসেস্ এস্‌চিউ আমাকে গালি দিয়াছে। হুজুর "বদমায়েস", "দুষ্ট" "স্বামী ছাড়া" বলিয়াছে। আমি বিবাহিতা রমণী ; আমাকে গালি দেয় ?

হাকিম :—তোমার স্বামী কোথায় ?

মিসেস রিচমণ্ড :—হুজুর আজ বার বৎসর নিরুদ্দেশ।

হাকিম :—বার বৎসর নিরুদ্দেশ ! তোমার বয়স ত বেশী নয়।

মিসেস রিচমণ্ড :—হুজুর বিবাহের দুই দিন পরেই চলে গেছে।

হাকিম :—আর কিছু বলেছে ?

মিসেস রিচমণ্ড :—হাঁ হুজুর আমি বললাম খবরদার গাল দিও না এ ডিফামেসন্, হামি হাকিমের কাছে নালিশ করব, তাহাতে সে বললে এ, ভি, ভি, সেক্‌সন্ তুই জাহান্নামে যা।

হাকিম :—তারপর ?

মিসেস রিচমণ্ড :—তাহার পর আমি আপনার কাছে এলাম।

হাকিম হুকুম লিখিতে লাগিলেন ফরিয়াদী তখন যুদ্ধ জেতা সেনাপতির ন্যায় বীরদর্পে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে এলেন।

* * * *

তাহার পর অনেকগুলি নানা ধরণের দরখাস্ত হইল, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, চুরি, মারপিট, গালিগালাজ, ভয় দেখান, শান্তিভঙ্গ, নাবালককে ফুস্‌লাইয়া অভিভাবকের কাছ থেকে লইয়া যাওয়া, মাতা কন্যাকে জামাতার বাড়ী পাঠান না, কন্যার পিতা তাহাকে স্বামীর বাটী থেকে লইয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য পিতাকে, অভিভাবকের কাছ থেকে নাবালিকা কন্যা চুরির নালিশ পর্য্যন্ত আছে।

১০নং দরখাস্ত। দরখাস্তকারী যুবক :—আমি আমার শ্বশুর ও শালার নামে দরখাস্ত করিতেছি, তাহারা আমার স্ত্রীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

হাকিম :—তোমার স্ত্রীর বয়স ?

দরখাস্তকারী :—আজ্ঞে ১৫ বৎসর ৯ মাস।

হাকিম :—তোমার শ্বশুর তাহার মেয়েকে চুরি করিল কেমন করিয়া ?

দরখাস্তকারী :—আজ্ঞে বিবাহ হইয়াছে, আজ প্রায় দুই বৎসর; তাহার পর থেকে আমার স্ত্রী আমাদের এখানেই থাকে। আজ ছয় মাস হইল আমার স্ত্রী বাপের বাটী যাইবার জন্য কাঁদাকাটি করে, এমন কি আমার শ্বশুরকে দুই একখানি চিঠিও লেখে; আমার শ্বশুর আমাদের বাটী আসিয়া আমার মাতাঠাকুরাণীকে, আমার স্ত্রীকে তাহাদের বাটী পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন; তাহাতে আমার মাতাঠাকুরাণীও নিমরাজি হন, বলেন, বউমা অনেক দিন এসেছে একবার ঠাঁইনাড়া করে আসুক। সে চলিয়া যাইলে আমার কিন্তু বিশেষ অসুবিধা; আগামী বর্ষে আমার আইন পরীক্ষা; সকালে চা করে দেওয়া, রাত্রে কফি তৈয়ারি করা, পাঠ্য পুস্তকগুলি গোছাইয়া রাখিয়া দেওয়া, দোয়াত কলম কাগজগুলি ঠিক জায়গায় রাখা ইত্যাদি; আমি বিবাহ করিয়াছি নিজের সুখ শান্তির জন্য; শ্বশুরের সুবিধার জন্য নয়, আইনেও এই কথা বলে। আমি দিন কতক আগে ল-রিপোর্ট পড়িয়া জানিলাম আমাদের সুবিজ্ঞ পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ বিচারপতি জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রায় দিয়া গিয়াছেন, হিন্দু বিবাহিতা নাবালিকা স্ত্রীর অভিভাবক তাহার স্বামী, তাহার জন্মদাতা পিতা নয়। আমরা পাঠাইতে রাজি হই নাই, তা সত্বেও গতকল্য দুপুরবেলা তাঁহার

কন্যাকে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র অর্থাৎ আমার শ্যালক, বয়স বার বৎসর সে আমার স্ত্রীর অত্যন্ত নেওটো ছিল; সে তাহার পিতার সঙ্গে আসিয়াছিল, শুনিলাম অনেক দিন দেখে নাই; আসিয়াই বোনের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহাতে আমার স্ত্রীর একগাছা সোণার রুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

উকীল :—হুজুর আমার নালিশ ফৌজদারী আইনের ৩৬৫ ধারা মতে; অন্যায়ভাবে ক্ষতি এ অবস্থায় খাটে কি না সে সম্বন্ধে আমার নিজের সন্দেহ আছে, অতএব সে বিষয়ে আমি দণ্ডবিধি আইনের ৪২৬ বা ৪২৭ ধারা মতে নালিশ করি নাই, কেবল আর্জ্জির বর্ণনা বিধিমতে লিখিয়াছি। আমি ১৭নং কলিকাতা ল-রিপোর্ট বর্ণিত ২৯৮ পাতায় ধরণীধর ঘোষের মামলার ফয়সালার উপর নির্ভর করিতেছি।

একজন উকিল অস্ফুটস্বরে :—দেখা যাইবে বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের যোগ্য জামাতা জজের এ সম্বন্ধে মত কি?

হাকিম :—এ মামলা না করিলে চলিত না?

উকীল :—না হুজুর, মক্কেল আইন শিক্ষার্থী, নিজেই আইনের নূতন অধিকারী, কাযেই অবস্থা প্রলয়ঙ্করী আমার কথা শুনিবে না, আইনমত ফয়সালা চায়।

হাকিম :—শালা, শ্বশুরের বিপক্ষে দণ্ডবিধি আইনের অনুযায়ী ফয়সালা; আচ্ছা তাই হবে বলিয়া হুকুম লিখিতে লাগিলেন।

আর কয়েকখানি দরখাস্ত শুনানী হইল, তাহার পর মুলতুবি দরখাস্তের শুনানী আরম্ভ হইল; ফরিয়াদী জাহ্নবী দেবী দরখাস্তকারিণী সুন্দরভাবে বেশভূষায় বিভূষিতা একজন রমণী, ঐ নামে সাড়া দিল; সে আস্তে আস্তে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার চক্ষু ১৭।১৮ বৎসরের একটি বালিকার উপর; বালিকাটি আদালত গৃহের একপার্শ্বে

দাঁড়াইয়া আছে; ফরিয়াদী রমণীটাকে দেখিলে বোধ হয় অনেক দিন পূর্ব্বে সেও এই অল্পবয়স্ক বালিকাটীর ন্যায় সুন্দরী ছিল, এখন মনাক্কার ন্যায় শরীরের সকল দিক চোপষাইয়া গিয়াছে, বাসি বেগুনের মতন তোবড়াইয়া গিয়াছে। তাহার বেশভূষা দেখিলে মনে হয় সে পোষাক বিক্রেতার দোকানের ছাঁচে গড়া পুতুলের মতন; আকৃতিটী কেবল পোষাকের সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যবহৃত; পোষাকের সৌন্দর্য্যের উপর যত নজর; আকৃতির উপর তত নয়। তাহার চক্ষু দুইটী চারিদিকেই ঘুরিতেছে, মুখে অবসাদের রেখা, অথচ খুব ব্যস্ত ভাব; আওয়াজ স্ত্রীলোকের মত একেবারেই নয়, কর্কশ ও কর্ণকটু, মুখের মাংস কুঞ্চিত হইয়াছে।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন:—যে মেয়েটীর নামে পরোয়ানা দেওয়া হয়েছিল সে হাজির আছে?

একজন উকীল:—হাঁ হুজুর, মুসামত প্রমাদিনী কাহিল হাজির, তিনি এখন আমার মক্কেল মহম্মদ কাহিলের বিবাহিতা পত্নী, এখানে হাজির আছেন, আর আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয়, সেই উদ্দেশ্যে শারীরিক কাহিল থাকিলেও, কাহিল সাহেবও আদালতের মর্য্যাদা রক্ষা হেতু এখানে উপস্থিত আছেন।

হাকিম:—আমি আপাততঃ প্রমাদিনীকে গোটাকতক প্রশ্ন করিতে চাই।

প্রমাদিনীকে ডাক পড়িল, জাহ্নবী দেবীকে নামাইয়া দেওয়া হইল। জাহ্নবী দেবী কাটগড়া হইতে নামিবার সময় ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল, হালা প্রেমাদিনী তোকে এই জন্যই কি পিল পুষে মানুষ করিয়াছিলাম, অনেক কষ্টে এত বড়টা করেছি সে কি এই করতে? তুই আমাকে ধনে প্রাণে মারিলি।

প্রমাদিনীর পক্ষের উকীলবাবু :—হুজুর ফরিয়াদী আমার মক্কেলের সহিত যেন কথা না কয় ; ওকে মিথ্যা শিখাইয়া দিবে ; ফরিয়াদী সব পারে, ও আমার মক্কেলের মাতা নয়, উপমাতা হাঁসপাতাল থেকে ২৫ টাকা ঘুষ দিয়ে নিয়ে আসে, আমার মক্কেল বেশ্যা নয় বা বেশ্যার কন্যাও নয় ; তিনি একজন উচ্চবংশীয় ভদ্রমহোদয়ের কন্যা ; কোন কারণে তার মাতা তাহাকে হাঁসপাতালে প্রসব করিয়া মারা যায়, ফরিয়াদী সেইখান থেকে প্রমাদিনীকে নিয়ে আসে, আর বেশ্যা করিবার চেষ্টা করে। আমার মক্কেল ঘৃণ্যভাবে জীবন যাপন করিতে চায় না, তাই মিঃ কাহিলের সঙ্গে নিজের ইচ্ছায় চলিয়া আসিয়াছে, উদ্দেশ্য ভদ্রমহিলার ন্যায় বিবাহিত জীবন যাপন করিবে। মিঃ কাহিলের উদ্দেশ্য মহৎ, তাই তিনি প্রমাদিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখন পঙ্কতিলক প্রমাদিনীকে এখন তাহার পঙ্কতিলক কাহিল সাহেব পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিয়া কপালে রাখিয়াছেন।

ফরিয়াদীর উকিল :—তাহার উদ্দেশ্য ভাল বলিয়াই বুঝি, গহনাগুলি পর্য্যন্ত যৌতুকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; হুজুর বেশ্যার মেয়ের আবার বিবাহ কি ! উহারা চার পুরুষে বেশ্যা (অবশ্য উহাদের মাতৃগত-কুল) হুজুর বেশ্যার মেয়েকে আবার কে বিবাহ করিবে ? ওদের বিবাহ হয় কেবল পুলিশে তাড়া দিলে।

প্রমাদিনীর উকীল :—হুজুর যে একবার খারাপ হয় সে কি আর ভাল হইতে পারে না ? পতিতা নারীর ভাল হওয়া ত তাহার জন্মগত অধিকার, আর সে যে খারাপ হইয়াছিল তাহাও নিজ দোষে নয়, তাহার উপমাতার পীড়নে ও প্রতারণায়। আজকালকার উন্নতির দিনে যে মহাপুরুষ একটী, দুইটী বা ততোধিক পতিতা রমণীর উদ্ধার করিতে পারিবেন তিনি সমাজের মঙ্গল স্তম্ভ ; তাঁহারাই এখন সমাজকে পতন

হইতে রক্ষা করিবেন। আজকালকার বাঙ্গলার সাহিত্যে দেখিতে পাইবেন যিনি পারাকে মাথায় লেপিতে পারিবেন তিনি ত আদর্শ পুরুষ; বেশ্যার উদ্ধারই মহাজনের প্রকৃত সৎ-সাহসের পরিচয়।

হাকিম:—আমি এখানে ওসব সমাজ নীতির কথা শুনিতে আসি নাই। আমি বালিকাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিতে চাই। অনুগ্রহ করিয়া আপনারা এখন কিছু বলিবেন না।

প্রমাদিনীর প্রতি:—

প্রশ্ন:—তোমার নাম কি?

উত্তর:—প্রমাদিনী।

তোমার বয়স কত?

উনিশ বৎসর।

তোমার বাপের নাম?

আমার বাপ নাই।

জন্মাইবার পূর্ব্বে ত ছিল।

জানি না।

তোমার মায়ের নাম?

জানি না।

ফরিয়াদী তোমার মা নয়?

না সে আমার উপমাতা; বার আনি।

বার আনি কি?

আমাকে দিয়া উপায় করায়, অর্জ্জনের বার আনা সে লয়।

তুমি তার কাছে যেতে চাও?

না।

কোথায় যাবে?

কাহিল সাহেবের কাছে।

কি সর্ত্তে ?

তিনি আমাকে বিবাহ করিতে রাজি আছেন।

এ গহনাগুলি কাহার ?

এ সমস্ত আমার রোজকারের, কিন্তু আমি এ সমস্ত পাপলব্ধ গহনার একখানাও ব্যবহার করিব না। আমি এ পাপের জিনিষ পাপীকেই দিয়া যাইব।

প্রশ্ন :—পাপী কে ?

উত্তর :—আমার উপমাতা, যাহাকে আমি মাতা বলিতাম। জগতে ঘোষণা করিতে চাই, যে আমার বাবু, থুড়ি, সাহেব আমাকে গ্রহণ করিতেছেন, আমার জন্য, আমার গহনার জন্য নয়। আমি গহনাগুলি রাখিলে বাবুর নামে ঘোর কলঙ্ক স্পর্শ করিবে ; এই বলিয়া সে প্রত্যেক গহনাখানি গা হইতে খুলিয়া সামনে উকীলদের টেবিলে রাখিল, আর ফরিয়াদীকে ডাকিয়া বলিল, নে সর্ব্বনাশী এই সব গহনা নে, আমি এক কাপড়ে বাবুর সঙ্গে চলিলাম, যদি বরাতে থাকে সোণার স্যুটের জায়গায়, হীরা জহরতের স্যুট পরিব। কি বলেন কাহিল সাহেব ?

কাহিল সাহেব এতগুলো টাকার গহনাগুলি চলিয়া যায় দেখিয়া একটু কাহিল হইলেন, কিন্তু কি করেন উপায় নাই ; অতএব হাসিয়া বলিলেন, যাক ওসব, আমি আছি।

একজন প্রবীণ উকীল অনুচ্চস্বরে বলিলেন, বাবা এ'ও একটা ছিনালি ; কিছু দিনের জন্য ধাড়ী ছেড়ে, ছানাটা চলে এল, আবার খেয়ে-দেয়ে কিছু দস্তুরমত ঠিক করে নিয়ে, নিজের বাসায় উড়ে যাবে। যেমন ধাড়ী তেমনি ছানা ; যা বেটী যা, কিছু মোটা ধরণের মেরে দিলি ! সাবাস্ কেউটের বাচ্ছা।

হাকিম :—কি সৎসাহস, কি বিশুদ্ধ অনুরাগ, কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা। (ফরিয়াদের উকীলের প্রতি) আমি আপনার মক্কেলের কোন সাহায্য করিতে পারিব না ; বালিকাকে দেখিয়া আমার ধারণা তাহার বয়েস ১৬ বৎসরের অধিক ; অতএব তাহার যেখানে ইচ্ছা সে যাইতে পারে, সে বিষয়ে আমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না। হুকুম শুনিয়া ফরিয়াদী কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, ওরে তোকে মানুষ করিতে ওস্তাদজির মাহিনে হিসাবে আমার দুই হাজার টাকা ধার আছে, সে টাকা কে দেবে রে ?

প্রমাদিনী :—কেঁদনা, এ শুভক্ষণে চক্ষের জল ফেল না। (মিঃ কাহিলের দিকে চাহিয়া) এই ঘুঁটে কুড়ানীর মেয়েটাকে দুই হাজার টাকা দিয়ে দাও, ব্যস। তুই বেটী ঘুঁটে কুড়ানীর মেয়ে, বাবুর কাছে চাহিলেই পাস, শাঁপাশাঁপী কেন ? এ সময়ে কাঁদিস্ নি ; বাবু একে আর এক হাজার টাকা দিয়ে দাও। এই বলিয়া বাবুর কোরিয়ার ব্যাগ খুলিয়া ৩০০০৲ টাকার তিন বাণ্ডিল নোট মায়ের হাতে দিয়া বলিল, দেখিস্ বেটী, আক্‌খুঁটের ঘরের পেত্নী, আমার মেনী বেড়ালটা রহিল, তাহাকে যত্ন করিস্ দুধ ভাত দিস্। চল বাবু এখন নিষ্কণ্টকে তোমার সঙ্গে যাই।

* * * * * *

বাহিরে আসিয়াই স্তাবক নং ১ বলিল, হুজুর লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর মতন শুধু গায়ে বাড়ী নিয়ে যাবেন না। চলুন এইখান থেকেই হ্যামিল্‌টন কোম্পানীর বাড়ী যাওয়া যাক, মা লক্ষ্মীকে সাজিয়ে নিয়ে যান, তবে ঘরে তুলবেন। পূজার আগে ঠাকুর সাজান চাই, আমরা সব চাল-চিত্রের ঠাকুর, আমরা সাজান গুছান ঠাকুর দেখ্‌তে চাই, প্রমাদিনী বিবি কি বল ?

প্রমাদিনী :—আমার আর কি বল ? আমার মানও নাই, ইজ্জতও নাই ; বাবুর হাত ধরেছি, বাবুর যাহা ভাল লাগে তাই করুন। সাজাতে হয় সাজান, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে সাচ্চামতির ব্রত করেছিলাম। আর যাহা কিছু মানায় তাহাও দেবেন, তাহলে আমি আর অন্য বাবুর হাত ধরব না।

স্তাবক নং২। তুমি আজ যা দেখালে তাহাতে আজ থেকে একজন আদর্শ রমণী বাড়িল। স্তবটা ভেঙ্গে গড়তে হবে, সেই স্তবে প্রমাদিনীর নাম থাকবে, এ নিশ্চয় ; আর তোমার জন্য বাবুর নাম, খুড়ি, সাহেবের নাম জগতে বিখ্যাত হবে, প্রমাদিনীর বাবু বলে। ধন্য তুমি প্রমাদিনী আর তা হতে ধন্য তোমার বাবু, ধন্য আদর্শ রমণীর উদ্ধার কর্ত্তা। বাঙ্গলার একদল সাহিত্যিকের খোরাক জুটিল। চল সব হ্যামিল্‌টন কোম্পানীর দোকানে যাওয়া যাক, আজ রাত্রে কি স্ফূর্ত্তি ; প্রমাদিনী আজ অষ্টপ্রহর ব্যাপী নাচ ও গানের ফোয়ারা ছোটাবে।

তখনও দরখাস্ত শুনানী চল্‌ছে, করমচাঁদ বাবু তাহার মামলার শুনানী হইতে কত দেরী কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্‌টরকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছায় কোনটী কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্‌টার একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই লোকটী বলিয়া দিল কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্‌টার তাহার ঘরে আছে। করমচাঁদ বাবু তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিলেন, কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্‌টার বাবু ডায়রীর গাদার মধ্যে বসিয়া আছেন। চারি পার্শ্বে থানার ইন্‌স্‌পেক্‌টার, জমাদার ও মামলার সাক্ষী তাহাকে ঘিরিয়া আছে ; কোর্টবাবু অতি অমায়িক মানুষ, কলকাতার পুলিশ আদালতের অধিকাংশ কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্‌টারই অতি ভদ্র, তাঁহাদের ব্যবহার পুলিশের চাকরী করিয়া যতদূর সম্ভব শিষ্ট ও শান্ত। তিনি মামলার কথা শুনিয়া বলিলেন দেখুন আপনার চাকরের মামলা টিফিনের আগে হবে না। আপনার

চাকর ঘটনার দিনে বেলা সাড়ে আট্‌টা পর্য্যন্ত, আপনার কাছেই কি ছিল, করমচাঁদ বাবু উত্তর করিলেন, হাঁ।

কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্‌টার :—কিন্তু ডায়েরীতে ত আপনার জবানবন্দি নাই।

করমচাঁদ :—কি করিব বলুন ? যখন পুলিশ আমার বাটীতে যান, আমি বাহিরে গিয়াছিলাম, আমার জামাতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি পুলিশ দেখিয়া ভয়ে বলিয়া দিয়াছিলেন আমরা ওসব বিষয় কিছু জানি না ; তাহারা ছেলেমানুষ, কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্‌টার সাহেবের উচিত ছিল আমার সঙ্গে দেখা করা।

কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্‌টার :—দেখুন আপনার উকীলের মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে চাকর বেচারা নির্দ্দোষী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ঘটনা-চক্রগুলি এমনই ভাবে ঘটিয়াছে তাহাতে সত্যই মনে হয়, সে লোকটা দোষী, আর সে একটা বড় বদমায়েসের দলের লোক ; আপনি আজ আর অপেক্ষা করিবেন না। আমি ইন্‌স্‌পেক্‌টারকে ফের কতকগুলি বিষয় তদারক করিতে বলিয়া দিব। এবারে আপনি তাহার কাছে আপনার পুরা এজাহার দিবেন।

করমচাঁদ :—তা মহাশয় আমরা বিদেশী লোক, যদি তারিখ ফেলেন, অল্প ব্যবধানে একটা দিন ফেলিবেন।

কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্‌টার :—তাহাই করিব। আপনি একজন লোক রাখিয়া যান ; আমি তাহাকে দিন বলিয়া দিব আসামী থাক।

করমচাঁদ বাবু :—আচ্ছা আমি তবে অন্য ঘরে আছি টিফিনের পরে খবর লইব। আমার লোকটী অতি বোকা, তাকে ছেড়ে যাব না। সে হয়ত বোকামি করে নিজের ব্যবহারে নিজে বৃথা দোষী হবে ; অতি বোকা শোকা ; কলিকাতায় থাকিবার সে একেবারেই উপযুক্ত নয়।

যাইতে যাইতে করমচাঁদ বাবু দেখিলেন একটী কামরার দরজার উপর লেখা "বেঞ্চ কোর্ট নং ২"। উঁকি মারিয়া দেখেন একজন হাকিম এজলাসে বসিয়া আছেন; বসিবার চেয়ার খানিতে তিলমাত্র স্থান নাই। ভদ্রলোকটী লম্বায় ৬ ফিট্ ৪ ইঞ্চি প্রস্থে ভুঁরি বেড়ে প্রায় চার ফিট্। দেখিতে সুন্দর যুবা পুরুষ। খবর লইয়া জানিলেন তিনি একজন আইন ব্যবসায়ী; প্রাচীন সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশের শিক্ষিত যুবক! সাক্ষীর কাঠগড়ার নিকট একজন স্ত্রীলোক, বেশ মোটা সোটা, বয়সও হয়েছে প্রায় চৌত্রিশ কি পঁইত্রিশ বৎসর, গায়ে কতকগুলি সোণার গহনা, পরণে ভাল হাতী পাড় কালপেড়ে দেশী কাপড়, কপালে সিঁদূরের টিপ, চক্ষু দুইটীতে যেন বিদ্যুৎ খেল্ছে, হাতে পানের ডিবা, তাহার নাম ডাক হইলে সে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিল।

বেঞ্চক্লার্ক বলিলেন পান ফেলে দিয়ে এস, এজলাসে পান চিবাইও না—এই শুনিয়া সৌরভী দেবী (এইটী ফরিয়াদীর নাম) বাহিরে পান ফেলিয়া আসিল, আসিতে আসিতে হাতের পানের রূপার কৌটাটী আর একটী স্ত্রীলোকের হাতে দিল, তাহার নাম বামা বাড়ীওয়ালী। বামা ওজনে প্রায় সাড়ে তিন মণ, খুব বেঁটেও নয়, খুব লম্বাও নয়। বেঁটে না হইলেও এত অধিক মোটা, যে দেখিলে তাহাকে খুব বেঁটে বলিয়া মনে হয়। দেখিলে মনে হয় পূর্ব্ব সময়ে পয়সায় দুটা করিয়া যে আহ্লাদী পুতুল বিক্রয় হইত তাহারই একটা। গায়ে খুব মোটা মোটা গহনা, পায়ে চারি গাছা মল, নাকে খুব ফাঁদাল নথ, তাহাতে খুব বড় নলক ও বড় জুড়ি মুক্তা, গালে একগাল পান, দক্ষিণ হস্তে তর্জ্জনীতে চুণের দাগ, হাতে পানের আর স্ফুর্ত্তির ডিবে। সেটা একবার করে বুকের ভিতরে কাঁচুলির নীচে রাখছে আর একবার করে বার করছে; পরণে চওড়া পেড়ে দেশী শাড়ী; পাছায়

চন্দ্রহার খুব মোটা রকম ; কপালে সিন্দুরের টিপ, দেখিলে মনে হাস্য-রসের উদয় হয়। সে লোকের মুখে হাসির উদ্রেক করে কিন্তু নিজে কখন হাসে না। কর্কশতাই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে। সৌরভী যখন পান ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছে, বামা বাড়ীওয়ালী তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল খুব সাবধান, যেন রূপোর মুখ দেখিয়া সব ভুলে যাস না। রূপোর অভাব কি? এক রূপো যাবে একশ রূপো আস্‌বে, কলিকাতার সহরে অভাব কিসের। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব ; ভদ্র ঘরে সুপুরুষ কুলাঙ্গার এক জায়গায় এতগুলি আর কোথাও নাই। সৌরভী আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইল, তাহার পর আসামীর নাম ডাক হইল, স্বরূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়। একটী ২৩।২৪ বৎসরের ছোকরা এই নামের ডাকে উত্তর দিল। ছেলেটী দেখিতে সুপুরুষ, তবে এর মধ্যেই বদনে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কালিমা পড়িয়াছে, নামে সাড়া দিয়া সে ডকে আসিয়া সিটে হইয়া দাঁড়াইল। ফরিয়াদীর পক্ষে ব্যবহারাজীব একজন সম্প্রতি বিলাত প্রত্যাগত কৌন্সিলী ; তিনি এত জলদ ও দ্রুত, সময় অসময়ে, বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, মনে হইল যেন তাহার টাক্‌রায় তুবড়ী ফুট্‌ছে, পেটের ভেতর থেকে ছুঁচোবাজী বেরুচ্ছে ; তিনি বলিলেন হুজুর এ মোকদ্দমা অতি সঙ্গিন্ ; কলিকাতায় অতি নিরীহ ভালমানুষ রমণীকুলের বাস করা দায় হইয়া উঠিয়াছে, আপনি জানেন কলিকাতায় নিরীহ গরীব আইন পালনকারিণী বারাঙ্গনাদের, আইন ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবক নাই ; তাহাদের পিতা নাই, স্বামী নাই, আত্মীয় বন্ধু নাই ; আসামী যুবককে দেখিলেই বোধ হয় সে অতি ভাল মানুষ, কিন্তু হুজুর জানেন বাহ্যিক চেহারা দেখিয়া মানসিক ভাব নির্ণয় করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ; অনেক সময়ে বাহ্যিক দর্শন লোককে ভুল পথে লইয়া যায়। আপনি সুবিচারক ; আসামীর

ভাল মানুষের মত চেহারা দেখিয়া ভুলিবেন না। বাহ্যিক দর্শনের উপর নির্ভর করিলে অনেক সময়েই ভ্রান্ত হইতে হয়; মনে রাখিবেন সে একজন চরিত্রহীন যুবক।

আসামীর উকীল:—আমি এ কথায় আপত্তি করি।

ফরিয়াদীর উকীল:—হুজুর চরিত্রবান যুবক কবে বেশ্যালয় যায়, অতএব সে যখন বেশ্যালয়ে যায় সে নিশ্চয় চরিত্রহীন।

আসামীর উকীল:—(অস্ফুট স্বরে) তাহলে কলিকাতার অনেক বড় লোকই চরিত্রহীন।

ফরিয়াদীর উকীল:—আমার মক্কেল শান্তিপ্রিয়া অনাথিনী রমণী; যদিও সাধারণে তাহাদের নিজস্ব ভাষায় তাহাকে বারবনিতা বলে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে উচ্চ কুল সম্ভবা ব্রাহ্মণের কন্যা, পুরুষের কুহকে পড়িয়া স্বামী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসে। কিছুদিন পরে পরপুরুষের অকৃতজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া তাহার স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করে এবং সেই ইচ্ছা লোকের কাছে ব্যক্তও করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক সমাজের যে দুরবস্থা ও ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন ভাব, এ অদীনবৎসল, পরদোষ-দর্শী অবস্থায় তাহার স্বামী তাহাকে পুনঃগ্রহণ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকায়, সে তাহার সেই বলবতী ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। তাহার জন্য সে সদাই অনুতপ্তা। আত্মঘাত মহাপাপ, তা না হইলে সেই ধর্ম্মপ্রাণা বালিকা অনেক পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিত। তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই; আজ চারি বৎসর পূর্ব্বে কুক্ষণে এই আসামী যুবক ফরিয়াদীর গৃহে পদার্পণ করে; আমার মক্কেলের গুণে সে তাহার পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া ফরিয়াদীর আশ্রয় লয় ও তাহার গৃহেই বাস করিতে থাকে; বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ স্ফূর্ত্তিতে চারি বৎসর কাল কাটিয়া গেল, মনে রাখিবেন এই যুবা পুরুষ উপায়ক্ষম নয়, পিতামাতা

কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া, তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল, তাহার জীবন মরুভূমে একমাত্র মরুদ্বীপ, আমার মক্কেলের আবাস স্থানে আশ্রয় ভিক্ষা করিল, আমার মক্কেলও সরল বিশ্বাসে নিজ উদারতাগুণে দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন; তাহার পর আজ প্রায় ছয়মাস হইতে তাহার উড়ু উড়ু ভাব লক্ষিত হইল। বলে রাখা উচিত, আসামীর ব্যয়ভার সবই আমার মক্কেল বহন করিতেন। হঠাৎ ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন ফরিয়াদি তাহার ধর্ম্মভ্রাতাকে ফেঁাটা দিতে যান; হুজুর একজন উচ্চ বংশের হিন্দুসন্তান; ফেঁাটা কাহাকে বলে আপনি তাহা ভাল জানেন; এটা হচ্ছে এ ড্রপ অব কাইণ্ডনেস টু এ ব্রাদার (a drop of kindness to a brother)

হাকিম :—আপনি বলিয়া যান ভাইফোঁটা আমি খুব ভালই জানি।

ফরিয়াদীর কৌন্সিলী :—আপনি সবই জানেন, বিচারক রূপে সবই জানেন, কিন্তু জুরিরূপে সব না জানিতে পারেন। আপনি যখন বিচার করিতে বসিয়াছেন তখন আপনি একাধারে হাকিম ও জুরি দুইই। বিলাতে সব বিচারই হাকিম ও জুরির দ্বারা হয়; এখানে সমস্ত নিম্ন আদালতে কেবল হাকিম বিচার করেন, জুরি থাকে না; কিন্তু আইনের চক্ষে আপনি হাকিম ও জুরি দুইই, একাধারে বর্ত্তমান।

হাকিম :—মিঃ —দট্—

ফঃ, কৌ :—হুজুর এক সেকেণ্ড। আমি বঁলিতেছিলাম, আমার মক্কেল ফোঁটা দিতে গিয়াছিলেন। তাহার প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়তম, একটী টিয়া পাখীকে জল ছোলা সব দিয়া একটী দামী দাঁড়ে বসাইয়া রাখিয়া যান; আমার মক্কেল সেটাঁকে আসামীর চেয়েও ভালবাসিত, সে কথা আসামী জানিত। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া সে কি দেখিল মনে করেন; দেখিল আসামী জল ছোলা সমেত দাঁড়টীতে উপবিষ্ট সেই

মনোরম টিয়া পাখীটী লইয়া পলাইতেছে, আমার মক্কেলকে দেখিয়াই টিয়াটী চেঁচাইতে স্বুরু করিল, আমার মক্কেল চেঁচাইল, ওগো আমার টিয়া পাখী মায় জল ছোলা দাঁড় লইয়া রূপো পলাইতেছে; এর প্রমাণ অনেক আছে অনেক সাক্ষী আছে। যাহারা তাহার কাতরধ্বনি শুনিয়াছে, খুব দৌড়াইয়া পলাইতেছিল বলিয়া সাক্ষীরা আসামীকে সনাক্ত করিতে পারিবে না। যাহা হউক বাড়ীওয়ালী তাহার করুণ ক্রন্দন শুনিয়া সেই স্থানে আকৃষ্ট হন, এবং সে দাঁড়টী তুলিয়া লয়েন। আসামী তাড়া খাইয়া প্রথমে পাখীটী উড়াইয়া দেয়, তাহার পর দাঁড় ফেলিয়া দিয়া পলায়, বাড়ীওয়ালী দাঁড়টী তুলিয়া লয়েন, আর পাখীটী উড়িয়া আসিয়া তাহার নিজস্থানে বারান্দার রেলিংএ আসিয়া বসে। সেই দিন থেকে আসামী পলাতক ফরিয়াদী প্রায় এক সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করেন, যদি আসামী তাহার এই দুর্ব্যবহারের কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে, তা চোরের আবার কি কৈফিয়ৎ হইতে পারে? কাযেই সে কৈফিয়ৎ দিতে আসে নাই, তখন বাধ্য হইয়া ফরিয়াদী আদালতের আশ্রয় লইয়াছে, আসামীর বিরুদ্ধে তাহার নালিশ, গৃহ হইতে চুরি দণ্ডবিধি আইনের ৩৮০ ধারা, জল ও ছোলা নষ্ট করার দরুণ ও জানিয়া তছরুপাত দণ্ডবিধি আইনের ৪২৬ ধারা; আমার মক্কেলের দারুণ মনঃকষ্ট হইয়াছিল, তাহার দরুণ তিনি দেওয়ানীতে আলাহিদা খেসারতের নালিশ করিবেন; হুজুর দিনের বেলায় চুরি, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে; এ একরকম অরাজকতা; আমার মক্কেল একেবারেই আপনার আদালতে আসিয়া নালিশ করিয়াছে, সে পুলিশে নালিশ করিতে যায় নাই, কারণ পুলিশের উপর তাহার বিশ্বাস কম।

হাকিম:—তা বেশ; তবে আপনার মক্কেল হৃত দ্রব্যগুলি সব ফিরিয়া পাইয়াছেন।

ফঃ কৌ ঃ—হাঁ হুজুর সে ঠিক সময়ে এসে পড়ায় আর পাখীটা পোষা থাকায় তাহার দাঁড় ও পাখী দুইই পাইয়াছে, তবে জল ও ছোলা পড়িয়া যায়, তাহা সে পায় নাই।

হাকিম ঃ—কিহে বাপু, তুমি দেখ্‌ছি ব্রাহ্মণের ছেলে, বয়স অল্প, তোমার একি নীচ প্রবৃত্তি ? তোমার কি বলবার আছে ?

ফঃ কৌ ঃ—হুজুর এ ওয়ারেণ্ট কেস, সাক্ষ্য না শুনিয়া চার্য্য না করিয়া আসামীর কৈফিয়ৎ চাহিতেছেন ? একি আইন সঙ্গত ?

হাকিম ঃ—মিঃ দট্ট, আমি ত সাক্ষ্য না শুনিয়াই মামলার ফয়সালা করিতেছি না, রায় দিতেছি না। আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার সাজা হইবে।

ফঃ কৌ ঃ—হুজুর আমার মক্কেল তাহাই চায়।

হাকিম ঃ—(আসামীর প্রতি) তোমার নামে চুরির নালিশ তা জান ?

আসামী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল হুজুর আমি চোর নই, আমি বাপ মায়ের অবাধ্য ছেলে। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু লেখাপড়া শিখি নাই, ধর্ম্মকর্ম্ম শিখি নাই। অল্প বয়সে কুসঙ্গে পড়িয়া বামা বাড়ী-ওয়ালীর বাটীতে আসিয়া জুটি ; মাতাপিতার কুলে কলঙ্ক দিয়া তাহা-দিগকে কাঁদাইয়া আমি এর (সৌরভীকে দেখাইয়া) কুহকে পড়ি। চারি বৎসর কাল বিকারের রোগীর মতন অজ্ঞানে, অর্দ্ধজ্ঞানে, বেঘোরে কাটিয়া গেল ; শেষে সতীলক্ষ্মী আমার ভ্রাতৃজায়া আমাকে সৎপরামর্শ দিয়া অনেক বুঝাইয়া পাড়াইয়া এর সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলেন। তিনি আমার মাতাপিতাকে রাজি করাইয়া ২৪শে ফাল্গুন আমার বিবাহ দিন স্থির করেন ; শ্রীযুক্ত রামশরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যাদায়ে পীড়িত, তিনি আমাকে কন্যা দিতে রাজি হয়েন ; আমিও আত্মীয়দের পরামর্শে সে কাজে রাজি হই। দশ বার দিন এর বাটীতে যাই নাই, লোকের উপর

লোক পাঠায়, তাহার পর বাড়ীওয়ালী আমায় অনেকবার রাস্তায় ধরে ও জোর করিয়া তাহার বাটী লইয়া যাইতে চায়; এইরূপ অবস্থায় একদিন আমি চেঁচামেচি করি; তখন সে পাখী চোর, পাখী চোর বলিয়া চেঁচাইয়া আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়; আমি তখনকার মত তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম; কিন্তু বিবাহের দিন বেলা ২টার সময় এ আর ঐ বাড়ীওয়ালী (সে আদালতে উপস্থিত আছে তাহাকে আমি দেখিয়াছি) পুলিশ লইয়া আমাদের বাটীতে আসে, হাতে সূতা বাঁধা অবস্থায়, আমাকে গ্রেপ্তার করে; ওয়ারেণ্ট খানাতে জামীনের ব্যবস্থা ছিল না; কাযেই হাজতে লইয়া যায়, শেষে আমার আত্মীয়েরা উকীল বাবুকে সঙ্গে করিয়া হাকিমের বাটীতে গিয়া, জামীন করিয়া লইয়া আসেন, আর সেই রাত্রেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; হুজুর আমাকে মারুন, কাটুন, জেল দিন, ফাঁসি পর্য্যন্ত দিন, আমি আর ওর কাছে ফিরিয়া যাইব না; এই বলিয়া আসামী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল; আর কান, নাক মলিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, দোহাই হুজুর, আমাকে রক্ষা করুন।

হাকিম :—দেখুন মিঃ দট্, আসামী যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, যখন আমি বিচার শেষ করিব তখন বলিব আমার মতে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কিন্তু বিচারের পূর্ব্বে যতদূর বুঝিতে পারিলাম তাহাতে এই ফরিয়াদীর কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, সে দাঁড় ফিরিয়া পাইয়াছে, পাখীও ফিরিয়া পাইয়াছে, ক্ষতির মধ্যে ছোলা আর জল, সে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়; বিশেষ যখন দুই পক্ষই স্বীকার করিতেছে, তাহারা চারি বৎসর কাল একত্রে কাটাইয়াছে; এখন আসামী বিবাহ করিয়াছে অতএব কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে না যে আসামী ফরিয়াদী আর একত্রে থাকে। অতএব এ মামলা চালাইয়া লাভ কি?

ফঃ কৌ ঃ—হুজুর সত্যের খাতিরে, নীতিবুদ্ধির মর্য্যাদা হেতু, নীতি-জ্ঞানের সম্মানার্থে, আমার মক্কেল এ মামলা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক ধর্ম্মেই বলে, চোরের সাজা হওয়া উচিত; আমার মক্কেল লাভালাভ বোঝেন না, লাভের জন্য সে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। দুষ্টের দমনের জন্য এখানে আসিয়াছে, আপনি বিচার করুন আমার সাক্ষী আছে। আপনি বিচার করিলে সাক্ষীর জোরে আমি এই মামলায় নিশ্চয় জিতিব।

হাকিম ঃ—তবে তাহাই হউক। মামলা চলিতে লাগিল, বিচার-গৃহ লোকে লোকারণ্য; ফরিয়াদীর জবানবন্দি শেষ হইলে আসামীর উকীল তাহাকে জেরা করিতে অভিমত প্রকাশ করিলেন। হাকিম তাহাকে জেরা করিতে অনুমতি দিলেন ঃ—

ফঃ কৌ ঃ—হুজুর ডবল জেরার কি প্রয়োজন? চার্য্য হইলে জেরা করিলে চলিত।

আঃ উ ঃ—হুজুর আমি এ মামলা লম্বা করিতে চাহি না, সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে জেরা করিব।

ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষ দিল।

১ম ফরিয়াদী। ২য় বামা বাড়ীওয়ালী। বামার পরে বাটীর দুইজন ভাড়াটীয়া, তাহার বাটীর ভাড়াটীয়াদের তিনজন বাবু আর পার্শ্বের চাটের দোকানের একজন দোকানদার।

সব সাক্ষীর এজাহারের ও জেরার পর হাকিম ফরিয়াদীর কৌন্সিলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন চার্য্য ফ্রেমের সম্বন্ধে আপনার কি বলিবার আছে?

ফরিয়াদী কৌন্সিলি একটা লম্বা চওড়া, এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিলেন; মোটের উপর শব্দালঙ্কারের আড়ম্বর বাদ দিলে, এই বুঝা

যায় তাহার মক্কেল, দুষ্টজন প্রপীড়িতা, বিচারপ্রার্থী ; আসামীকে সাজা দিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

আসামীর উকীল :—হুজুর চার্য্য কেন হইবে না, সেই সম্বন্ধে আমি দুই এক কথা বলিতে চাই।

হাকিম :—বলুন।

আঃ উ :—হুজুর মোটের উপর সংক্ষেপে বলিতে গেলে মামলাটী এই, ফরিয়াদীর পাখী চুরি গিয়াছে, দাঁড় চুরি গিয়াছে, দানাপানি গিয়াছে। দাঁড় ফিরিয়া পাইয়াছে, পাখী ফিরিয়া আসিয়াছে, আর দানাপানির কথা, তাহা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অভাব হইতে পারে ; ভদ্র রমণীর কম হইতে পারে ; কিন্তু কলিকাতা সহরে ফরিয়াদী শ্রেণীর স্ত্রীলোকের তাহা কখন অপ্রচুর হইবে না ; তবে কথা হচ্চে, আমার মক্কেল-রূপ পাখীটী শিকল কাটিয়াছে ; নূতন দাঁড়ে বসিয়াছে ; সে পাখীটী আর ফিরিয়া আসিতেছে না ; ফরিয়াদী যতই চেষ্টা করুন না কেন, সে পাখীটা আর ফিরিয়া পাইবে না।

আদালতে হাসির রোল পড়িয়া গেল। সকলেই হাসিল, কিন্তু হরেক চাঁদের (যে তাহার শ্বশুরের সঙ্গে আসিয়াছিল) চক্ষু দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। আর রামবাবু, যে হরেকচাঁদের অলক্ষ্যে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আসামীর উকীল আরও বক্তৃতা করিলেন ; তিনি বলিলেন বাদী ও তাহার সাক্ষীরা ফরিয়াদীর নিজের দলের লোক ; তাহারা তাহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছে। তাহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহাদের জেরাতে স্পষ্ট বুঝা যায় তাহারা মিথ্যা বলিতেছে।

ফঃ কৌ :—আমি এ কথায় বিশেষ আপত্তি করি, এ কথার প্রতিবাদ করি. ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষীরা হলপান জবানবন্দিতে এজাহার

দিয়াছে তাহারা মিথ্যা বলিতে পারে না ; মিথ্যা বলিলে তাহাদের মিথ্যা সাক্ষ্যের সাজা হইতে পারে। আসামী শুধু মুখের কথা বলিয়া গিয়াছে সে ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত হলপ্ নেয় নাই। তাহার কথার দাম কি ?

আঃ উ ঃ—আপনি বলিতে চান যদি চারিজন অন্ধ আসিয়া হাকিমকে বলে সূর্য্যদেব নাই, তাহা তিনি বিশ্বাস করিবেন ?

ফঃ কৌ ঃ—আমার সাক্ষীরা ত আর অন্ধ নয়।

আঃ উ ঃ—তাহারা স্বার্থান্ধ, যাক আমাকে বাধা দিবেন না; আমাকে বলিতে দিন। সাক্ষিদের জবানবন্দি হইতে বুঝা যায় তাহাদের এজাহারে আভ্যন্তরিক মিথ্যাবাদের চিহ্ন রহিয়াছে।

এইভাবে তিনিও একটী বক্তৃতা করিলেন তাহাতে শব্দাড়ম্বর কম, অলঙ্কারের আড়ম্বর নাই। সারগর্ভ যুক্তি আছে।

যাহা হউক দু'পক্ষের বক্তৃতা শেষ হইলে, হাকিম আসামীকে খালাস দিলেন ; আর হায়রান করিবার অভিপ্রায়ে আসামীর উপর মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের কারণে, ফরিয়াদীর কেন সাজা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইতে বলিলেন। তাহার পর কৌন্সিলির আর একটী লম্বা চওড়া বক্তৃতা শুনিয়া হুকুম দিলেন, ফরিয়াদীর ৫০৲ টাকা জরিমানা, না দিলে দুই মাস বিনা পরিশ্রমে হাজত ; আর টাকা আদায় হইলে আসামী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সেই সমস্ত টাকা পাইবে। তাহার পর আসামীর দিকে চাহিয়া বলিয়া দিলেন, খবরদার এমন কোন কাজ করিও না, যাহাতে আবার এইরূপ বিপদে পড়।

আসামী ঃ—হুজুর, নাকে কানে খৎ, আর এমন গুখুরি কার্য্য কখন করিব না ; শুধু আমি কেন আমার পরম শত্রুও যেন এরূপ কার্য্য না করে। বেশ্যালয়ে যাওয়া আর নিজেকে সয়তানের হাতে তুলে দেওয়া দুই সমান।

ফরিয়াদী বাহিরে আসিয়াই বাড়ীওয়ালীর কাছ থেকে পানের ডিবে লইয়া, মোটা করে সুরতি দিয়া দুটা পান মুখে দিল; আর বলিল, যা বেটা বেচে গেলি, তুই বেটা গেলি, বয়ে গেল, তোর মতন কত বেটা আমার জন্য পাগল। আমরা কি ভদ্রঘরের বউ, যে একজনের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দিব; আজই রাত্রে দু'পাত্র টেনে তোকে ভুলে যাব।

বামা বাড়ীওয়ালী :—আয়লো, আয়, আর চেঁচাতে হবে না। তা যা বল যা কহ সৌরভি, হাকিমটা দেখ্‌তে ভুঁদো খুব মোটা, কিন্তু বুদ্ধি আছে। প্রত্যেক সাক্ষীই এসে ঠিক বল্‌তে লাগ্‌ল, আমরাও সব ঠিক বলেছিলুম; তবে হাকিমটা বুঝতে পারলে না, বিশ্বাসও করলে না, ফল ভালই হইয়াছে, ভদ্রলোকের ছেলেটা বেঁচে গেছে। হাজার হউক এখনও দিন-রাত হচ্ছে, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে। মিথ্যায় আর কতটা হবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেশন

এ স্থানটী সর্ব্বদাই নূতন। যতবার এখানে আইস, ততবারই ইহা অপরূপ ও মনোমুগ্ধকর। এখানে আসিলেই মন নাচিয়া উঠে, অবশ্য নিত্য চরণচারীর পক্ষে নয়। এখানে সর্ব্বদাই ব্যস্ততা; চব্বিশ ঘণ্টাই মানুষ উদ্‌গ্রীব; দৌড় দৌড় কেবল দৌড়; থামিবার সময় নাই, হাসিবার সময় নাই। কত রকমের লোক, কত বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, কত বিভিন্ন দেশীয়, কত বিভিন্ন পোষাক পরিচ্ছদ। আমাদের ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালী স্বভাবতঃ আয়েসী, শীঘ্র কোন বিষয়ে চাগে না; আমাদের দেশে সময়, প্রহর দ্বারা বিভক্ত, সকল সময়েই আমরা ধীরে-সুস্থে কাজ করিতে ভালবাসি, এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টা সময় আমাদের ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না; সওয়ায় সন্ধিক্ষণের পূজা। আমরা আধ্যাত্মিক জাতি; পূর্ব্বে জড় বিষয়ে আমাদের আস্থা ছিল না, কাযেই তাড়াতাড়ি কোন কাজ করিবার আবশ্যক হয় নাই; ঠিক সময়ে কোন কাজ করিবার প্রয়োজন পূর্ব্বে কখন উপলব্ধি করে নাই। আর এখন যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারিলে মহাবিপদ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কার্য্য করিবার জন্য যে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ মনোযোগের আবশ্যক রেল-যানে ভ্রমণ তাহার মধ্যে প্রধানতম। সময়ে আইস স্থান পাইবে, না আইস, সে তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে না। আগে প্রচলিত কথা ছিল "সময় আর জুয়ার ভাঁটা কখন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না" প্রতীচ্যে এই কথা; মরণ কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, প্রাচ্যে এই কথা প্রচলিত; জীবিত অবস্থায় বিলম্বে

কিছু আসে যায় না। এখন কিন্তু দেরী হইলে পদে পদে বিপদ, বিশেষতঃ ষ্টেশনে; তুমি দেখিতে পাইতেছ গাড়ী ছাড়িতেছে, তুমি ৫০ হাত তফাতে; তোমাকে তোমার সময় অবহেলার জন্য, 'বস্ বস্' শব্দে তিরস্কার করিতে করিতে রেলযান চলিয়া গেল; বলিয়া গেল দেরী করিয়া আসিয়াছ, তোমার ব্যবস্থা পরে হবে, এখন নয়।

আমাদের কর্ম্ম-বাটীতে নিমন্ত্রণ হইলে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ হয় অর্থাৎ সকলে আসিয়া জুটিলে পাত পড়িবে, সকলে না জুটিলে অপেক্ষা করিতে হইবে; পল্লীগ্রামে সকলে সমবেত হইবার পূর্ব্বে, যদি তুমি কতক গুলি লোককে পরিবেশন কর, তাহা হইলে যাহারা দেরী করিয়া আসিলেন তাহাদিগের অবমাননা করা হইল; অতএব সমাজ তোমাকে তাহা করিতে দিবে না; যে দেরী করিয়া সময়ের অবমাননা করিবে, তোমাকে তাহার মান রাখিতে হইবে। আর প্রতীচ্য নিমন্ত্রণে আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট; সময়ে এস একত্রে বসিবে, না হয় তোমার আসিবার প্রয়োজন নাই; এই যে সময়ের সম্মান, ইহা অধুনা আমরা প্রতীচ্যের নিকট শিখিয়াছি। প্রতীচ্যেরা নানা উপায়ে আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের সম্মান শিখাইয়াছেন। তাহার মধ্যে রেলযাত্রা সর্ব্ব প্রধান। রেল ষ্টেশনে পহুঁছিলে দেখিবে সকলেই তৎপর; কেহই শনৈঃ, শনৈঃ চলিতেছে না, দেখিলেই বোধ হয় এ স্থানটী ব্যস্ততার প্রতিমূর্ত্তি। ছোট্ ছোট্ ছোট্, এই বাক্য, সকলকার চলনে, সকলকার বদনে, সকলকার প্রকরণে। এখানে দুই প্রকার দলের লোক দেখা যায়। একদল আনন্দে উৎফুল্ল, আর একদল শোকে, ভাবনায়, তাড়নায় অবসন্ন, কাহারও মুখে হাসির ফোয়ারা, আর কাহার মুখে অবসাদের রেখা, অথচ এই সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাত্মক দুই দলই এক গাড়ীতে চড়িতেছে, চলিতেছে; এক পক্ষ অপর পক্ষকে সহ্য করিতেছে। মানুষ যখন দুষ্ট ভাবাপন্ন হয়, তখন এক ভাই অপর ভাইকে এক বাসস্থানে সহ্য করিতে

পারে না, কিন্তু এখানে দুই পরম শত্রুও এক গাড়ীতে চলিতেছে ; সাধু ও তস্কর, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, দেবতা ও দানব, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক গাড়ীতে যাইতেছে। রেলগাড়ীতে পয়সা ফেলিলে চড়িবার মানুষ মাত্রেরই জন্মগত অধিকার, মানুষ হইলেই তাহার সে অধিকার আছে ; মানুষকে শিখাইতেছে যে প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত অধিকার সমান। মানুষের তৈয়ারি যে ব্যবধান, তাহা মনুষ্যের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় ; একজন মানুষ আর একজনকে স্পর্শ করিলে সে অপবিত্র হইবে, ইহা মানুষের অতিশয় সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক, নীচতা ব্যঞ্জক, তোমার মন এত ক্ষুদ্র ও তুমি এতদুর স্বার্থপর যে, যাহা স্ব ইচ্ছায় করিবেনা, বাধ্য হইলে তুমি তাহা করিবে, রেলে গমন ও বিদ্যালয়ে একত্রে পাঠ এই নীচ প্রাণহীন সঙ্কীর্ণতার কবরের ঘণ্টা বাজাইতেছে। বাজাইয়া বলিতেছে, তোমরা সকলে আইস, তুমি ব্রাহ্মণ হও, চণ্ডাল হও, ধার্ম্মিক হও, বা শঠ্ হও, সৎ হও বা অসৎ হও, আমি তোমাদের সকলকেই অভীষ্ট স্থানে লইয়া যাইব ? সে বিষয়ে কোন পার্থক্য করিব না ; তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, সকলেরই অভীষ্ট স্থানে যাইবার সমান অধিকার।

হরেক চাঁদ আজ হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়াছে, তাহার মনের অবস্থা বড় ভাল নয় ; যখন কোন লোক এক নিশ্চিত পথ হইতে, অন্য এক অনিশ্চিত কোন পথে যাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার মনের অবস্থা যেরূপ হয়, হরেক চাঁদের মনের অবস্থা আজ সেইরূপ ; আজ তিন দিন হইল হুসিয়ারের মোকদ্দমা শেষ হইয়া গিয়াছে, হাকিম এক করমচাঁদের এজাহারের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন। রায়ে লিখিয়াছেন হুসিয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ তাহাদের কর্ত্তব্য পালনই করিয়াছে, তবে করমচাঁদের এজাহার বিশ্বাস করিতে হইলে হুসিয়ারকে সাজা দেওয়া যায় না, সেই জন্য আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে

তাঁহার সন্দেহ হওয়ায় তিনি আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছেন। করমচাঁদ তাঁহার ভৃত্য হুসিয়ারকে লইয়া এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইতেছেন; হরেক-চাঁদের পিতা করমচাঁদের সহিত চার পাঁচ দিন পরামর্শের পর তীর্থ ভ্রমণে যাইতে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন। হরেকচাঁদের মাতা তারাবাইও স্বামীর সহিত যাইবেন।

তীর্থ যাত্রা হেতু বাড়ী ত্যাগের পূর্ব্বে ভৈরবচাঁদ তাহার পুত্র হরেক-চাঁদকে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা হরেকচাঁদ, আমার পিতার মৃত্যুর পর হইতে এই শেঠ বংশের গুরুভার, এই পুরাতন বংশের মান, মর্য্যাদা, ও সুনাম রক্ষা করিবার গুরুভার, আমি এতদিন বহন করিয়া আসিয়াছিলাম; পিতার মৃত্যুর পর হইতে কেন, পিতার জীবদ্দশায় তাহার মৃত্যুর আট দশ বষ পূর্ব্ব হইতেই এই ভার বহন করিতেছিলাম। পরকালের সম্বল ত কিছু করিতে হইবে, আমি কিছু দিনের জন্য তীর্থ যাত্রায় গমন করিতেছি। আমার দায়িত্ব, ও গুরুভার তোমার উপর ন্যস্ত করিয়া যাইতেছি। একবার ফিরিয়া আসিব নিশ্চয়, তবে ফিরিয়া আসিয়া এখানে বসবাস করিব কিনা, তাহা তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। দেখ তীর্থ-ভ্রমণ ভাল; কিন্তু সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণে উপযুক্ত না হইতে পারিলে সংসারীর পক্ষে তাহা কোন মতেই মঙ্গলপ্রদ নহে। ভগবান তোমাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন কর্ম্ম করিবার জন্য, কর্ম্ম অবহেলার জন্য নহে। তুমি সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, আর পরীক্ষা হেতু যাই তোমার উপর চাপ পড়িল, অমনি রণে ভঙ্গ দিয়া সন্ন্যাসের ভাণ করিয়া সংসার ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে, তাহাতে তোমার পৌরুষ বাড়িল না; তুমি কাপুরুষের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে; মানুষের প্রধান ধর্ম্ম, কর্ম্ম; ভগবান স্বয়ং কর্ম্মের উৎকর্ষতা বিষয়ে অভয়বাক্যে বলিয়াছেন, কর্ম্ম প্রথম, কর্ম্ম দ্বিতীয়, কর্ম্ম সর্ব্ব সময়ে, তবে সে কর্ম্ম, ধর্ম্মের সহায়তার

জন্য হওয়া চাই। আমি অল্প কালের জন্য তোমার কাছ হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাহা কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নহে। তোমার চরিত্র ও কার্য্যকলাপ কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খল; সে বিষয়ে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করিয়াছি, বিশেষ কোন ফল হয় নাই, সে কথা যাক্; সে আমার নিজের দুর্ভাগ্য; আর ভাগ্যের উপরই বোঝা চাপাই কেন? সে আমার নিজের কর্ম্মফল। যাইবার পূর্ব্বে আর একবার তোমাকে বলিয়া যাইতেছি, সতর্ক করিয়া দিতেছি; দেখ অন্যের উপর রাগ করিবার হেতু অধম, অসার, মনোবৃত্তি মনুষ্যমাত্রেই আছে, তোমার উপর রাগ করিতে হইলে রাগ জনিত যে কষ্ট তাহা আমারই হইবেই, অধিকন্তু দুঃখ জনিত যে কষ্ট তাহাও আমার হইবে; তোমার উপর রাগ করিতে হইলে আমার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে; অতএব তোমার উপর রাগ করিতে আমার সহজে প্রবৃত্তি হয় না; যাহা হউক এখনও সময় আছে, বিশেষ দেরী হয় নাই, শোধরাইবার আবার সময় অসময় কোথা? কালাকাল নাই। তুমি আমার অনুপস্থিতে মাসিক পাঁচশত টাকা করিয়া মাসহারা স্বরূপ পাইবে, তাহাতেই সংসার চালাইও আমার জন্য আমি টাকার অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছি, সে বিষয়ে তোমাকে কোন কষ্ট করিতে হইবে না। তোমার মাতা আমার সঙ্গেই থাকিবেন। চিরঞ্জিলাল বেতনভোগী ভৃত্য হইলেও সে আমাদের বংশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; সে ভৃত্য নয় সে আমাদের মিত্র; সেও তোমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত; আমার সহিত যাইতে চাহিয়াছিল; তাহাকেও তোমার কাছ হইতে লইয়া গেলে তোমার প্রতি গুরুতর সাজা দেওয়া হয়; তাই তাহাকে রাখিয়া যাইতেছি; যতদূর সম্ভব তাহার মান মর্য্যাদা রক্ষা করিও, শুভাকাঙ্ক্ষীর মর্য্যাদা রক্ষা করা প্রধান ধর্ম্ম; পারতপক্ষে সে কর্ত্তব্য পালন করিও; আর একটী কথা; দেখ বিদেশীরা, যাহারা আমাদিগের

সমাজ প্রণালীর আভ্যন্তরিক গঠনের কথা জানে না তাহারাই ভ্রম পড়ে, ভাবে হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের মান মর্য্যাদা রক্ষা হয় না; কিন্তু ইহাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক ধারণ আর হইতে পারে না। প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইতেছেন সেই গৃহের রমণী। যে নরাধম পরিণীতা রমণীর সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না, সে পুরুষ নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তুমি যাহাই হও; আমার বধূমাতা পেয়ারীবাই আমাদের গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী; যদি লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইতে না চাও, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না; মনে থাকে তোমার বিবাহিতা রমণী প্রাণহীনা পুত্তলিকা নহেন। শৈশবে পুতুল. লইয়া ক্রীড়ার সময় যেমন ভাল কাপড় চোপড় পরাইয়া ও ভাল বাক্সে শোয়াইয়া সুখী হইতে, আর মনে করিতে তাহাকেও সুখী করিলে, পতিপ্রাণা সতী স্ত্রীকে সেরূপ করিলে চলিবে না; কেবল আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করা হইল না, প্রাণ খুলিয়া তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে, তাহাকে উপযুক্ত সম্মান করিতে হইবে; তাহাকে ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় ব্যবহার করিলে চলিবে না, তাহাকে ধর্ম্মপরিণীতা অর্দ্ধাঙ্গিনীর ন্যায়, সহধর্ম্মিণীর ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে; মনে থাকে তাহারও আত্মমর্য্যাদা আছে ও আত্মসম্মান আছে, তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তোমার সহধর্ম্মিণী জানিয়া তাহার সেই আত্মমর্য্যাদা আত্মসম্মান সর্ব্বদা অটুট রাখিবে; মনে থাকে তিনি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী তিনি তোমার সহধর্ম্মিণী, তিনি তোমার ক্রীড়া পুত্তলিকা নহে; পারতপক্ষে তাহার অসম্মান করিও না; সকলের প্রতি ভাল ব্যবহার করিবে; বন্ধুবান্ধব দাসদাসী লোকজন সকলেরই প্রাণ আছে সকলেরই শরীর তোমার ন্যায় রক্তমাংসে গঠিত, সকলেই প্রাণযুক্ত; তোমাকে কেহ দুর্ব্ব্যবহার করিলে তুমি যেমন প্রাণে ব্যথা পাও, মনে থাকে, সেইরূপ

জীবমাত্রই তোমার ন্যায় সমান উপাদানে গঠিত ; তাহারাও তোমার প্রাণহীন ব্যবহারে কষ্ট পাইবে ; তোমার সদ্ব্যবহারে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, অন্যথা হইলে অভিশাপ দিবে ; মানুষের ব্যাকুল প্রার্থনাও ঐকান্তিক কামনা ভগবানও শ্রবণ করেন। দেখ ধর্ম্ম বিষয় আমি বিশেষ কিছু জানি না, ধর্ম্মকথা বিশেষ বুঝি না, তবে যতটুকু বুঝি, পরের মনে কখনও কষ্ট দিবে না ; কারণ প্রত্যেক লোকই ভগবানের অংশ ; মিথ্যা কথা বলিবে না, কখন কোন অবস্থায় নয়। মিথ্যাবাদ করিলে স্বীকার করা হয়, সত্য বলিয়া জীবন যাপন করিতে তুমি সক্ষম নহ, সর্ব্বদা মনে রাখিবে, উপরে তোমার একজন প্রভু তোমার সকল কার্য্য ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিতেছেন ; যতদূর সম্ভব পরের উপকার করিবে, আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। এই বলিয়া ভৈরবচাঁদ পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়াছেন।

এলাহাবাদ পর্য্যন্ত দুই বৈবাহিকে একসঙ্গে একত্রে যাইবেন, তাহার পর ত্রিরাত্র সেখানে বাস করিয়া আরও পশ্চিমে তীর্থযাত্রা করিবেন ; বয়স্থ চিরঞ্জিলাল ষ্টেশনে এক মহা হৈ চৈ করিয়া তুলিল ; এত বয়স হইলেও তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে প্রবল বেগে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ; তাহার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া গেল ; সে কেবল কাঁদিতে লাগিল। অশ্রুধারা অনেক সময় অতিশয় সংক্রামক, তাহার চক্ষের জল দেখিয়া হরেকচাঁদও নিজের চক্ষের জলের গতি রোধ করিতে পারিলেন না, তবে প্রত্যেকেরই তাহার নিজের নিজ স্বত্ব আর মৌলিকত্ব আছে সেইরূপ এদের দুজনকার অশ্রুধারারও পার্থক্য ছিল ; চিরঞ্জিলাল ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল ; আর ভৈরবচাঁদের কান্না কিঞ্চিৎ চাপা ; তবে উভয়ের ক্রন্দনই গভীর মনোবেদনা ব্যঞ্জক, মায়া কান্না নহে। চিরঞ্জিলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, চাঁদজি কোন অপরাধে আমাকে মিয়াদের পরও এখানে

রাখিয়া যাইতেছ? তোমার পিতার সময় হইতে আমি তোমাদের সংসারের একজন আশ্রিত আজ আমাকে কেন ছাড়িয়া যাইতেছ?

ভৈরবচাঁদ:—লালজি, তুমি আমাদের পরিবারের চিরসুহৃদ, হরেক-চাঁদ বালক, তাহার এখনও সমীচীন জ্ঞান হয় নাই। আমি তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছি, তুমিও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলে কে তাহাকে দেখিবে? তোমাকে আমি আমার পরিবারস্থ একজন বলিয়া জানি, অন্য কেহ যাহা কিছু করিবে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া, তুমি যাহা করিবে নিঃস্বার্থভাবে। হরেক চাঁদের হাত ধরিয়া "বাবা হরেক আমি যাইতেছি, কিন্তু চিরঞ্জিলাল রহিল তাহাকে নিস্বার্থ আত্মীয় জ্ঞানে ব্যবহার করিও; মাতাপিতা শ্বশুর শাশুড়ী স্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহই মন্দ ব্যবহার সহ্য করিবে না সে বিষয়ে লক্ষ রাখিও।" এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ভৈরব চাঁদ, তারাবাই, করম চাঁদ ও হুসিয়ার গাড়ীতে উঠিল; রেলের ঘণ্টা বাজিল; আস্তে আস্তে গাড়ীগুলি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িল। যতদূর নজর চলে হরেকচাঁদ পিতাকে দেখিতে লাগিল, তাহার পর গাড়ীখানির দিকে চাহিয়া রহিল, শেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিরঞ্জিলালের গলা ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, চিরঞ্জিলাল আমার সব শেষ হয়ে গেল, আমার দুর্ব্যবহারের জন্য আমার জন্মদাতা পিতাও আমাকে পরিত্যাগ করে গেলেন।

চিরঞ্জিলাল:—শান্ত হও, শোকের সময় নয়; পিতা কখনও পুত্রকে পরিত্যাগ করেন না। তোমার মঙ্গলের জন্যই তিনি কিয়দ্দিনের জন্য তোমার হাতে কার্য্যভার দিয়া তফাতে চলিলেন; এই সময়ের মধ্যে তুমি দেখাও যে তুমি পিতার উপযুক্ত পুত্র। দেখ তোমার উপাদান অতি উত্তম, তুমি ভৈরবচাঁদের পুত্র, আফতাফ চাঁদ জহুরীর বংশধর, তোমার কুসঙ্গীরা তোমার সুবুদ্ধিকে ধূমক্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে; তাহারা নিজ

স্বার্থসিদ্ধির জন্য বন্ধুর ভাণে, তোমার চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহারা তোমার মিত্র নয়, তোমার পরম শত্রু; তোমার চক্ষু আছে সত্য। কিন্তু তোষামোদরূপ ধূম তোমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; যখনই তুমি বুঝিতে পারিবে তাহারা সত্যবাদী নয়, নিজস্বার্থ সিদ্ধির জন্য তোষামোদ বাণী লইয়া তোমার কাছে ঘুরিতেছে, তখনই তুমি তাহাদিগকে বিষবোধে পরিত্যাগ করিবে। তখনই তুমি তোমার নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। ভগবান তোমার মনে বল দিন।

ইহার পর উভয়ে লোকজন সমভিব্যবহারে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন; হরেকচাঁদ সেই দিন পেয়ারীর সহিত পরামর্শ করিলেন কিরূপ ভাবে সংসার চালাইবেন এবং ইহাও মনে মনে স্থির করিলেন লীলার বাটী আর যাইবেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"বারবনিতার চাতুরী"

হরেকচাঁদ ত মনে করিলেন যে, সেই দিন থেকে ভাল হইবেন আর কখনও বেশ্যালয়ে গমন করিবেন না। কিন্তু তাহা হইলে যে তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের স্বার্থের হানি হইবে। তাহার সুমতি, পিতার উপদেশ, চিরঞ্জিলালের সৎপরামর্শ, ধর্ম্মপত্নীর অনুরোধ, নিজের বিবেক, তাহাকে একদিকে টানিতে লাগিল, আর তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের স্বার্থপর পরামর্শ, নিজ মনের দুর্ব্বলতা, পাপের প্রলোভন আর ছলনাময়ী বারবনিতার আকর্ষণ তাহাকে অন্যদিকে টানিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিনে পদীর সকরুণ চিঠি আসিল, তাহার কন্যা পাঁচী ওরফে লীলা প্রায়োপবেশন করিয়া আছে; হরেকচাঁদ আসে নাই, সেই জন্য সে জলগ্রহণ করে নাই, চাকর চিঠি লইয়া আসিল, হরেকচাঁদ পড়িলেন; ছিঁড়িলেন, একটু টলিলেন কিন্তু চলিলেন না। রাত্র ১০টার সময় আর একখানি চিঠি আসিল; হৃদয়তন্ত্রীতে আর একটা ঘা পরিল কিন্তু দৃশ্যমান কোন ফল ফলিল না; পরদিন প্রাতেঃও আবার একখানি চিঠি আসিল, ফের হৃদয়ে আর একটা ঘা পড়িল কিন্তু শিকল টুটিল না।

সন্ধ্যার সময় যখন তিনি বায়ুসেবনার্থে ময়দানে গিয়াছেন, হঠাৎ খুবলাল ধূমকেতুর ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন; হরেকচাঁদ তাহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না; ইচ্ছা, তাহাকে এড়াইয়া যান, কিন্তু খুবলাল সে পাত্রই নয়; তাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, আত্মসম্মান নাই, ভালমন্দ বিবেচনা নাই, স্বার্থই তাহার উপাস্য দেবতা; সে তাহার

ভক্ষ্য ছাড়িবে কেন ? সে দূর হইতে কচুয়ানকে গাড়ী থামাইতে ইসারা করিল, কচুয়ান বাবুর দিকে তাকাইল, তাহার মুখের ভাব দেখিয়া কিছু না বলিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। খুবলাল ছাড়িবার পাত্র নয়। হরেকচাঁদ ত ছাড়িতে চায়, কিন্তু কম্বলি তাহাকে ছাড়ে না ; সে দৌড়ে আসিয়া গাড়ীর পা-দানিতে দাঁড়াইল, কাযেই বাধ্য হইয়া হরেকচাঁদকে গাড়ী থামাইতে হইল, খুবলাল গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

হরেকচাঁদ :—কিহে খুবলাল, তুমি কোথা থেকে ?

খুবলাল :—আরে ভাই যমের অরুচি, আমাদের কি কোন স্থান অস্থান আছে ; পোড়া নরম মনটা নিয়েই সর্ব্বনাশ ; আমি ত মনে করি আর কাহারও কাছে আস্‌ব না, আর কাহারও কোন সংস্রব রাখিব না, কিন্তু বাবা তাকি হবার যো আছে ; তা কি হবার যো আছে, এ যে গেরোয় টান্‌ছে ; আরে মহাশয়, আমি ত দিব্যি করে রামবাবুর বৈঠকখানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিলাম, এমন সময় লোকের উপর লোক কিন্তু শর্ম্মা লোকের চেয়ে ঘুম ভালবাসে ; কাযেই ঘুম ছেড়ে উঠিল না সেদিন ত একরকম কেটে গেল, সে ত আজ দুদিনের কথা ; তারপর সেই ভগ্নদূত আবার বার্ত্তা নিয়ে হাজির। খবর কি ? এমন কিছু নয় ; পদী বিবি একবার ডেকেছেন বড় জরুরি দরকার ; আমার মন্দির পর্য্যন্ত ধাওয়া কর্‌লে, কিন্তু বাবা তাতেও শর্ম্মা গেল না ; শেষে আজ দুপুরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদী স্বয়ং স্বশরীরে এসে আমার দুর্গ আক্রমণ কর্‌লে, তার সাজসরঞ্জম অস্ত্র-শস্ত্র সব নিয়ে এসেছিল ; ক্রন্দন, নিজ কেশ উৎপাটন, অভিশাপ, ভয়প্রদর্শন সেই সব অস্ত্র-শস্ত্র চালনা করে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে ; কেলেঙ্কারির ভয়ে রণে ভঙ্গ দিলাম ; জিজ্ঞাসা করিলাম সে চায় কি ? সে বল্‌লে তার মেয়ে পাঁচী খুড়ি লীলা আজ তিন দিন ধরে উপোস করে আছে, হরেকচাঁদ আসেন নি, সে বল্‌লে হরেকচাঁদ বাবু না

এলে সে জলগ্রহণ করবে না। আমাকে দৌত্য কার্য্য করতে হবে। আমি প্রথমে কিছুতেই রাজি হলাম না, বল্লাম হরেকচাঁদ বাবুর টান্ থাকে আসবেন, না থাকে আসবেন না; আমি এর মাঝখানে কেন পড়ব? তা সে নাছার বান্দা, ছিনে জোঁক, আমি ত গররাজি কিন্তু সে ছাড়ে কই? কিছুতেই রাজি হলাম না কিন্তু শেষে সে বললে, তুমি যদি রাজি না হও, তা হলে আমি আত্মহত্যা কর্ব; নিরুপায় হয়ে বৃন্দা দূতি হতে স্বীকৃত হলাম। এখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয় মানময়ী রাধার মন্দিরে চলুন, না হয় যাবেন না; তবে কি জান একটা স্ত্রীলোক হাজার হ'ক উঠ্তি বয়েস, তোমার জন্য না খেয়ে মর্বে সেটাও ত ভাল কথা নয়, তা যা ভাল হয়, যা ভাল বুঝ তাই কর। আমি খবর দিয়ে নিশ্চিন্ত।

হরেকচাঁদ:—খুবলাল আমার বড় বিপদ, বাবা রাগ করে চলে গেছেন, সংসারের সকল হাঙ্গামাই আমার ঘাড়ে। পূর্ব্বে কখন কোন ঝঞ্ঝাটই পোহাই নি, কেবল খেয়েছি আর হো-হো করে বেড়িয়েছি, এখনকার কথা আলাহিদা, এখন সব ভারই ঘাড়ে পড়েছে; কি করে বংশের মানমর্য্যাদা রেখে চালাব তাই ত মহা ভাবনা, এখন আর ভাই স্ফূর্ত্তিটুর্ত্তি ভাল লাগে না।

খুবলাল:—আরে ভাই সে ত সত্য কথা; একঘেয়ে মেয়েমানুষের ঘ্যানঘ্যানানী কি ভাল লাগে, তবে কি জান চাঁদজি, সংসারে থাকিতে গেলে ধর্ম্মের দিকে একবার চাহিতে হয়; একটা সোমত্ত ছুঁড়ী তোমার জন্য না খেয়ে মরবে, সেটা ত ভাল কথা নয়; আর সংসারের কথা যা বল্চ, তোমার মত ধনীপুত্রের সে ভাবনা বেশী নাই; বরং সে ভাবনা আমাদের, তোমাদের যে রূপার চাক্তি আছে, সে ছেড়ে দিলেই সংসার গড়্গড়িয়ে চলে যাবে; আর কি জান, আমার কথা ভাই, একটা সোমত্ত ছুঁড়ী তোমার জন্য পাগল; তা যা বুঝ তাই কর।

হরেকচাঁদ :—নাহে খুবলাল যত সোজা ভাবছ তত নয় ; বিশেষ বাবা একটা খরচার মাফকাটী করিয়া দিয়া গেছেন।

খুবলাল :—হুঁ, তোমাদের আবার খরচার মাফকাটী, তোমাদের নাম আছে, ডাক আছে, মান আছে, ইজ্জত আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, পসার কীর্ত্তি আছে, খ্যাতি আছে, মান আছে, সম্ভ্রম আছে, চাহিলেই ধার পাবে, তোমাদের আবার ভাবনা ? তোমাদের নামই হল টাকা ; আমাদের নয় যে শুধিব মনে করলেও ধার পাব না, তোমাদের ফাঁকি দেবার কল্পনা থাকলেও লোকে যেচে ধার দিবে।

হরেকচাঁদ :—ঐটী ত বোঝবার ভুল ; দেখ হে আমাদের যেটা আছে, সেটা আমরা হারাতে চাই না ; তোমাদের যখন নেই, তখন হারাবার ভয়ও নেই। আর দেখ, বাবা যদি এখানে থাকতেন, তখন যা করতাম, সে আলাহিদা কথা, তাহার অনুপস্থিতিতে একটুও অন্যায় কাজ করব না।

খুবলাল :—তবে যা বুঝ, কর, বাঘও নয় ভাল্লুকও নয়, একটা ষোড়শী সুন্দরী রমণী, যাবার সময় গাড়ীটা ঘুরিয়ে গেলে কি ক্ষতি ছিল ?

হরেকচাঁদ :—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আচ্ছা তবে চল।

হরেকচাঁদ, খুবলাল ও হরেকচাঁদের সঙ্গী মিলিয়া পদীর বাটীতে উঠিল, সেখানে দেখিল মধু মাসী, পেস্তা পিসী, দাদখানি দিদি, তানপুর মেসো, বেহালা পিসে, হারমনিয়াম দাদা, আর আর সকলে হায় হায় করিতেছে, সব এক সুরে বাঁধা, একটা অজানা অচেনা ছোড়ার জন্য মেয়েটা মল ; কেন রে বাপু, তুই ত আর তার ঘরের বৌ নস ; সে যদি তোকে ভুল্‌লে তুই তাকে কেন ভুল্‌তে পারবি নি ? এই সুরে হা-হুতাশ হচ্ছে, এমন সময় সসঙ্গী হরেকচাঁদের আগমন, যেমন সে এসে পঁহুছিল অমনি গাহনা জমে গেল, হা-হুতাশের মাত্রা বেড়ে গেল, সকলেই

চেঁচিয়ে উঠে বল্‌লে, আঃ মেয়েটা এ যাত্রা বেঁচে গেল; পেনপেনানী ঘেনঘেনানী, নাকিস্বুরে স্ত্রীলোকদের যে সকল অজেয় অস্ত্র আছে, সবই হরেকচাঁদের উপর ছাড়া হইল; তাহার উপর এদের যে সব পুরুষপুঙ্গব ছিল তাহারাও নিজ নিজ বাকপটুতায় ও বুক্‌নিতে এ যুদ্ধ জয়ে অনেক সাহায্য করিল; যাহা হউক হরেকচাঁদ ত ডব্‌কা ছোঁড়া, অনেক প্রৌঢ়েরও এরূপ যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত। সকলে মিলে যেখানে পাঁচী ছিল তাহাকে ধরে নিয়ে গেল, প্রথমে পাঁচী কোন আওয়াজ দেয় নাই; শেষে পাঁচজনের প্ররোচনা, ও বাধ্য হয়ে হরেকচাঁদের সাধ্যিসাধনা, পাঁচীর উপর মৃত-সঞ্জিবনীর কার্য্য করিল। সে উঠিয়া বসিল, বলিল যাও তোমার আর সোহাগে কাজ নাই; পুরুষ যে এত কঠিন হতে পারে তাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই; অমনি মধুমাসী তাহার নিজস্ব স্বরে গেয়ে উঠিল "প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেম ত রবে না," হট্টেশ্বর পাকা ফুটির মত আনন্দে আটখানা হয়ে উঠল, সে আনন্দ দেখে কে! তাকে দেখ্‌লে মনে হয় সে সদানন্দ; জীবনে কখনও নিরানন্দ হয় নাই; টেঁক থেকে পাঁচটা টাকা বার করে দিল, গুয়ে চাকরকে ডেকে বলিল গুয়ে শীঘ্র কিছু নিয়ে আয়, আনন্দে গলা শুকিয়ে গেছে, একটু না ভিজলে চলবে না। খানিকক্ষণ খুব স্ফূর্ত্তি চলিল; সকলেই খুব খুসী, সকলের মুখেই এক কথা, ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা, যেমন হরেকচাঁদ আসা অমনি লীলা বেঁচে উঠল, যেন সে মেয়ে আর নয়; পেন্তা পিসী বলে উঠ্‌ল, তা বাবা এ রকম একটু আধটু বিচ্ছেদ হয়েই থাকে, তা না হলে মিলনের সুখ কোথায়? যাহাহউক, বাবা তুমি ত ভদ্রলোকের ছেলে তুমি ত সব বুঝ; তোমাদের জহুরীর ঘর; দেখেশুনে একটা হীরের কোমরবন্ধ দিয়ে দিও; তাহা হইলেই সব গোল চুকে যাবে; আবার ভাঙ্গা ঘর জোড়া লেগে যাবে। অমনি বেহালা পিসে "তাইত তাইত

তাইত বলি” বলে কীর্ত্তনের সুরে তাহার কথা পোষকতা করিল। অন্যদিকে খুবলাল বলে উঠ্‌ল তা বাপু আমি একটা কথা বলি, না হয় বলেই যাও ; কোন্ বল্‌লেই এখনি দিচ্ছ, তুমি দু’দিন, তিন দিন, চার দিন সময় নিয়ে যাও ; চার দিনের মধ্যে তুমি দেখেশুনে একছড়া ভাল জিনিষ দিও, তোমারও নাম থাক্‌বে আর মেয়েটাও পরে বাঁচ্‌বে ; ওর আর কে আছে ? তুমি না দিলে ও পাবে কোথায় ? অমনি মধুমাসী বলে উঠল ঐ দেখ কোমর বন্ধের নাম শুনেই “মা যেন আমাদের হাস্‌ছে” যাহা হউক সে রাত্রের মিলন সম্পূর্ণ হল ; রাত ১টা আন্দাজে হরেকচাঁদ তার সঙ্গীকে লয়ে বাড়ী ফিরিলেন।

আজ কয়েক দিন থেকেই বাটী থেকে বাহির হন নাই। দেরী দেখে পেয়ারী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে, ঘর বাহির করিতে ছিল ; আস্তাবলের খবর লইল, গাড়ী তখনও ফিরে আসেনি, বেড়াতে গিয়াছেন, তখন পর্য্যন্ত খবর নেই, শেষে হতাশ হয়ে ছোট ছেলেটাকে বুকে নিয়েও ভদ্রবংশের স্ত্রীলোকের শেষ অবলম্বন, গোপনে ক্রন্দনের আশ্রয় লইল, শেষে রাত্রি ১টার পর যখন হরেকচাঁদ ফিরে এলো একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শান্ত হল। হরেকচাঁদ পিয়ারীর মুখের ভাব দেখে অতিশয় মর্ম্মাহত হইল ; সে দেখিল পেয়ারীর গণ্ডদেশ দিয়া অফুরন্ত জলধারা বহিতেছে, মুখে কোন কথা নেই ; মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কাজটা বড় অন্যায় হয়ে গেছে, বাড়ীতে বাবা নেই, মা নেই, পেয়ারীকে একা রেখে এত রাত্র পর্য্যন্ত বাহিরে থাকা অতি নিষ্ঠুরের কাজ হইয়াছে। এতদিন মা-বাপ ছিল, আমার দেরী হইলে কোন অসুবিধা ছিল না, আর তখনও ত আমি কোন দিন রাত্র ১০টার বেশী দেরী করি নাই ; শপথ করে বল্‌ছি ভবিষ্যতে আর কখন দেরী করিব না। প্রকাশ্যে বলিল, পেয়ারি, আমি তোমার নিকট শপথ করে

বল্‌ছি, আর আমার ঐ নিদ্রিত বংশধরের শপথ করে বল্‌ছি, আর কোন দিন দেরী করিব না ; সে রাত্রে অতি কষ্টে সৃষ্টে এক রকম করে মিলন হল। কিন্তু হরেকচাঁদ শুয়ে শুয়ে ভাবিতে লাগিল, একি করিলাম, আমি পিতার সাক্ষাতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর ও পথে যাব না কিন্তু আমার মন কি দুর্ব্বল, চার দিন না যেতেই আমি সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌লাম। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে কাঁদিতে লাগিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল, তাহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল। তখনও সে মানসিক যাতনায় ও আত্মগ্লানিতে কষ্ট পাইতে লাগিল। অবশেষে আবার শপথ করিল—সে আর সে মুখো হবে না, হবে না, হবে না। খুবলালের মুখদর্শন কর্‌বে না। বারবনিতার ছলনায় মুগ্ধ হবে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"জুয়ার ডাকে, পশুর অধম হয়, নারকীর দল"

কয়েক দিন ধরিয়া যমে মানুষে টানাটানির পর কামিনীর ছেলেটী বাঁচিয়া উঠিল, এখন আর তার জীবনের ভয় নাই। এই পীড়ার সময় রাজীবলোচন ও তাহার স্ত্রী কমল রোগীর সেবা, পথ্যের ব্যবস্থা, ডাক্তারের ফি যোগাড় না করিলে বোধ হয় সুনীল এ যাত্রা রক্ষা পাইত না। কমল কাছে না থাকিলে, সে খুঁত খুঁত করে, রাজীবলোচন না দেখিতে আসিলে কাঁদে, কমলকে "বড়মা" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ বার দিন পরে হট্টেশ্বর হঠাৎ বাটীতে আসিয়া হাজির, পুত্রকে দেখিতে নয় কিঞ্চিৎ টাকার যোগাড় করিতে। তখনও ডাক্তারেরা রোগীর রোগমুক্তির আশা দেয় নাই; ইতিমধ্যে রাজীব আর কমল উভয়ে মিলিয়া ২৫০৲ টাকা ধার করিয়াছে এবং প্রাণপণে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা জানাইল ও বলিতে লাগিল; হ্যাগা তুমি কেমন ধারা তোমার কি একটু দয়ামায়া নাই, তোমার এই সোণার চাঁদ ছেলে বিনা চিকিৎসায়. বিনা পথ্যে, মরিতে বসিয়াছে, আর তুমি ঘোড়দৌড়ের খেলা নিয়ে মত্ত; ভগবান কি তোমার মনে একটুও দয়ামায়া দেন নাই? তোমার কাছে অপত্য স্নেহ বলে কি হৃদয়ের একটা আবেগ নাই? তোমার হৃদয়তন্ত্রী কি একেবারে ছিঁড়ে গেছে?

হট্টেশ্বর :—দেখ ও তন্ত্রী ফন্ত্রী আমি বুঝি না, জীবনে অনেক দয়ামায়া করেছি, আমার কাছে আর দয়ামায়া বলে কোন পদার্থ নেই; আমি ত

অনেককে দয়া করিয়াছি, আমাকে কে দয়া করিল ? বুঝেচি এ জগতে দয়া মায়া নাই। দয়ামায়া কথার কথা, কবির কল্পনামাত্র ইহার বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। আরো অধিক টাকা উপায় করিবার জন্য আমি কিঞ্চিৎ টাকা চাই, কে আমাকে সেই পুঁজির টাকা দিবে ? আমি যে বিদ্যা শিখিয়াছি হিংসুক্ লোকেরা তাহাকে জোয়া বলে, কিন্তু আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি এই অসামান্য বিদ্যাবলে, সামান্য পুঁজি হইতে লক্ষপতি হওয়া যায় ; লক্ষপতি কেন ক্রোরপতি হওয়া যায়। তুমি ত আমার স্ত্রী তুমি কৈ আমাকে দয়া করিলে ? আমি ভাগ্যকে বিশ্বাস করি, ভগবানকে বিশ্বাস করি ; আমি বৃথা মায়ার ধার ধারি না ; আমার স্ত্রীর জন্য আমি ভাবি না ; আমার পুত্রের জন্য আমি চঞ্চল নহি। আমি জ্ঞানী পুরুষের মুখে শুনিয়াছি, মায়াই সকল কষ্টের মূল আর স্নেহই মানুষকে দুর্ব্বল করে। ভগবান সকলের আহার যোগাইতেছেন সকলকে রক্ষা করিতেছেন, আর আমার স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করিবেন না ? এই দেখ রাজীবলোচন ও তাহার স্ত্রী আমাদের কে ? তাহারা কেন তোমার ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছে ? সেও সেই লীলাময়ের লীলা ; তুমি ছেলের জন্য ভাবিও না, ভগবান তাহাকে রক্ষা করিবেন। এখন তুমি আমায় রক্ষা কর, আমায় কিঞ্চিৎ টাকা দাও।

কামিনী :—হ্যাগা তোমার যদি ভগবানের উপর এত বিশ্বাস, তবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর না কেন ? একান্ত মনে প্রার্থনা কর না কেন ? তাঁহার হুকুম মানিয়া চলনা কেন ? তুমি সৎপথে থাকিয়া লক্ষপতি হইতে পারিবে।

হট্টেশ্বর :—আমার মনে বল আছে, নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছি ; স্ত্রীলোকের কাছে বক্তৃতা শুনিতে শিখি নাই বা আসি নাই। গত সপ্তাহে সুবিধা হয় নাই ; কাল শনিবার, কিছু টাকা আমায় দাও,

আমি কাল নিশ্চয় রেসে জিতিব। তোমার টাকা মায় সুদসমেত সব ফিরাইয়া দিব। আমায় বিশ্বাস কর আমি অবিশ্বাসী নই।

এই গোলমালে সুনীলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছিল 'বড়মা, বড়মা' 'জেঠা মহাশয়, জেঠা মহাশয়' বলিয়া চেঁচাইল চক্ষু চাহিয়া তাহাদের না দেখিয়া সম্মুখে দেখিল, তাহার জন্মদাতা পিতা ; শিশু মুখ ফিরাইল, মার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, মা, বড়মা কোথায় ? আমায় একটু জল দাও বড় পিপাসা।

মা :—বাবা, বাবা, বলিয়া তাহাকে একটু জল দিল।

হট্টেশ্বর :—দেখ আমি লোকের কষ্ট দেখতে পারি না ; দেখে মনে হচ্ছে ছেলেটার যাতনা হচ্ছে ; আমি দেখতে পাচ্ছি না (পুত্রের প্রতি) বাবা ভয় নেই, ভাল হবে (কামিনীর প্রতি) কই গো কিছু টাকা দাও ঐ বালিশের নীচে টাকা আছে আমার টাকা চাইই। আমি শুনেছি রাজীব টাকা ধার করে কিছু তোমার কাছে দিয়ে গেছে, আর কিছু তাহার কাছে আছে। হয় স্বইচ্ছায় দাও, না হয় জোর করে নিয়ে যাব। কই, এখন দিলে না ? এই বলিয়া কামিনীর আঁচলের খোঁটে যে চাবি বাঁধা ছিল, সেইটী জোর করে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল। কামিনী কাঁদিয়া উঠিল। মাফ কর, মাফ কর, ছেলেটার বাঁচবার একটু আশা হয়েছে, যে কটা টাকা আছে তাহা পরের দান, তাহা নিয়ো না, ছেলেটাকে বাঁচাও।

হট্টেশ্বর :—ওসব ন্যাকামি ছাড়, টাকা দাও, তুমি এখন আমায় বাঁচাও, কাল সন্ধ্যার পর তোমার দেওয়া টাকার দশগুণ দিয়ে দিব।

কামিনী :—(তাহার পদদ্বয় ধরিয়া) আমায় দয়া কর, এমন নিষ্ঠুর হও না।

হট্টেশ্বর :—কি আমার স্ত্রী হয়ে আমার আজ্ঞা পালন করবে না,

আমায় টাকা দিবে না ? আমি তোমার কাছে দয়া চাচ্ছি তুমি আমাকে দয়া না করে আমার কাছে উল্টা দাবী ভিক্ষা ; এই বলিয়া চাবি জোর করিয়া খুলিয়া লইল।

সুনীল :—বাবা আমার মা বই আর কেউ নেই, তুমি মাকে মের না।

হট্টেশ্বর বাক্স খুলিয়া দেখিল ১৬৲ টাকা এক খোপে, আর একটী সিঁদুর মাখা টাকা, আর একটী খোপে ; এই সতেরটী টাকা লইয়া দ্রুত পদে বাটীর বাহির হইয়া গেল। খানিকক্ষণ বাদে কমল আর রাজীবলোচন আসিয়া সকল কথা শুনিল ; বলিল এরূপ হইলে সুনীলকে বাঁচাইবার আর উপায় নাই ; যতদিন না সুনীল বেশ ভাল হয় ততদিন আমাদের একজন না একজন এখানে থাকিব। অভাবে, দুঃখে, রোগে রোগীর সেবায় ও ভাবনায় কামিনীর শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল ; তাহার উপর স্বামীর এই পৈশাচিক ব্যবহারে সে একবারে কাতর হইয়া পড়িল। সেইদিন রাত্রে তাহার কম্প দিয়া জোরে জ্বর আসিল এবং অল্পদিনের মধ্যে তাহার যাতনা শেষ সীমায় আসিয়া পহুঁছিল ; পরে একদিন ভোর রাত্রে তাহার আত্মা ক্ষণভঙ্গুর বাহ্য শরীরকে ত্যাগ করিয়া এমন স্থানে চলিয়া গেল, যেখানে মানুষের অমানুষিক অত্যাচার, স্বামীর প্রাণহীন উৎপীড়ন, আত্মীয় স্বজনের অযাচিত অনাদর তাহাকে উত্ত্যক্ত করিতে পারিবে না।

যে দিন কামিনীর মৃত্যু হইল, তাহার পূর্ব্বদিনে সুনীল পথ্য পাইয়াছিল ; মৃত্যুসংবাদে, লৌকিক আচারের বশবর্ত্তী হইয়া হট্টেশ্বরের অনেক আত্মীয় স্বজন তাহাকে ও তাহার পুত্রকে দেখিতে আসিল এবং সকলেই রাজীবলোচন ও কমল যাহা করিতেছে তাহা খুব ভাল, সচরাচর আত্মীয় লোক এত উপকার করে না ইত্যাদি মুষ্টিমেয় বৃথা বাক্যে যতটা তুষ্টি হইতে পারে তাহা করিয়া চলিয়া গেল ;

যথার্থ বিষয় কেহ জানিল না শুনিল না ; হট্টেশ্বরের সহিত দেখা হইল না ; তাহার অমানুষিক ব্যবহারে সকলেই মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল ; সে দুঃখ প্রকাশ তাহার স্ত্রীর প্রতি দুঃব্যবহারের জন্য নয় ; তাহার পুত্রের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের জন্য নয় ; তবে সে যে তাহাদের জন্য নিজবাটীতে অপেক্ষা করে নাই, তাহাই তাহাদের দুঃখের প্রধান কারণ। তাহারা কষ্ট করিয়া সহানুভূতি দেখাইতে আসিল, আর হট্টেশ্বর তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের সুখ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ভোগ করিতে দিল না। অনেক সময়ে আমাদের দুঃখে বা কষ্টে আত্মীয়ের সহানুভূতি বাস্তবিক অর্থহীন ; লৌকিক আচার মাত্র, আর যদি কিছু মানে থাকে তাহা এই ;—আহা তুমি দুঃখে পড়িয়াছ, তুমি কষ্টে পড়িয়াছ তা কি করিবে ? কিন্তু দেখ আমার সে দুঃখ সে কষ্ট হয় নাই। তোমার বুদ্ধির দোষে বা ভাগ্যদোষে তুমি কষ্ট পাইলে, আমার কিন্তু তোমার মত মন্দভাগ্য নয়, দেখ তোমায় আমায়, পার্থক্য কত। তুমি কত ছোট আমি কত বড় ; তুমি কোন কোন বিষয়ে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পার, কিন্তু এখন, এসময়ে, এ বিষয়ে তুমি আমা হইতে নিকৃষ্ট। কেবল তোতা পাখীর মতন কতকগুলা বুলী আওড়াইবে আর খানিকবাদ "তবে চলিলাম, ভাগ্যের উপর কাহারও হাত নাই" ইত্যাদি বলিয়া পর্ব্বের শেষ করিবে। তাহাদের বাক্য মৌখিক, প্রাণহীন, অসার ; সকলেই অনাথ বালক সুনীলের জন্য মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিল ; মনে মনে বলিতে লাগিল সুনীলের বাপ আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও মন্দবুদ্ধি তাই সুনীলের দুঃখ ; আমার ছেলেরা কিন্তু সুনীলের মতন নয় ; কারণ তাহার মাতাপিতা অপেক্ষা আমরা বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী, গুণী ও হুসিয়ার ; অনেকেই অনেক কথা বলিল, কিন্তু কেহই সুনীলের ব্যবস্থা করিল না।

রাজীবলোচন ও কমল পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, তাহারা এই

মাতৃহীন আর কার্য্যতঃ পিতৃহীন বালকটীকে লালন পালন করিবে। বালকের পিতা আছে সত্য, কিন্তু তাহার থাকা আর নাই থাকা, দুইই সমান। সে ঘোড়দৌড়ের প্রেমে মাতোয়ারা পুত্রকে দেখিবার তাহার সময় নাই। একদিন রাজীবলোচন পরামর্শ করিয়া হট্টেশ্বর ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকাইলেন। হট্টেশ্বরের ভাড়াটীয়া বাটীতে সকলে মিলিত হইল। হট্টেশ্বর রাজীবলোচনের প্রস্তাব শুনিয়া বলিল আমার কোন আপত্তি নাই তুমি আমার বাল্যবন্ধু তুমি ছেলেটীকে মানুষ করিবে এই বাসনা করিয়াছ, তাহাতে আপত্তি করিয়া মনঃকষ্ট দিতে চাই না। আমার পুত্রটী ঈশ্বরের দান, আর তোমার হৃদয়ের এই বাসনা সেও ভগবান প্রণোদিত। আমি এই ঐশ্বরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব না। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। আমি কখন মায়ার ক্রীতদাস নহি। আমি বেশ বুঝিয়াছি, মায়া মানুষের মানসিক দুর্ব্বলতা মাত্র, আমার মনে বেশ বল আছে, আমি ইহাতে কাতর হইব না, অবাধে এ বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিব।

বঙ্কেশ্বর :—দেখুন, আপনি হট্টেশ্বরের বাল্যবন্ধু, আপনি নিঃসন্তান, আপনার ইচ্ছা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটীকে মানুষ করেন। আমি এ বিষয়ে আপত্তি করিলে আপনার মনে ব্যথা দেওয়া হবে, সেটা মহাপাপ। আর হট্টেশ্বরের পুত্রকে মানুষ করা আমারই কর্ত্তব্য। তুমি সেই কর্ত্তব্য পালন করিবার অধিকার ভিক্ষা করিতেছ। হট্টেশ্বরেরও তাহাতে কোন আপত্তি নাই; তবে কেন আমি আপত্তি তুলিব? মায়াপরবশ হইয়া মাঝে মাঝে ছেলেটীকে আমার বাড়ীতে লইয়া যাইব, তা সে দু এক ঘণ্টার জন্য; আমি অধিকক্ষণ রাখিয়া তোমার মনে কষ্ট দিব না।

হট্টেশ্বর :—তবে আমার এইটুকু মাত্র বলিবার আছে এই বাটীর আসবাব পত্র, পোযাক, গহনাদি যৎসামান্য যাহা কিছু আছে, সমস্ত

বেচিয়া নগদ টাকা করিব; এর পর যখন সুনীলের বিবাহ হইবে। আমি আবার জিনিষ পত্র সব কিনিয়া ওর বাটী সাজাইয়া দিব। আর বৌমাকে গহনা দিয়া সাজাইয়া দিব। আমার এখন টাকার প্রয়োজন। এই টাকা হাতে পাইলে দুই চারিদিন জোরে খেলিলে আমার অনেক টাকার আমদানি হইবে; ওর বিয়ের সময় টাকার অভাব থাকিবে না; আর সেত এখনও ১৫।১৬ বৎসর দেরী আছে, তবে একটা কথা আমি বাড়ীওয়ালার ৬ মাসের টাকা ধারি; সে একটা মস্ত কসাই; তার টাকা না পেলে আসবাব পত্র নিয়ে যেতে দেবে না, তোমাকে আপাততঃ এই টাকাটী দিতে হবে; বাড়ীওয়ালাকে দিও আমার হাতে নয়; তা যদি মত হয়, কালকেই বাড়ীর ভাড়ার টাকাটী ফেলে দাও। আগামী পরশ্বদিন আমার জিনিষ পত্রগুলি বেচে ফেলে, বাড়ী খালি করে ছেড়ে দিব। আগামি শনিবারে একটী বড় রেস আছে, গুরু কৃপা করেন সেই দিনই কিছু হয়ে যাবে। অল্প কথাবার্ত্তার পরই এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। কমল শুনিয়া খুব খুসী সে তাহার গায়ের একখানি ভাল শাল বন্ধক দিয়া ছয় মাসের বাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিল; আর সেই দিন হইতে তিন দিনের মধ্যে সুনীল, রাজীবলোচন ও কমলের বাটীতে আসিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে লালিত পালিত হইতে লাগিল।

* * * * *

ভৈরবচাঁদ কলিকাতা ত্যাগ করিবার কয়েকদিন পরেই রাজীবলোচন ভৈরবচাঁদের কলিকাতা ত্যাগ ও হরেকচাঁদের শোধরাইবার চেষ্টার কথা শুনিয়া ভাবিল এই উপযুক্ত সময়; হয়ত একটু চেষ্টা করিলে এই পরিবারটী রক্ষা করিতে পারা যায়। যদি কোন রকমে হরেকচাঁদকে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ সাঙ্গোপাঙ্গের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলে আমার অভিলাষ সিদ্ধি হইবে। আমার উপর ভগবানের অগাধ দয়া,

তাহা না হইলে সুনীলকে পাইলাম কি করিয়া? আর অর্থকষ্ট সে থাকিবে না। আমি সুনীলের জন্য পুনর্ব্বার নূতন আবেগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। ভগবানের দয়া হইলেই অবশ্য কৃতকার্য্য হইব।

রাজীবলোচন এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার পূর্ব্ব পরিচিত রামময়, আর গেরুয়া পরা অপর একজন লোক আসিয়া উপস্থিত, রামময় আসিয়া নমস্কার বলিল রাজীবদাদা কেমন আছ? অনেকদিন তোমার সহিত দেখা হয় নাই আজ একবার দেখা কর্‌তে এলাম। আমার এই বন্ধুটী সঙ্গে আসিয়াছে, ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল কৃষ্ণকিশোর এখানকার নাম অলসানন্দ, ইনি মহা সাধুপুরুষ; শ্রমক্লীষ্টদেবের শিষ্য, শ্রমক্লীষ্ট বাবা সংসারের অনেক দেখিয়াছেন, ঠেকিয়াছেন, শিখিয়াছেন। নিজের ও অপরের সুখের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ইনি যোগী পুরুষ অনেক সময় যোগে অতিবাহিত করিয়াছেন। পরিশ্রমেও কষ্টে তাঁহার সমস্ত মাংসপেশী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যখন সংসারে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়াও নিজের ও অপরের সুখ সম্পদ আয়ত্ত করিতে পারিলেন না; তখন তিনি ধ্যানে দেখিলেন এ সংসারে এরূপ ভাবে বৃথা পরিশ্রম করিয়া জীবনপাত করা, অজ্ঞতা ও মূর্খতার চিহ্ন; সেই জন্য তিনি স্থির করিয়াছেন, ভগবানের আরাধনাই মানুষের একমাত্র উন্নতির উপায়; তজ্জন্য তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবান আরাধনায় নিজের জীবন অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ করিয়া দুই বৎসর ধরিয়া কর্ম্মত্যাগের পর তিনি শান্তি লাভ করিয়াছেন। আর যে অমৃতময় সত্যটী তিনি পাইয়াছেন, তাহা একা ভোগ করা স্বার্থপরতা হইবে। সেই জন্য তাঁহার নিজ আবিষ্কৃত সুখের সন্ধানটীতে সকলকেই অংশীদাররূপে বরণ করিতে চান। ঠিক চার্ব্বাক্ মুনির মতের মতন তাহার মত নয়, তবে কতকটা সেইরূপ; তাঁহার ভগবানে অগাধ বিশ্বাস; তিনি বলেন ভগবানের

আরাধনা কর, অন্য কোন আরাধনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই পথে আসিয়া তাহার নাম বাবা শ্রমক্লীষ্ট। তিনি বলেন যেমন করে পার ভাল খাও, ভাল স্থানে বাস কর। ঈশ্বরদত্ত শরীরকে কোন কষ্ট দিও না; প্রত্যহ খানিকক্ষণ করিয়া ভগবানের নাম কর, সংসারে সুখে থাকিবে আর অবশেষে মুক্তিও পাইবে। ইনি সেই বাবা শ্রমক্লীষ্টের প্রধান শিষ্য ভ্রাতা অলসানন্দ।

রাজীবলোচন :—আমার আজ সুপ্রভাত, অলসান্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল, দয়া করে এ গরীবের গৃহে পদধূলি দেওয়াতে আপ্যায়িত হইলাম।

রামময় :—দেখ তুমি জ্ঞান, ছেলেবেলা থেকেই আমার ধর্ম্মের দিকে একটু টান আছে; চিরকালই সাধু সন্ন্যাসী ফকীর পরমহংসের খবর লয়ে থাকি, তাহাদের সংসর্গে আমার বিপুল আনন্দ; তাহাদের সঙ্গে প্রাণ ভরে ত্বরিতানন্দ উপভোগ করে থাকি।

অলসানন্দ :—তা রামবাবু, তুমি যদি আমাদের দলে বেশী দিন থাক হয়ত গুরুজী সন্তুষ্ট হয়ে তোমার নাম বিপুলানন্দ দিবেন। তোমার বুদ্ধি আছে সদিচ্ছা আছে। পরের উপকার করিবার স্পৃহাও আছে।

রামময় :—ভ্রাতা অলসানন্দ হচ্ছেন, আমার একমাত্র ভরসা, ধর্ম্মের সে পোল, তবে আজকালকার লোকগুলা ধর্ম্মের মান জানে না খালি কর্ম্ম কর্ম্ম করে চিৎকার করে। ছেলেবেলা থেকেই পরের উপকারে আমার অগাধ স্পৃহা, সুবিধা পাইলেই তাহা করিয়া থাকি। ছেলেবেলায় পাড়ার বারোয়ারী তলায় কালী পূজার সময় আমি কাঙ্গালী ভোজনের পরিবেশন করিয়াছি, একটু বড় হলে স্কুলে (sporting club) স্পোর্টি ক্লাব এবং (Anniversary) এনিভারসারি দিনে খাবার ঘরের জিম্মায় থাকিতাম, তার চেয়ে একটু বড় হলে, পাড়ার হরিসভায় সিন্নি বিলাইতাম। আর কোথাও হরি সঙ্কীর্ত্তন হলে মালসা ভোগের

প্রসাদ পেতাম। আমাকে অনেকে তখন থেকে ভোজনানন্দ বলে ডাকিত, দু এক জন গুণগ্রাহী লোক আমাকে চিনিয়াছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ লোক আমায় চিনিতে পারিলে না। এতদিন গুরু খুজে বেড়ালাম কিন্তু তেমন মনের মতন সাধু পুরুষের দর্শন পাই নাই। শেষে ভ্রাতা অলসানন্দের সহিত আলাপ ; আর তাঁহার চেষ্টায় বাবা শ্রমক্লীষ্টের দর্শন লাভ। বাবা শ্রমক্লীষ্ট যথেষ্ট দয়া করেন। তাঁহার সম্প্রদায়ে ঢুকিতে হইলে অন্ততঃ পঁচিশটী ভাল লোককে তাহার সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে, অন্ততঃ পঁচিশটী লোকের কাছে তাহার গুণকীর্ত্তন করিতে হইবে। তাহার প্রেমে সেই পঁচিশটী লোককে মাজাইতে হইবে। আমি তোমাকে একজন মেধাবী পুরুষ বলিয়া জানি আর যাহা কিছু ভাল তৎ-প্রতি তোমার অনুরাগ আছে ; তুমি ভাই বাবা শ্রমক্লীষ্টের সম্প্রদায়ের আয়তন বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি লোককে বাবার গুণগান শুনাইয়া তাঁহার ভক্ত কর ; ইহাতে আমাদের ও তোমার নিজের ঐহিক ও পারত্রিক দুই-জীবনেরই উন্নতি হইবে বাবা শ্রমক্লীষ্ট তোমাকে দয়া করিবেন, তখন তোমার আর সুখের অবধি থাকিবে না।

রাজীবলোচন :—তাত বুঝলাম তবে আমার উপর এত সুনজর কেন ?

রামময় :—বুঝলে না, এ সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বিস্তার, সম্প্রদায়ের নাম ও সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের অল্প আয়াসে সুখ বৃদ্ধি, তাহাতে অর্থের প্রয়োজন, গোড়ায় অর্থ বিনা কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না—তোমার অনেক বড় বড় জায়গা জানাশুনা আছে কতকগুলি বড় বড় শিষ্য করে দাও।

অলসানন্দ :—কি জানেন ? আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেদের ভাল খেতে, ভাল পর্‌তে হবে, ভাল থাক্‌তে হবে। এ সব করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন অথচ গুরুদেব চান না যে আমাদের সম্প্রদায়ের লোক

বেশী করে পরিশ্রম করবে; সেইজন্য তিনি চান তাঁহার দলে অনেকগুলি ধনী শিষ্য যোগদান করেন; তাহাদের নিজের সুখের জন্ত যাহা প্রয়োজন তদপেক্ষা তাহাদের অধিক সম্পত্তি আছে। আর বাবার এমন অনেক শিষ্য আছেন, যাহাদের আর্থিক সুবিধা কিছুই নাই। সেইজন্য কতকগুলি বিশেষ ধনী শিষ্য হলে তাঁহার সকল শিষ্য একত্র হয়ে সুখে ও আরামে একভাবে ঈশ্বর আরাধনা করতে পারবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ। বাবা তুমি ধন্য। এই বলিয়া, উদ্দেশ্যে জোড় বাহু তুলিয়া দণ্ডবৎ।

রাজীবলোচন :—আপনাদের সম্প্রদায়ের মঠ কোথায়?

অলসানন্দ। আজ্ঞে আপাততঃ আমাদের সম্প্রদায়ের আদি ও অকৃত্রিম মঠ হচ্ছে যবদ্বীপে, প্রত্যহ যেখানে রাশী রাশী চিনি প্রস্তুত হইতেছে তাহারই মধ্যে। তিনি বলেন চিনিও মিষ্ট আমাদের ধর্ম্মটীও মিষ্ট। দুটী পাশাপাশি এক ডালে জোড়া ফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত কিন্তু সেখানে লোক কোথা? যাহারা আছে তাহারা ত মজুরশ্রেণী। তাহাদের লইয়া আমাদের সম্প্রদায় চলিতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদের বাবার উদ্দেশ্য যাহারা ধনমদে মত্ত তাঁহাদেরই উদ্ধার করিতে। তাঁহাদের অর্থ আছে সত্য, তাঁহারা যদি বাবার শিষ্য হয় তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, অর্থের সদ্ব্যবহার কি। তাই বাবা চান তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহাদের অর্থ ব্যয়িত হউক, তাঁহাদের অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে, আর আমাদের সম্প্রদায় ও সংবর্দ্ধিত হইবে। তবে তোমার মত একজন কর্ম্মির প্রয়োজন। সে কেবল প্রথমটা চালাইবার জন্য; প্রথম খানিকটা চালাইয়া দিলে এ সম্প্রদায় আপনি চলে যাবে; আর আজকালকার জনসমাজে লোকের যেরূপ মতিগতি অল্পায়াসে বিপুল আনন্দ, সেটা তুমি কেবল আমাদের সম্প্রদায়েই পাইবে। আমাদের

গুরুদেব যাহা প্রচার করেছেন, আজকালকার লোকে তাহাই চায়, ইহা সময়োপযোগী ধর্ম্ম, তবে লোকদিগকে ভাল করে জানান চাই, ভাল করে বুঝান চাই। তাহা হইলে আর কিছুরই অভাব থাকিবে না। অর্থাৎ কি জান? প্রচার চাই, প্রচার চাই, আজকালকার দিনে প্রচার ভিন্ন কিছুই চলে না।

রামময়ঃ—রাজীবদাদা, গুরুদেব দয়া করে এখন কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা ক্রমে তাঁহার প্রধান মঠ কলিকাতা সহরেই স্থাপন করা। কলিকাতা রাজধানী সহর, অনেক লোকের বাস সেখানে তিনি অনেক লোকের উপকার করিতে পারিবেন, অনেক লোকে তাহার সম্প্রদায়ে ঢুকিবার সুবিধা পাইবে, তুমি আমাদের বাবাকে দেখে থাক্‌বে, খুব প্রাতঃকালে কি কখন ইডেন গার্ডেনে (Eden Garden) বেড়াতে গিয়াছ? যদি গিয়ে থাক, তাহা হইলে দেখে থাক্‌বে, তিনি অতি প্রত্যুষে বাবুর ঘাটে গঙ্গাস্নান করেন, ভাল বেনারসি ধুতি পরেন হাতে রূপা বাঁধান ছড়ি, হ্যাণ্ডলটা সোণা দিয়ে বাঁধান, মুসলমান ফকীরদের বাঁকান লাঠী দেখেছ? ঠিক সেই রকমটা। তাঁহার মাথায় জটা, দোদুল্যমান, তবে সেগুলি তৈলাভাবে রুক্ষ নয়, বরং তৈল ও পমেটম্ আধিক্যে পিচ্ছিল ও মসৃণ, তা থেকে সুগন্ধ বেরুচ্ছে যেন ইন্দ্রকাননের সদ্যস্ফুটিত পারিজাত হইতে; পায়ে হরিণ চর্ম্মের পাম সু, গায়ে বেনারসি উত্তরীয়, হাতে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত কমণ্ডলু, মুখে গোল্ডেন ইজিপসিয়্যান সিগারেট (Golden Egyptian Ciagrette) কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল আর এক সোণায় থালায় গঙ্গা মৃত্তিকা। বাবা সিগারেট টানিতে টানিতে শিষ্যসহ একখানি ফেটিং গাড়ীতে প্রত্যহ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যান। সর্ব্বদাই শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত থাকেন, পাছে বাবার কোন কষ্ট হয়। বাবার কষ্ট হইলেই ভজনার ব্যতিক্রম হইবে। দেখ এই

ভারতবর্ষে অনেক সম্প্রদায় আছে সত্য কিন্তু আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি এরকম সম্প্রদায় আর নাই। রৌপ্য নির্ম্মিত বাক্সে সিগারেট ভরিয়া লইয়া একজন শিষ্য সদাই তাঁহার পার্শ্বচর। প্রাতেঃ শিষ্যবাড়ী আসিয়াই চা পান। সেটি দার্জ্জিলিং রোজ টি (Derjeeling Rose tea) কোন দিন বা কোকো তার সঙ্গে কেক্ (Cake), বিস্কুট (Biscuit), রুটি, মাখন, ভাল সন্দেশ, আর ১১টার মধ্যে অন্নচাই; ৪টার সময় নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ও উপাদেয় মিষ্টান্ন; রাত্রি ৮টার সময় ভোগ। সে ভোগে কেবল চিনি বা বাতাসা নাই—রাবড়ী, ছানার পায়স, জনায়ের মনোহরা, বাগবাজারের স্পঞ্জ রসোগোল্লা, কৃষ্ণনগরের সরভাজা ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি বলেন ভজনা ৬টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত এই যথেষ্ট। তিনি বলেন ঈশ্বরের ভজনা করিতে হইলে ঈশ্বরের দেওয়া শরীরকে যতদূর সম্ভব সুখশান্তিতে রাখিতে হইবে, তাঁহার সৃষ্ট দেহকে কষ্ট দিলে কখন কৃষ্ণ পাইতে পার না। ভোজন ভাল না হইলে, ভজন ভাল জমে না। রাজীবদাদা, তুমি একদিন চল আমাদের গুরুদেবকে দর্শন করে আত্মার উন্নতি করবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রসাদ পেয়ে জীবন সার্থক হবে, রসনার তৃপ্তি হবে।

রাজীবলোচন :—আচ্ছা আজ নয়, আজ আমার একটু বাজে কাজ আছে, তুমি দিন কয়েক বাদে এস।

রামময় :—অলসানন্দ দাদা, তুমি এখন কোথায় যাইবে? মঠে?

রাজীবলোচন :—তোমাদের মঠ কোথা?

অলসানন্দ :—গুরুদেব যখন যে শিষ্য বাড়ী অধিষ্ঠান করেন আমরা তাহাকেই মঠ বলি।

রামময় :—ভ্রাতঃ অলসানন্দ, তুমি তবে যাও। আমি খানিকক্ষণ বাদে মঠে যাইব। অনেক দিন বাদে রাজীবদাদার সহিত দেখা, তার

সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে ওদিকে যাব। গুরু সত্য, গুরু সত্য, গুরু সত্য।

অলসানন্দ চলিয়া গেলে রামময় বসিয়া রহিল।

রাজীবলোচন :—রামময়, এ তোমার আবার কি বুজরুকি, তুমি আবার এ সম্প্রদায়ে জুটলে কোথা থেকে?

রামময় :—রাজীবদাদা মুখ বদলাচ্ছি, মুখ বদলাতে চাচ্ছি, না হ'লে চিরকাল কি পান্তা খাব? পোলাও কালিয়া কি খেতে ইচ্ছা হয় না?

রাজীবলোচন :—কে বললে নয়, কে বললে নয়; দেখ, রামময়, বল্‌তে কি তোমার কথা আমি সকালে মনে করেছিলাম, এতদিন অনেক সুকর্ম্ম করে এসেছ, আজ না হয় একটা কুকর্ম্মই করলে; একটা নিরীহ লোক আমাদের মত সৎসঙ্গের গুণে সটান জাহান্নমের পথে চলেছিল। পাহাড়ের উপর থেকে পদস্খলন করে গড় গড় করে নেমে যাচ্ছিল, মাঝে এক জায়গায় একটু আটকেছে বাঁচবার জন্য অনেক চেষ্টা করছে; আর অধিক অধঃপতন না হয়। আমি তাকে দাঁড় করাবার জন্য একটু চেষ্টা করব; তোমার মত একটা জহুরীর সাহায্য চাই, তুমি ত এখন শ্রমক্লিষ্টদের দলে মিশেছ, তোমাদের দলের নিয়মের ব্যতিক্রম করে, না হয় একটু কষ্টই করিলে?

রামময় :—রাজীদাদার চিরকালটা একরকম গেল, বেশ ফুর্ত্তিতে কাটালে, বাবার এতটা পয়সা খোয়ালে এখনও বেশ আনন্দে আছ।

রাজীব :—রামময় চিরকাল নিজের সুখের জন্যই ঘুরেছি; সেই সুখ পাবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করেছি; যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে মনে করলাম এইবার সুখ পেলাম; সুখের কাছে এগিয়ে এলুম, যেমন তাকে ছুঁই ছুঁই অমনি সে পেছিয়ে গেল, সুখকে আর ধর্‌তে পারলাম না। এইরকম করে প্রায় অর্দ্ধেক জীবনটা কেটে গেল, বাকি অর্দ্ধেকটা, এখন

অন্য রকম করে দেখি, নিজের সুখের আশা ছেড়ে এখন পরকে যাহাতে সুখী করতে পারি সেই দিকে মন দিয়েছি; কিছু কর্‌তে পারিনি, কেবল একটু চেষ্টা কর্‌ছি, তাহাতেই শান্তি পাচ্ছি। দেখি এ পথে কি হয়। রামময় আমার বোধ হয় সুখ বেটা একরকমের জানোয়ার, ও বেটার পিছনে তুমি দৌড়াও আর সে বেটাও দৌড়াচ্ছে, অনেক চেষ্টা ও অনেক কষ্ট করে যদি তাকে ধর ধর হলে বা ধর্‌লে অমনি সে বেটা পিছ্‌লে বেরিয়ে গেল; ও বেটা যেমন বেদ্‌ড়া, ওর ঔষধ হচ্ছে মেরে তাড়ান; আর বলা যা বেটা তুই রামের কাছে, যা তুই শ্যামের কাছে যা; ও বেটাকে পরের হাতে পঁহুছে দিতে পারলে, কতকটা নিশ্চিন্ত। তখন বেটা তোমার কাছে ঠিক থাকবে; জানে এ ত আমার তোয়াক্কা রাখে না, এ আমাকে অন্য লোকের কাছে বিলিয়ে দিচ্ছে। কাজেই চেষ্টা বেষ্টা করে একে একটু রাজি রাখি।

রামময়:—রাজীবদা, আমি এত হেঁয়ালি ফেয়ালি বুঝি না, তবে চিরকালটা, তোমার প্রাণটা সাদা, ছক্কা পাঞ্জার ধার ধার না, তুমি যা বলবে তা করতে রাজি আছি। তুমি আমাকে ফাঁসিয়ে নিজের স্বার্থ কখনই চাহিবে না। রাজীবদা, আজকালকার দিনে, বাবা, আনন্দ, পরমহংস, মহারাজ দলের ত অভাব নেই; অলিতে গলিতে অবতার, আনন্দ, পরমহংস আর বাবার অভ্যুদয়। তুমি একটা এই রকম সম্প্রদায়ের চাঁই হয়ে পড় না কেন? তোমার নেতৃত্বে হয় ত দশটা লোকের ভাল হতে পারে, আজকাল যে সব দেখ্‌ছ, উপগুরু ও উপ-অবতারের ও উপদেবতাদের ছড়াছড়ি। তারাই দেশটাকে খেলে, সব বেটাই ঘটীচোরের দল সব বেটা "পরের মাথায় ভাঙ্গবো কাঁঠাল আমি খাব কুয়ো" দলের দলপতি হতে চায়। দেখ রাজীবদা, আমি যে বাবা শ্রমক্লিষ্টের দলের কথা বললুম, তা বেটারা সুরু করেছে ভাল, তবে

কোথায় গিয়ে পঁহুছিবে তাত বলতে পারি না। বেটা মোটামুটি এক রকম বলেই দিয়েছে, রামের আছে, শ্যামের নেই, আমি বিচারপতি হয়ে শ্যামের যা নেই তা রামের কাছ থেকে নিয়ে শ্যামকে দিব।

রাজীবলোচন :—দেখ আমি এখন বটতলা ষ্ট্রীটে হরেকচাঁদের বাটীতে যাচ্ছি তুমি ত হরেকচাঁদকে চেন?

রামময় :—তাকে আর চিনি নে? কে, হরেকচাঁদ জহুরী? ছেলেবেলায় যে বাপের নামে নামী ছিল, সকলে বলত ভৈরবচাঁদ জহুরীর ছেলে তার পর পরিচিত হইল বেশ্যার নামে। লোকে বলতে লাগল পাঁচীর বাবু। সেই হরেকচাঁদের কথা বলছ?

রাজীবলোচন :—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবলাল বেটাই তার মাথাটা খেলে; এখন সে পালাবার চেষ্টা করছে। খুবলাল, পাঁচী আর তার আত্মীয়েরা তাকে জোঁকের মত ধরে বসে আছে। এস দিকি ভাই যদি তাকে ছিনিয়ে আন্‌তে পারি। তোমার কষ্টটা বৃথা যাবে না। হরেকচাঁদ পয়সা-ওয়ালা বাপের বেটা; আমি তোমার একটা গতি করে দিব; তবে পয়সাটা খরচ করবে, আমার বীজমন্ত্র অনুযায়ী অর্থাৎ অপরের সুখের জন্য। নিজে না হইলেই পর, পরটির সুরু হইল নিজের অব্যবহিত পর হইতে। মাতা পিতা, স্ত্রী পুত্র হইতে, তারপর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী স্বদেশবাসী, ক্রমে গণ্ডীটি বাড়িয়ে লও। যাক এসব কথা, চল একবার আমার সঙ্গে। এই বলিয়া দুইজনে হরেকচাঁদের বাটীর উদ্দেশ্যে বাহির হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"সুধা না গরল"

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজীবলোচন ও রামময় উভয়ে ভৈরবচাঁদ জহুরীর বটতলা ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে আসিয়া পঁহুছিল। বাটীর লোকজন, আসবাব পত্র, ইলেবাস পোষাক, সবই রহিয়াছে, কেবল নাই দুইটী প্রাণী। অন্দর মহলে নাই তারাবাই, আর বহির্মহলে নাই ভৈরবচাঁদ, এই দুয়ের সামান্য দিনের অবর্ত্তমানে ভৈরবচাঁদের বাটীটি যেন শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাহার আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত লোকেরা, যাহারা ঘন ঘন তাহার বাটীতে আসিত, সেখানে আসা এখন বন্ধ করিয়াছে; এখন খালি অর্থলোভী স্বার্থপর কতকগুলি বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও অপরিণতবয়স্ক যুবাপুরুষ সেই বাড়ীতে আনাগোনা করিতেছে; হরেকচাঁদ যদিও তাহাদের সঙ্গে বড় একটা সাক্ষাৎ করিতেছে না, তবু তারা আসা যাওয়া বন্ধ করিতেছে না। সকলেই প্রকাশ করিতেছে তাহারা ভৈরবচাঁদের পুরাতন বন্ধু। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তদীয় বন্ধু হরেকচাঁদকে সৎপরামর্শ দিবার ও দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যই সেখানে আসিতেছে। পূর্ব্বে বড় একটা ইহাদের চেহারা সে বাটীতে দেখা যায় নাই, এখন কিন্তু তাহারা এ বাটীতে ঘন ঘন আসিতেছে। প্রায় দেখা যায় কোন ব্যক্তি ধনসম্পত্তি রাখিয়া মরিয়া গেলে তাহার এত আত্মীয় ও নিকট বন্ধু আসিয়া তাহার পুত্রের বা অন্য আত্মীয়ের নিকট প্রকাশিত হন, যে তাহার গণনা করা যায় না। কিন্তু মৃত ব্যক্তি তাহার জীবিত অবস্থায় কখন তাদের দেখেন নাই বা দেখা হইলেও তাহাদের সঙ্গে বিশেষ

ঘনিষ্ঠতা ছিল না। হয় ত তিনি যদি ধনী পুত্র বা ওয়ারিশান রাখিয়া মারা যান, ঐ মৃত ব্যক্তির চিতার ধুমরাশি হইতে অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ও পরিচিতের অভ্যুত্থান হয়।

এ স্থলে ভৈরবচাঁদ মরিয়া যান নাই সত্য, কিন্তু বহু দিনের জন্য প্রবাসে গিয়াছেন, এই সুযোগে অনেক নূতন বন্ধু ও আত্মীয়ের উৎপত্তি হইল। তাহারা সকলেই সৎপরামর্শের পসরা মাথায় করিয়া হরেকচাঁদের দোরে দণ্ডায়মান। সকলেই নিঃস্বার্থ এবং কেবল হরেক-চাঁদের মঙ্গলের জন্যই যাতায়াত করিতেছেন। হরেকচাঁদ তত মেধাবী বালক নয়, সেই জন্যই তাহাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত অযাচিত দান গ্রহণে ততটা ব্যগ্রতা দেখান নাই। যাহা হউক তাহাদের সেই অযাচিত দান হরেকচাঁদ ব্যগ্রতার সহিত গ্রহণ করুন আর নাই করুন, দাতারা দান গ্রহণ করাইবার জন্য তাহার বাটীতে আসা বন্ধ করেন নাই। তাহার লোকজন তাহাদিগকে বিশেষ খাতির করিয়া বসাইত না; তাহা হইলেও এই সকল নিঃস্বার্থ উপকারী বন্ধুরা লোকজনের এই দুর্ব্যবহারে কোন দোষ গ্রহণ করেন নাই। হরেকচাঁদ যখন বিপন্ন, তাহার ত্রুটি হইবেই, তা বলিয়া তাহাকে কি ছাড়িয়া যাইবে। রাজীবলোচন আসিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি লোক সেখানে উপস্থিত আছেন, তাহাদের মধ্যে আছেন আমাদের অলসানন্দ, তিনি নামে অলস হইলেও কার্য্যে খুব তৎপর; রাজীবলোচন ও রামময় আসিবার পূর্ব্বেই হরেকচাঁদের নীচেকার বৈঠকখানায় ধূমকেতুর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। লোকমুখে খবর পাইবার খানিকক্ষণ পরে হরেকচাঁদ সেই ঘরে আসিলেন। যেমন হরেকচাঁদের আগমন, যতগুলি লোক বসিয়াছিল সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজীবলোচন কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় নিজের আসনে বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া হরেকচাঁদ বসিলেন, আর

লোক সকলকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তার পর রাজীবলোচনকে বলিলেন, "রাজীববাবু আমার সহিত উপরের বৈঠকখানায় আসুন"। এই বলিয়া রাজীবের সঙ্গে ঘরের বাহির হইলেন আর সমবেত লোক-গুলিকে বলিলেন, দেখুন আজ আমার একটু কাজ আছে, আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। আপনারা সুবিধামত আর কোন দিন আসিবেন। অনেকেই বলিয়া উঠিল, "তাত বটেই, তাত বটেই, পরমভক্ত. পরমভক্ত, পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, আশ্রিত-পালক, ভৈরবচাঁদ জহুরীর পুত্র আপনি যখনই বলবেন তখনই আসব; এত আমাদের নিজের ঘর আমরা ডাকলেও আস্‌ব, আর না ডাকলেও আস্‌ব"। অলসানন্দ বলিলেন "আমি বাবা শ্রমক্লিষ্ট দলের একজন প্রধান গোঁসাই আপনার সুনাম শুনে কিঞ্চিৎ উপকারের জন্য এখানে আসিয়া-ছিলাম তা ভালই হইয়াছে। রাজীবলোচনবাবু আমাদের সম্প্রদায়ের বিষয় সবই জানেন, উনি আপনাকে সব বুঝাইয়া দিবেন"; (রাজীব-লোচনের দিকে ফিরিয়া) "কেমন রাজীব বাবু; কি বলেন, আর এই যে ভদ্রলোকটী রামময় বাবুকে দেখিতেছেন ইনি আমাদের সম্প্রদায়ের প্রবেশ অধিকারের একজন উমেদার। ইনিও বাবাকে দেখিয়াছেন আর আমাদের সম্প্রদায়ের কথাও অনেক জানেন। তা যাহাই হউক আপনার এদিকে যখন এসেছি, উপকার না করে আমি ছাড়্‌ব না। অনেক সময় আমরা অপরের মঙ্গলার্থে অনেক অসুবিধা ভোগ করি, ইহা আমাদের ধর্ম্মের একটী মূল মন্ত্র বলিলেও চলে। আচ্ছা তবে এখন আসি। ভগবান আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, সুবিধামত আর একদিন আসিব।

রাজীবলোচন :—হে ভ্রাতঃ অলসানন্দ, হঠাৎ বেফাঁস বলিলে, উচিত ছিল তোমার এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করা, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। তুমি আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। তাহার ফলে

হয়ত, তাহার মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গল হইতে পারে। তুমি একজন হুঁসিয়ার লোক, কথায় ঠকে গেলে হে ? এই বলিয়া রাজীব ও হরেকচাঁদ দুজনে দ্বিতলের বৈঠকখানায় গেলেন। উপরে গিয়া রাজীবলোচনকে বলিলেন, বসুন রাজীববাবু বসুন। আপনি আমার এখানে এসেছেন তাতে আমি বিশেষ খুসী ; যে কয়বার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে সে কয়বারের কথাবার্ত্তায় বুঝতে পেরেছি,আপনি চাটুকার তোষামুদে নহেন। অসময়ের বন্ধু,আপনার উদ্দেশ্য সৎ বলিয়াই বোধ হয়। দেখুন পিতা কিছুদিনের জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, মাতাঠাকুরাণীও তাঁহার সহিত গিয়াছেন এ সময়ে আপনার ন্যায় স্পষ্টবাদী লোকের সহিত সাক্ষাৎ আমার একান্ত প্রার্থনীয়।

রাজীবলোচন :—আমি আপনার বিপদের কথা কতক কতক শুনিয়াছি ও আপনার সহিত কয়েকটা কথা কহিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। দেখুন আপনার বিপদ ঘোরতর, তবে একটু হুসিয়ার হইলেই সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইবে। গত পরশু পদী ওরফে চিকণহাসি, পাঁচী ওরফে পারিজাত ওরফে লীলা আপনাকে পাকড়াও করে লইয়া গিয়াছিল। চার দিনের মধ্যে আপনার হীরের কোমরপেটি দেবার কথা আছে ; একথা সেই সময়ে আপনাদের সঙ্গে যিনি উপস্থিত ছিলেন তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। আপনার পথ খুব সোজা, যদি একটু মনের জোর দেখাতে পারেন ; আপনার উদ্ধার স্থিরনিশ্চয়। দেখুন হরেকচাঁদ বাবু, "বেশ্যার ভালবাসা আর মুসলমানের মুরগী পোষা" দুইয়েরই উদ্দেশ্য এক, গলায় ছুরি ও জবাই। আপনি যদি অর্থকৃচ্ছ্রতার ভাণ করেন তবে সব গোল মিটে যাবে ; আর প্রকৃতপক্ষে আপনার পিতা আপনাকে অর্থস্বাচ্ছল্যে রেখে যান নাই। আপনি যেমন টাকা দেওয়া বন্ধ করবেন, অমনি সব ভালবাসা "ঢাকা খোলা কর্পূরন্যায়" উবে যাবে। দেখুন ওজাতের ভালবাসা

খালি টাকাতেই জাগিয়ে রাখে। টাকা বন্ধ করুন সব ফাঁক। বেশ্যাদের অনেক রকম ভাণ আছে; তার মধ্যে লীলা আপনাকে একটা ভাণ দেখিয়েছে। তাও অতি সামান্য ভাণ। প্রয়োজন হলে এর চেয়ে অনেক বড় বড় চোকা চোকা ভেল্কী আছে যাহা সে ব্যবহার কর্‌বেই কর্‌বে। আপনি যদি রাজি হন; আমি আপনাকে এর প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে দেখিয়ে দিব। খুবলালটি আপনার শনি। ও যতদিন আপনার ঘাড়ে চেপে থাকবে, কার সাধ্য যে আপনাকে রক্ষা করে। আমার একটা লোক আছে দিন কতক সেটাকে আপনার সঙ্গে দিব। তাকে বিশ্বাসী বলা যায় না; কারণ এসব কাজে বিশ্বাসী লোক মেলে না। যেমন উঞ্ছ কাজ তেমনি উঞ্ছ লোক দিয়েই সাধন করতে হবে। আমার মন্ত্রের কি ফল হয়, আমি আপনার কাছ থেকে মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যাব; তবে একটা কথা আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময় চিরঞ্জীলাল সেখানে এসে পঁহুছিল। সে সব কথা শুনে বললে "হ্যাঁ, এ পাকা লোক, এর কথামত কাজ কর, ফল পাবে"। এর পর রামময়কে ডাকান হইল, তাকে বলে দেওয়া হইল সময় অসময় সর্ব্বদাই পদীর বাড়ী ও ওপাড়ায় সকলকে বলে বেড়াবে, "তাহার পিতা ভৈরবচাঁদ, হরেকচাঁদকে ত্যাজ্য-পুত্র করে গেছে, তাকে একটী পয়সাও দিয়ে যায় নাই, অসংখ্য পাওনাদার। তাহার উপর খুব চাপাচাপি করিতেছে, শীঘ্র তাকে জেলে দেবে; তার ঘোর বিপদ"।

দুই তিন দিনের মধ্যে রামময় এই বার্ত্তাগুলি দ্রুতগতিতে ঘোষণা করিয়া দিল। আত্মীয়তার ভাণ করিয়া পদীর কাছে, পাঁচীর কাছে এবং বাড়ীর ও পাড়ার সকলের কাছে, এই সংবাদটি সালঙ্কারে রটাইয়া দিল। যখন মার কাছে বলে, তখন মেয়ে থাকে না; যখন মেয়ের

কাছে বলে, তখন মা থাকে না; প্রত্যেককেই গোপনতার ভাণ করিয়া খুব আস্তে ও সতর্কতার সহিত এই কথাগুলি বলে; আর প্রত্যেককেই দিব্য দিয়া বলে সে যেন এই গোপনীয় সংবাদটি কাহারও কাছে প্রকাশ না করে; কেননা ইহা বড় ঘরের গুপ্তকথা, প্রকাশ হইলে হরেকচাঁদের বিপদ।

ইহার দিন কতক বাদে হঠাৎ একদিন রামময় পদীর বাড়ীতে আসিয়া হাজির; বাড়ীওয়ালীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রসময় বলিল, "দেখ বাড়ীওয়ালী খবর আসিয়াছে হরেকচাঁদকে তাহার পিতা যে যৎসামান্য মাসহারা দিব বলিয়া গিয়াছিলেন তাও বন্ধ করিয়াছেন। হরেকচাঁদ এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে পথের ভিখারী; হরেকচাঁদ আমার বিশেষ বন্ধু আমি তার কথা তোমাকে কখনও বলিতাম না; তবে তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু পাছে তোমার বাড়ীভাড়ার বেশী টাকা মারা যায় সেই জন্য তোমায় অতি গোপনে খবর দিলাম। আমার ছুঁয়ে শপথ কর যেন এ কথা কাহাকেও বলবে না।

বাড়ীওয়ালী:—তাকি পারি, তোমার কাছে দিব্য করলে আমি কি আর কাহাকেও কথা বলতে পারি? তোমার মাথার চুলের দিব্য। এই বলে সে অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে রামময় চলে যায়, কথার গুরুত্বে তাহার পেট ফাঁপিতে লাগিল। অল্প কথাবার্ত্তার পর যেমন রামময় পশ্চাৎভাগ দেখাইল অমনি দৌড়ে পদীর ঘরে গিয়ে বল্লে, "হ্যাঁলা পদী তোর নেকামি রাখ, আমার দেড় মাসের ভাড়া বাকি, সে টাকা পত্রপাঠ দিয়ে দে; তোদের জহুরী বাবা গণেশ উল্টেছে; সে শীগ্‌গির তোর বদলে সরকারের জামাই হয়ে ভাত খাবে। হয় আমার টাকা দে, নয় আজই নূতন জামাই যোগাড় কর, আমি ঘাগী মেয়ে মানুষ আমার কাছে এসব খবর আপনি আসে; তা তোরা বল আর না বল"।

পদী :—হ্যাঁ দিদি, আমিও ঐরকম কি একটা শুনছিলুম।

বাড়ীওয়ালী :—শোনা কি লো, আমি শোনা কথার ধার ধারি না, স্বচক্ষে দেখা, হরেকচাঁদ ঘানি টান্‌ছে আর ছর ছর করে তেল পড়ছে। আমি মজলিসকুমারী, আমি সব খবর রাখি। দেখ আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাই, তাই ভবিষ্যৎ বুঝে কাজ করি। দুদিনে হউক চার দিনে হউক চাঁদকে ঘানি টানতেই হবে। দেখ্ পদী রাগ করিস্‌নে তোর মায়ের ভাগ্যে কি এত সুখ সয়, হত আমার মেয়ে, তা হলে দেখতিস্ চাঁদের চাকা ঠিক ঘুরে যেত।

সেই দিন রাত্রে রাজীবলোচনের পরামর্শ মত রামময় পূর্ব্ব হইতেই পদীর বাটীতে উপস্থিত ছিল। খানিকক্ষণ পরে হরেকচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল ; হরেকচাঁদকে দেখিয়াই রামময় বলিল, কি হে ফেরার বাবু, তুমি কোথা থেকে ? হরেকচাঁদ যেন তা শুনিয়াও শুনে নাই, বলিল, কিহে রামময় বাবু ভাল আছ ত ?

রামময় :—তা ভাল থাকব না কেন বাবু, আমাদের জীবনে জোয়ার ভাঁটা নেই, এক টানেই চলে যাচ্ছে। তোমাদের নয় আজ জোয়ার পাঁচদিন ভাঁটা। বাবা জহুরীর ছেলে এরকম পুটে কাপ্তেনির দরকার কি ? হরেকচাঁদ দেখালে সে যেন ভাঁটার কথায় হক্‌চকিয়ে গেছে, তারপর মুখটি চুণ করে বসিল ; তখনি পদী এল, বাড়ীওয়ালী এল, পাঁচী এল। বাড়ীওয়ালী এসেই পদীকে বললে “দেখ্ পদী, আমার ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দে, আমার বাপু টাকার দরকার, আমি দেরী করতে পারব না। হয় আজ রাত্রে না হয় কাল ১২ টার মধ্যে টাকা দিতে হবে”। পাঁচী ওরফে পারিজাত-ওরফে লীলা বলিল “দেখ বাড়ীওয়ালী মাসী, মনে থাকে যেন আমি এক বনিয়াদীর ঘরের বউ। আমার বাবু অনেক পুরুষে বনিয়াদী বড়লোক, তুমি আমার উপর ওরকম তাগাদা করো না। আমি

কালকেই তোমার নাকের উপর টাকা ধরে দেব”। ইহার খানিক পরেই বাড়ীওয়ালী চলে গেল।

রামময় তখন বললে “দেখ্ পাঁচীবিবি তুই এক বনিয়াদী ঘরের বউ, একি তোর কম ভাগ্যি; তুই অনেক শিবপূজা করেছিলি, তাই এ রকম বাবু পেয়েছিস্; টাকা আসতেও জানে, আর যেতেও জানে। আজ দুদিন না হয় বাবুর বাপ রেগে সব বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু দুদিন পরে ত ফিরবে। দুদিন না হয়, টাকার কষ্টই হল” এই সুরে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রামময় উঠে গেল। শেষে পদী বল্লে, “হ্যাঁগা ভালমানুষের ছেলে, পাঁচ জনের সাক্ষাতে তোমায় অপমান করলাম্ না এখন বলি তোমার কোমরবন্ধ কোথায়? তোমার মতলবটা কি? দেবে কি ঠকাবে? আমাদের বেশ্যার পয়সা নিয়ে তোমার হজম হবে না”।

হরেকচাঁদ:—দেখ চিকণহাসী আমি তোমাদের কি করেছি যে তুমি এত রাগ করছ?

পদী:—রাগ করব না? গা জ্বলে যাচ্ছে; যার কথার ঠিক নেই, তার কিছুরই ঠিক নেই।

হরেকচাঁদ:—বেশ্যার মুখ কিনা; কিছু আটকায় না।

পাঁচী:—তা বাবু আমি মাও বুঝিনে বাপও বুঝিনে; আমি বুঝি কথা সাচ্ছা হওয়া চাই। মা আবদার করলে তুমি বললে চারদিন বাদে দিব, তা আট দিন হয়ে গেল; এখনও দিলে না, কবে দেবে, তা ঠিক করে বল না।

হরেকচাঁদ:—পারিজাত, তোমাকে কিছু কি দিই নাই? ভাব দেখি তোমার কুকুরটাও মাসে ৫০৲ টাকা খায়। এই খরচ আজ ৫ বৎসর ধরে দিয়ে আসছি। তোমাকে দিই নাই কি? আর অদেয়ই বা কি আছে?

পদী :—আরে বেটা দেনেওয়ালা, একি তোর ঘরের বউ যে দাও না দাও, মিথ্যা বল, ঠকাও, "তবু তোমা বই আর জানি নে"। এ বাজারের বেশ্যা "ফেল কড়ি মাখ তেল"।

হরেকচাঁদ :—চিকণহাসী বিবি তুমিই না এক দিন বলেছিলে যে পারিজাত আমার জন্য পাগল, আমাকে না দেখলে না খেয়ে মরবে।

পদী :—তাত বলেছিলুম সত্যি; বাজারের বেশ্যার অনেক রকম ছিনালি আছে, সেও তার মধ্যে একটা। আমাদের পেটের জন্যই সব। যদি না খেয়ে মরতে হয়, তবে তোমার কাছে থেকে না খেয়ে মরব কেন?

হরেকচাঁদ :—সত্য কথা বল্‌তে কি তোমাদের জন্যই আমার পিতা আমাকে ত্যজ্যপুত্র করেছেন, আমার কিছু নাই, আমি কি খাব তার সংস্থান নাই, তা তোমাকে ত অনেক দিয়েছি; যদি ছয় মাস নাই দিতে পারি, তার পর বাবার রাগ পড়লে হয়ত......

পদী :—ওরে 'আমার 'হয়ত'র পুত, ওরে আমার 'যদি'র ছাওয়াল; বাড়ীওয়ালী কি 'যদি'র উপর চুপ করে থাকে? না চাকর, বামুন, মুদী, কাপড়ওয়ালা, ওস্তাদজী, সত্যনারায়ণ সাহা, হোটেলওয়ালা, বেলফুল-ওয়ালা এরা "হয়ত" পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে? 'হয়ত' বিষয় পাবে, আর 'নয়ত' আশার বিড়ি খেয়ে কি পেট ভর্‌বে? হয় কালকের মধ্যে কোমর বন্ধ ও টাকা এনে দাও, আর না হয় পত্রপাঠ এখান থেকে বেরোও।

পাঁচী :—তা বাপু আমি ঝগড়া কচকচি ভালবাসি নে, একটু শান্তিতে থাকতে চাই, তুমি না হয় দিন কতক নাই এলে?

হরেকচাঁদ :—পারিজাত তোমাকে না দেখ্‌লে যে আমি থাক্‌তে পারি নে; বাঁচতে পারব না।

পদ্মী :—আর তোমার কাছে থেকে পারিজাত কি শুকিয়ে ঝোরে পড়্‌বে ; ঐ কুতবুদ্দিন জুতোওয়ালা কদিন ধরে বলে পাঠাচ্ছে ; এখন না হয় তাকে আস্‌তে বলি ; এখন ত সব চলে গেল তাতে দোষই বা কি ?

হরেকচাঁদ :—একি কথা পারিজাত তোমাকে ছেড়ে আমি কি করে বাঁচ্‌ব ?

পদ্মী :—একি কথা হরেকচাঁদ, তোমাকে খালি দেখে আমরাই বা কি করে বাঁচিব ?

হরেকচাঁদ :—তুমি বলছিলে আমা বই আর জানো না।

পদ্মী :—এখনও বল্‌ছি তোমাদের টাকা বই আর জানি নে। তোমরা পুরুষজাতি তোমরা ভোমরার মত। পাঁচ ফুলের মধু খেতে খেতে এক জায়গায় এক ফুলে এসে বস। তোমাদের সঙ্গে কি আত্মীয়তা আছে, কি পরিচয় আছে, যে যত্ন করে তোমাদের বসতে দেব। কেবল আমাদের সুধার বদলে অর্থ মধু দাও বলে। আমরা তোমাদের মধু খেয়ে বাঁচি, তোমরা আমাদের সুধা খেয়ে মাতোয়ারা হও।

হরেকচাঁদ :—সুধা না গরল ?

পদ্মী :—তার জন্যই ত পাগল।

হরেকচাঁদ :—সেত ওলাঘ্যান জন কত ?

পদ্মী :—তার সংখ্যা বড় কম নয়, দেখতে গেলে অনেক শত।

পাঁচী :—তা হলে টাকার কি হবে ?

হরেকচাঁদ :—হাতে যখন আসবে তখন পাবে।

পদ্মী :—দেখ ওসব হেঁয়ালী রাখ। হয় টাকা দাও না হয় পথ দেখ।

হরেকচাঁদ :—পেলেই দিব টাকা।

পদ্মী :—তবে এখন কথামত নাও এই গলাধাক্কা। বলেই ঝাঁটা উত্তোলন।

হরেকচাঁদ সেইখান থেকে সটান রাজীবলোচনের বাড়ী গিয়েই "রাজীবলোচন বাবু, রাজীবলোচনবাবু" বলে ডাকতে সুরু করলে। রাজীব-লোচন নেমে এলে, তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তার পায়ের ধূলা নিল, আর হাস্‌তে হাস্‌তে বললে "মাইরি বল্‌চি, রাজীববাবু, তোমার বুদ্ধিকে বলিহারী; এতদিন আমাকে এ বুদ্ধি দাও নাই কেন, তাহা হলে এতদিন পদীবেটীর নরকে পচতে হত না।"

রাজীবলোচন:—হরেকচাঁদ বাবু দুঃখ কর না। তোমার ঘোর জ্বরবিকার হয়েছিল, ভোগ শেষ না হলে, ওষুধ রোগের কর্‌ত কি? তবে দেখ ঠেকে শেষে যেন ফের পালটে পাঁকে পড় না।

হরেকচাঁদ:—আবার; ভদ্রলোকের ছেলে, ভদ্রবংশে জন্মে বেশ্যা-ঘরে অনেক রকম খেলাম; মায় গালি, ঘরের পয়সা দিয়ে চোর হলাম—জোচ্চোর হলাম; আর সে পথ? রাজীববাবু শপথ করে বল্‌ছি, ও মুখ আর নয়।

রাজীব:—দিব্যিটিব্যি কর না; মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর, আর ভদ্র সন্তানের মত সেই প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে চেষ্টা কর। চেঁচিয়ে দিব্যি করলে আমার সন্দেহ হয়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"সৎকার্য্যে উদ্যমের ফল মধুময়,
অসৎকর্ম্মে উৎসাহফল বিষময়"

"রেণু, ও রেণু, ও রেণুকা, বলি আমাদের দুঃখ আর থাকবে না ; আজ দিন চারেক হল আমি এমন একটা লোক যোগাড় করেছি যার 'টিপ' অব্যর্থ ; এ খানসামা নয়, জকির সহিস নয়, এ খোদ মেমসাহেব। আমাদের বিখ্যাত জকি চেরি সাহেবের মেম ; অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর তিনি সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন ; তাঁহার দয়ার শরীর তিনি টাকা পয়সা কিছু গ্রাহ্য করেন না ; জকির মেম তাঁহার টাকার অভাব কি। ঘোড়া খুব জোরে দৌড়ালে টাকাত আসেই, আর সময়মত আস্তে দৌড়ালেও তার চেয়ে বেশী টাকা আসে ; টাকা নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলে ; উঠ্‌তে টাকা, বস্‌তে টাকা, দৌড়ালে টাকা, না দৌড়ালে টাকা , শুলে টাকা, আর বেশী দেরী করে ঘুমাইলেও টাকা। টাকা তাদের চারি পার্শ্বে ঘুরছে, বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, কষ্ট করে হাতটা বাড়িয়ে দিলেই টাকা।

রেণুকণা :—(ঘরে প্রবেশ করিয়া) কি গো নিজের মনেই কি বক্‌ছ ?

শ্যামলাল :—বল্‌ছিলুম কি রেণু এই টাকার বন্দোবস্ত করেছি, আর টাকার অভাব হবে না। টাকা টাকা করে টা টা করছিলুম ; টাকার কাছে ছিলুম, টাকার মাঝখানে ছিলুম, টাকার অতি নিকটে, পার্শ্বে

ছিলুম, টাকা চার পার্শ্বে ঘুর্‌ছিল, তবে ঠিক মন্ত্রটি ততদিন জানতাম না। এই দুঃখ দেখে প্রাণের আবেগে অনেক কথা মুখ দিয়ে বেরুল, তাই সেই আবেগ চাপ্‌তে পারি নি বলে তোমার আসবার আগেই কত কথা বলছিলুম। দেখ, তুমি চেরি সাহেবের নাম শুনেছ?

রেণু:—চেরি, অ্যাঁ চেরি, চেরি, কৈ এ নাম শুনেছি বলে ত মনে পড়ে না, কৈ তা' ত মনে পড়ছে না।

শ্যাম:—চেরি নাম শুন নি? কলিকাতায় থাক, ঘোড়দৌড়ের মাঠের দেড় ক্রোশের ভিতর, ট্রামওয়ে গেলে আধ ঘণ্টা লাগে না; মোটারে গেলে ১৬ মিনিট ৩২ সেকেণ্ডে; তুমি চেরি সাহেবের নাম শুন নি? জকি চেরি, মস্ত—জকি। সে জিতিলে লাট সাহেব পর্য্যন্ত সেক্‌হ্যাণ্ড করে; জজ সাহেবরা পিঠ চাপড়ায়, আমাদের দেশের বড় লোকেরা ছুতা পেলে ধন্য মনে করে, সে চেরিকে জান না?

রেণু:—ওহো হো হো মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। রামায়ণে পড়েছিলুম রাবণ রাজার শান্ত্রি পাহারাদার স্ত্রীলোক, রাক্ষসী চেরী সীতাদেবীকে আট্‌কে রেখেছিল, আর তার প্রতি তাড়না করতো। হ্যাঁ সে যক্ষ, এক রকম বটে, কেননা যক্ষ রাক্ষসের ত একটা ভাগ।

শ্যামলাল:—আমাদের দেশ কখন স্বাধীন হবে না, অজ্ঞতাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। ভদ্রলোকের ঘরের শিক্ষিতা স্ত্রীলোক হয়ে, জকি চেরি নাম শুন নাই? যার নাম প্রত্যেক দিন খবরের কাগজে বেরোয়; যার সাহায্য পেলে কলিকাতার মিণ্ট হাতে পাওয়া যায়, সেই চেরিকে তুমি রাবণ রাজার দাসী করলে; দাসের বামে নাম লিখে লিখে, তোমরা সকলকেই দাস ও দাসী দেখ। তোমাদের পক্ষে দাস-দাসীময় জগৎ। তবে আসল কথাটা শুন; চেরি বলে এক বড় সাহেব আছে, সে ঘোড়দৌড়ে ঘোড়ার উপর চড়ে দৌড়ায়; তারই মেম সাহেব

মেরি, আমার উপর দয়া করে রাজি হয়েছেন; টাকা পয়সা কিছু চান্ না, আর তার টাকার অভাবও নেই, তিনি টিপস্ দিতে রাজি হয়েছেন; আর তার টিপস্ পেলে টাকার অভাব থাকবে না; তাই তোমাকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য দৌড়ে এলাম। প্রথমে মনে করেছিলাম, তোমাকে এ কথাটা এখন বলব না, তোমাদের পেটে কথা থাকে না। তারপর ভাবলাম তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী তোমাকে খবরটা দেওয়া দরকার।

রেণু:—হ্যাঁগা ও পোড়া ঘোড়্দৌড়ের মাঠ্টা ছাড় না, ঐ ঘোড়-দৌড়ের প্রেমে পড়ে মাঠে, ঘাটে, অঘাটে, অলিতে গলিতে, গাছতলায়, ছাঁচতলায়, অনেক জায়গায় ত ঘুরলে; টাকা এই পাও পাও; প্রায় ধর্লে বলে, কিন্তু কখন ত ধর্তে পারলে না। যা কিছু ছিল, এ মরীচিকার পিছনে পিছনে, প্রাণের আকুল পিয়াসা নিয়ে, দৌড়তে দৌড়তে সব গেল, আর কতকাল ঐ মায়াজালের দিকে দৌড়াবে? তোমার ও ঘোড়দৌড় মাঠে, ধনলাভ মায়া মরীচিকার সমান; ওখানে টাকার অস্তিত্ব খালি তোমার মস্তিষ্কের মধ্যেই আছে, কখন কি কাহাকেও দেখেছ, যে ঘোড়দৌড়ে টাকা পেয়েছে?

শ্যামলাল:—অমন কথা বল না, আমি জানি কতকগুলি লোকের, সাহেব ও বাঙ্গালী দুই শ্রেণীরই, চলে খালি ঘোড়দৌড় থেকে; ঘোড়াও ছুট্ছে, তারাও ছুট্ছে। ঘোড়া গড়ের মাঠে ছুট্বে, তারাও গড়ের মাঠে ছুট্বে। ঘোড়া ছুট্ল টালিগঞ্জের মাঠে তারাও ছুট্ল টালিগঞ্জের মাঠে; ঘোড়া ছুট্ল ব্যারাকপুরে তারাও ছুট্ল ব্যারাকপুরে; ঘোড়া ছুট্ল লক্ষ্ণৌ তারা ছুট্ল লক্ষ্ণৌ। যেখানে ঘোড়া সেইখানেই তারা। তারা থাকে ভবানীপুরে, কেননা সেটা গড়ের মাঠের কাছে। রোজ সকালে মাঠে গিয়ে, তারা ঘোড়া দৌড়ান দেখে আসে, আর হাটে, বাজারে, অলিতে

গলিতে, টিপ্‌স নিয়ে আসে; রেণু, তুমি জান না আজকাল জ্যোতিষীরা শুধু ঘোড়ার শুভাশুভ বলে দেয়; কোন্‌টা জিত্‌বে, কোন্‌টা জিত্‌বে না, এই ভবিষ্যৎ বলে; দু একটা জ্যোতিষী এই লাইনে পয়সাও করেছে। তারা অধিকাংশই ফার্ষ্টক্লাস রেলগাড়ী চড়ে, ফার্ষ্টক্লাস হোটেলে থাকে; কিন্তু ফার্ষ্টক্লাস দরজীর কাপড় পরে; টাকা না হলে এসব চলে কোথা থেকে?

রেণু:—আর তার স্ত্রী পুত্রেরা, রেণু আর অসিতের মত অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়। বাড়ীওয়ালার সরকারের তাগাদা সহ্য করে; মুদীর ছোটমুখে কড়া কথা শুনে, আর চাকর চাকরাণীর তাড়না সহ্য করে; তুমি থাম, তোমার আর ও বড়ায়ে কাজ নেই। আজ পাঁচ বৎসর ধরে তোমার মুখে একই কথা শুন্‌ছি, এইবার কপাল ফিরল, আর ভাবনা নেই। তোমার কথা শুনে পাওনাদারদের সঙ্গে ওজে কর্‌লাম দেনা দিব বলে; তুমি ত বাহিরে বাহিরে সদাই ব্যস্ত, পাওনাদারদের জোরজুলুম তাগাদা, সবই সহ্য করতে হয় আমাকে; মার হাতে যা ছিল সবই ত একরকম শেষ হ'ল। আর এমন করে কদিন চলবে? দেখ ক্রমে সকলে আমাদিগকে ত্যাগ করছে; বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, মান ইজ্জত, আত্মমর্য্যাদা, আত্মসম্মান সব আমাদিগকে ছেড়ে গেছে; ছাড়েনি কেবল পুরান মুদী, পুরান বাড়ীওয়ালী আর ঝি চাকর, তাহারাও আর মিথ্যা প্ররোচনায় প্রতারিত হবে না; এমন কি সেই কপট বন্ধু, নষ্ট, দুষ্ট, অমঙ্গলের শনি, হট্টেশ্বর বাবু সেও তোমাকে ছেড়েছে, তুমি তবুও মঙ্গলের সাক্ষাৎ করছ না; তোমার পায়ে ধরি একটা ব্যবসা বাণিজ্য কর; পুরুষ মানুষ, ভগবান এখন শরীরে বল দিয়াছেন, গতর খাটালে আমাদের অভাব কি? আমি অতি নির্লজ্জ, তাই তোমার স্তোকবাক্যে লোকজনকে ছাড়াই নি। আর আমি তাদের রাখব না, আমি ভদ্র ঘরের কন্যা আর ভদ্রলোকের গৃহিণী

আমি আর গরীবদের সঙ্গে প্রতারণা করব না; আমি নিজে সমস্ত গৃহকর্ম্ম করব; চাকর চাকরাণী পাচক সকলকার কাজই আমি নিজে করব, স্বামী পুত্রের জন্য গৃহকর্ম্ম করা কিছু অন্যায় কর্ম্ম নয়, কিছু নিকৃষ্ট কার্য্য নয়, বরং সম্মানের কার্য্য; ভুল করেছিলে, কষ্ট পেলে; আবার ধর্ম্মে মতি দাও, কর্ম্মে আস্থা রাখ, শান্তি ফিরে আসবে।

শ্যামলাল :—আরে দূর ছাই আমি বড় জমিদারঘরের ছেলে, আমি প্রসিদ্ধ জমিদার রামধন ঘোষের পৌত্র। আমার পূর্ব্বপুরুষ চিরকাল লোকশাসন করে এসেছেন, পুরুষ স্ত্রীলোক উভয়েই; আমি স্ত্রীলোকের বক্তৃতা শুনতে এখানে আসি নাই; আর যে হট্টেশ্বরের কথা বল্‌লে সেত সামান্য ঘরের ছেলে। তার বাপ ডাক্তারী করে কিছু পয়সা করেছিল। সে বেটা দলে পড়ে কুসঙ্গে মিশে সব খোয়ালে; ভদ্রলোকের ছেলে মনে করে আশ্রয় দিয়েছিলুম, সে বেটাই আমাকে ঠকালে; বেটা নেমক-হারাম, বেটা নীচ, বেটা কৃতঘ্ন; থাক বেটা, আমার পয়সা কতকগুলা ঠকালে, আমার বরাত ত আর নিতে পারবে না; বেটা এখন গিয়ে নূতন দলে মিশেছে; ওরকম করে আর কদিন চল্‌বে। যাক্‌, বেটা পাপ গেছে; আমার শনি ছেড়ে গেছে।

রেণু :—সে একটা শনি ত ছেড়েছে, এই আর একটা শনি ছাড়লে ত বুঝতে পারি, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠের চার পার্শ্বে দৌড়ান বন্ধ হলে, তবে তোমার অমঙ্গল তোমায় ত্যাগ কর্‌বে।

শ্যামলাল :—দেখ উপায়ের ত একটা অবলম্বন চাই।

রেণু :—ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছাড়া কি আর অবলম্বন নাই?

শ্যামলাল :—সবদিক ভাল করে বিবেচনা করে দেখ্‌লে, আমার এ ছাড়া আর অবলম্বন নাই।

রেণু :—মিথ্যা ভ্রম, প্রলাপ বাক্য। এই সময়ে শ্যামলালের মাতা

সেখানে আসিলেন শ্যামলালের আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন "হ্যাঁরে, বাবা শ্যাম, পাওনাদারেরা এসে আমাদের সব ছেঁকে ধর্‌লে ; তুই বাবা যা হক একটা কিছু কর, আমাদের যে মান ইজ্জৎ সব যায়, শেয়ে কি না খেতে পেয়ে মর্‌ব।"

শ্যামলাল :—মা, ভগবানের রাজত্বে কেউ কখন না খেতে পেয়ে মরে না ; তবে সুখে আর দুঃখে। আর সুখ দুঃখ মানুষের মাথার উপর চক্রের ন্যায় ঘুরছে ; আজ কষ্ট হয়েছে কাল সুখ হবে, সবই ভগবানের ইচ্ছা ; তোমার আশীর্ব্বাদে সবই মঙ্গল হবে।

মা :—বাবা, আমি ত তোমাকে সকল সময়েই আশীর্ব্বাদ করছি তোমার জন্য, ভদ্রলোকের মেয়ে বৌমাটির জন্য, আর এই বংশের তিলক অসিতকুমারের জন্য, তোমাদের কষ্টের সংসার ছেড়ে আমি অন্য পুত্রের সুখের সংসারেও যেতে পার্‌ছি না, ঘোর মায়াতে আবদ্ধ, কর্ত্তব্যের অনুরোধেও বটে ; যাহা হউক বাবা জুয়ার ঝোঁক ছাড়, একটা কাজকর্ম্ম কর, এই কটা প্রাণীর দুঃখ দূর কর।

শ্যামলাল :—মা, এতদিন অনেক সহ্য করেছ, আর দিন কতক অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের সব দুঃখ দূর করিব। দেখ আমাকে আজ ২০০৲ টাকা দাও, আমি এক মুরুব্বি পেয়েছি, তাহাকে কিছু সওগাদ দিতে হবে, অন্ততঃ একটা অল্প স্বল্প দামের সোণার ব্রেসলেট দিতে হবে, এইটে দিলেই একমাসের মধ্যে তোমার বাটীতে সোণার ঢিপি করে দিব।

শ্যামলালের মাসী বালবিধবা, তাহার নিজের ছেলেপুলে কিছু নেই, অথচ হাতে কিছু টাকা আছে, তিনি বাপের বাড়ী থাকেন, মাঝে মাঝে ভগ্নীদের দেখ্‌তে আসেন, তাহার হাতে টাকা আছে, সেই কারণে অনাথা বিধবা হইলেও তাহার প্রতি যত্নের কোন ত্রুটী হয় না ; বাপের বাড়ীতে

তাহার ভাজেরা সকলেই তাহাকে ভক্তি করে, ভয় করে, আর সমভাবে সেবা করে, তিনিও সময় সময় ভ্রাতৃজায়াদের, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের জামা কাপড় সেমিজ জুতা গহনাদি ক্রয় করিয়া দেন; যেখানে যখন সেইখানেই তাঁহার আত্মীয় বা আত্মীয়া ও তাদের পুত্রকন্যাকে কিছু কিছু দিয়া আসেন। কাহাকেও খুব বেশী করিয়া দেন না। কাহাকেও কখন বঞ্চিতও করেন না। তাঁহার দান অল্প অল্প করিয়া একুনে যথেষ্ট আছে, তবে কত টাকা তাহার পুঁজি তাহা কেহ জানে না। সকলেই মনে করে তাঁহার অফুরন্ত টাকা। তাঁহার নাম রাধারাণী। স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতির স্ত্রীলোক, অথচ সময়ে সময়ে খুব কড়া; রাস টানিয়া রাখিতে বেশ জানে; রাধারাণীর অনেকগুলি বোনপো ও বোনঝী, আর তিনি প্রত্যেক বোনপো ও বোনঝীর মাসী, তাঁহার অনেকগুলি ভাইপো ও ভাইঝী আর তিনি প্রত্যেকেরই পিসী; অনেকগুলি ভাইবোন আর তিনি প্রত্যেকেরই দিদি বা ভগ্নী। তাঁহাকে আত্মীয়া বলিয়া প্রচার করিতে প্রত্যেকেই ব্যস্ত; তার উপর তিনি কর্ম্মিষ্ঠা ও শান্তস্বভাবা, কলহ কচকচি একেবারেই ভালবাসেন না; মুখরা একেবারেই নন। তিনি যে গৃহে যান, সেই গৃহে কর্ত্রীর ন্যায় মান যত্ন ও খাতির পান, যে বাটীতে তিনি যখন যান, তাঁহার আগমনে সেই বাটীতে বাহ্যিক শান্তি বিরাজ করে; তাঁহার উপস্থিতি গৃহস্থের সৎশাসনের নিদর্শন। তিনি স্বামিগৃহে যান না সত্য, কিন্তু যেখানেই যান সেইখানেই তাঁহার গৃহ, তিনি সেই গৃহের স্বামিনী। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর আত্মীয়েরা মহাভুল করেন; অল্পবয়স্কা বিধবা দেখিয়া তাঁহার স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব লোপ করিবার প্রয়াস পান; এমন কি তাঁহাকে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিতেও ত্রুটী করেন নাই। হায়! কবে আমাদের দেশে এই নীচ প্রকৃতির লোপ পাইবে; স্বয়ং

ভগবান্ যাহার প্রধান অবলম্বন কাড়িয়া লইয়াছেন, সেই স্বামীর আত্মীয়েরা তাহাকে অন্যান্য অবলম্বন ভ্রষ্ট করিতে ব্যস্ত হয়েন কেন? এই নীচ প্রবৃত্তি কবে লয় পাইবে? যাহা হউক রাধারাণীর পিতা তখন বর্ত্তমান, তিনি আইনের আশ্রয় লইয়া তাঁহার কন্যার প্রাপ্য বৈভব আদায় করিয়া লয়েন; সেই অবধি রাধারাণী তাহার পিতৃগৃহেই বাস করেন; মধ্যে মধ্যে মাতা পিতার আত্মীয় ও আত্মীয়ার বাটীতে যান। যাহারা স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার উপর নির্য্যাতন করিয়াছিল, তাহারাও রাধারাণীর বদান্যতা দেখিয়া তাহাকে অনেকবার নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু রাধারাণী তাহাদের পূর্ব্ব দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। তাহারা অনেকবার চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছিল; রাধারাণী খুব সুচতুরা ছিলেন, তাহার মনের ভাব সতত এইরূপ ছিল:—ভগবান্ তাঁহাকে চির দুঃখিনী করিয়াছেন; স্বামী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, অতএব সে সম্বন্ধে তিনি ব্রহ্মচারিণী; এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব শান্তিতে থাকিতে চেষ্টা করিতেন; তিনি জানিতেন তাহার নিকট ও দূর আত্মীয়ের মধ্যে অনেকে নির্ধন ও গরীব লোক; সাধারণ ভিখারীর ন্যায় প্রকাশ্যে ভিক্ষা করিতে পারেন না; তাহাতে তাহাদের মান সম্ভ্রমের হানি হয়; সেই জন্য তাহারা কষ্টের সময় অশ্রুপাত করিয়া ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করে। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন আমার হস্তের এই অর্থ ভগবানের দান। আমার নিকট ও দূর আত্মীয়গণকে ভগবানের অর্থ কিছু দিই না কেন। অপরের অভাব প্রকৃত কিনা, তাহা আমি জানি না, নিকট আত্মীয় ও আত্মীয়াদের অভাব যেখানে প্রকৃত, তাহা আমি জানি, সেই কারণে যতদূর সম্ভব আমি তাহাদেরই অভাব মোচন করিব; এই মনে করিয়া তিনি অভাবগ্রস্ত দরিদ্র নিকট ও দূর

আত্মীয় ও আত্মীয়াদের বাটী ঘুরিয়া বেড়াইতেন, দেবীর ন্যায় পূজা পাইতেন, আর নগদ অর্থে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনার উপযুক্ত ফল দিতেন; নির্ধনকে অর্থ সাহায্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে শান্তি দিতেন, আর নিজেও শান্তি পাইতেন, তিনিও তাহার নিজের মনের মতন অল্প পরিধি বিশিষ্ট একটী সুখের সংসার প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন, কাযেই তিনি যেখানেই যাইতেন, শান্তি সেইখানেই বিরাজ করিত।

সেই দিন প্রাতঃকালে শ্যামলালের বাটীতে আসিয়াছেন, শ্যামলাল তাহা জানিতেন না, শ্যামলালের মাতা পুত্রের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় রাধারাণী শ্যামলালের আওয়াজ শুনিয়া সেইখানেই আসিলেন। শ্যামলাল রাধারাণীকে দেখিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন আর বলিলেন, "মাসীমা তুমি কবে আসিলে?"

মাসীমা :—এই বাবা সকালে এসেছি। বাবা ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, তোমার সুমতি দিন। তা দিদি শ্যামলাল কিছু কাজ কর্ম্ম কচ্ছে (ভগ্নীর দিকে তাকাইয়া)? শ্যামলাল দেখিল এই সুযোগ; দেরী করিলে সুযোগ চলিয়া যাইতে পারে, মনে করিল, মা যদি আমার জুয়ার কথা বলিয়া দেন, মাসীমা টাকা দিতে রাজি হবেন না। কাযেই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "মাসীমা একটা কাজের যোগাড় হয়েছে, শ'দুই টাকা পুঁজি চাই, আজকেই টাকাটা জমা দিতে হবে, তা হলেই বেশ দুপয়সা আস্‌বে, তুমি আমাদের লক্ষ্মী মাসী, তুমি আমাকে এই দুই শত টাকা দিলেই বিশেষ উপকার হয়।

রাধারাণীঃ—তা বাবা তোর যদি একটা খাবার সংস্থান হয়, আমি দু'শ টাকা দিব, তুই করে, কর্ম্মে খা।

শ্যামলাল :—মাসীমা, তুমি যদি রাগ না কর, একটা কথা বলি,

টাকাটা আজ এখন না পেলে হয় ত সুবিধাটা চলে যাবে; যদি রাগ না কর, তা বলছিলাম কি, টাকাটা এখনি দিলেই সুবিধা হয়।

রাধারাণীঃ—বাবা, যখন আমি দিব বলেছি তা এবেলা ও বেলা কি; এখন দিলেও দিব, আর দুদিন বাদে দিলেও দিব, তা এনে দিচ্ছি; এই বলে বাক্স খুলে টাকা আনতে গেল, ইতিমধ্যে শ্যামলাল মায়ের পা ধরে বল্‌লে, "মা আমি নিশ্চয় বলছি, এই লক্ষ্মী মাসীর টাকা থেকে আমি অনেক টাকা রোজকার কর্‌ব। এ যা কর্‌তে যাচ্ছি, এ জুয়া নয়, এ ব্যবসার চেয়ে ঠিক, স্থির, সুনিশ্চিত আমদানী, এ জমীদারীর খাজনার মত, কোম্পানী কাগজের সুদের মত, এতে কোন সংশয় নাই, সন্দেহ নাই; এ জুয়া একেবারেই নয়, এতে টাকা আস্‌তেই হবে। ইতিমধ্যে মাসীমা আসিয়া তাহার হাতে দুই শত টাকা গণিয়া দিলেন। আর বলিলেন "বাবা এ তোর বিধবা মাসীর টাকা নষ্ট করিস্‌ না, কাজে লাগাস্‌।"

শ্যামলাল ঃ—সেকি, মাসী, তাও কি কখন হয়; তুমি লছ্‌মী, তোমার টাকাও লছ্‌মী, যা কর্‌ব তাতেই উথ্‌লে উঠবে; এই বলিয়া টাকাটী নিজের কাছে রাখিয়া দিল, আহারাদির পর বাটী হইতে চলিয়া গেল, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এত দিনে মা লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন; এবার সংযোগটী বিশেষ সুবিধাজনক; প্রথম চেরির সাহায্য, তারপর লক্ষ্মীমাসীর টাকা, মা লক্ষ্মীকে এতদিনে বেঁধে ফেল্‌লুম, এবার রেণুর, অসিতের, আর মার, যা কিছু নিয়েছি সব শোধ করে দিব; পাওনাদার বেটাদের নাকের উপর টাকা ধরে দিব; ছোটলোক বেটারা, পাজী বেটারা, লক্ষ্মীছাড়া বেটারা; বেটাদের চক্ষুলজ্জা নাই, সময় অসময় নাই, খালি টাকা, টাকা আর টাকা; দেনাদার হলে যেন চোর হতে হয়; একি রে বাপু, না হয় ধারই করেছি, তা হয়েছে কি; চুরি ত করি নাই; আমার যখন ছিল, হট্টেশ্বরকে কত দিয়েছি; যখন টাকা হাতে

ছিল না মায়ের কাছ থেকেও নিয়ে দিয়েছি; কই হট্টেশ্বরের কাছ থেকে আদায় করবার জন্য, খুনীকে ধরবার মতন, তার পিছু পিছু তেড়ে যাই নাই। কিন্তু আমি যাই ধার করেছি, আর দেশশুদ্ধ লোক তেড়ে আসছে। একি রে বাপু। এর মানেটা কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, শ্যামলাল পার্কষ্ট্রীটের ব্রেসলেটওয়ালাদের দোকানের দিকে চলিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

"পচা আদার ঝাল জায়দা"

কামিনীর মৃত্যুর পর হট্টেশ্বর বাটী আসা বন্ধ করিল। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে রাজীবলোচন বন্দোবস্ত করিয়া হট্টেশ্বর ও কামিনী যে বাটীতে থাকিত, তাহার ভাড়ার বক্রী শোধ করিয়া ঐ বাটী হইতে উঠিয়া গেলেন। তিনি সুনীলকে নিজেদের বাটীতে লইয়া আসিলেন; রাজীবলোচন ও কমল এক নূতন জীবন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যা কিছুই ছিল না। রাজীবলোচন এখন উচ্ছৃঙ্খল জীবন পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছেন। এ অবস্থায় সুনীলকে পাইয়া তিনি যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। হট্টেশ্বরের ভ্রাতা বঙ্কেশ্বর ও অন্যান্য নিকট আত্মীয় সুনীলকে দেখিতে আসিল, আর রাজীবলোচন ও কমলের ঐকান্তিকতা দেখিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার মৌখিক প্রস্তাব করিল। শেষে এই সিদ্ধান্ত হইল, সুনীল রাজীবলোচনের কাছেই মানুষ হইবে, এর পরে বড় হইলে তাহারা বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে সংসারী করিয়া দিবে। সকলেই বলিয়া গেল অন্ততঃ সপ্তাহে দুইবার করিয়া তাহারা দেখিয়া যাইবে; আর সুবিধা মত নাবালকের লালন পালন বিষয়ে সাহায্য করিবে। প্রথম প্রথম দুই চারিবার দেখিতে আসিল, কিন্তু তাহার পর আর আসিল না; বলিতে লাগিল রাজীবলোচন ও কমলের উপর তাহাদের অগাধ ও অচল বিশ্বাস, তবে তাহারা বৃথা সময় নষ্ট করিয়া কেন দেখিতে আসিবে? এ সব লোক দেখানর সারবত্তাই বা কি? রাজীবলোচন এখন ভৈরবচাঁদের ষ্টেটের কর্ম্ম

করিতেছেন। রামময়ও সেই ষ্টেটে কার্য্য করে। রাজীবলোচনের আর্থিক কোন কষ্ট নাই, তবে নিজকৃত মানসিক কষ্টের অভাব নাই। লোকের দুঃখ শুনিলেই তাহা মোচন করিতে চেষ্টা করেন, বিপদ শুনিলেই উদ্ধার করিতে যান। কাযেই তাহার কর্ম্মের অভাব একেবারেই নাই; তাহার প্রধান খেয়াল ধনী লোকের ছেলেদের উপর; তাহারা অধঃপাতে যাইতেছে শুনিলেই যতদূর সম্ভব তাহাকে শোধরাইতে চেষ্টা করেন; তাহার ফলে অনেক সময় বিপদে ও কষ্টে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু সে বিপদেও কষ্টেও তাহার সুখ; তিনি অবাধে সেই কষ্ট সহ্য করিতেন; লোকে তাহাকে 'খেয়ালে পুরুষ' বলিয়া মনে করিত। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে রাজীবলোচন ও কমল দিনরাত খাটিয়া সুনীলকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। সুনীল এখন আই, এস্, সি পাশ করিয়া ডাক্তারী পড়িতেছে। ডাক্তারী পাঠও শেষ হইয়া আসিল। কমলের ইচ্ছা সুনীলের বিবাহ দেন। রাজীবের তাহাতে অমত নাই। ক্রমে কন্যা দেখা সুরু হইল; সুনীলের জেঠা বক্কেশ্বরের বিশেষ ইচ্ছা তাহার শ্যালকের কন্যার সহিত সুনীলের বিবাহ দেন; অনেক গুলি বিধেয় কারণে কমলের সে বিবাহে ইচ্ছা ছিল না। কমলের ইচ্ছা, গৃহস্থ ঘরের সুদক্ষা ও সুলক্ষণা কন্যা গৃহে আসিলে সুনীলও সুখী হইবে আর তাহারাও সুখী হইতে পারিবে। তাহাদের নিজেদের সুখ অপেক্ষা সুনীলের সুখের উপর অধিক নজর। প্রকৃত সুনীল রাজীবলোচন ও কমলকেই পিতামাতা বলিয়া জানে; আর সেইরূপ মান্য, ভক্তি ও সেবা করে; মাতাপিতাকে সুখী করিতে পারিলেই সে নিজেকে ধন্য মনে করে; আর বিশেষ আনন্দ পায়। তাহার জেঠামহাশয় ইদানীন্তন মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে আসিত, আর কথার প্রধান মাত্রা

রাজীবলোচন ও কমল সুনীলের জন্মদাতা পিতা, গর্ভধারিণী মাতা নহেন, প্রায়ই বলিতেন "বাবা এইবার তোমাকে লইয়া গিয়া বিবাহাদি দিব। তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, বংশের তিলক, আমার ভদ্রাসন তোমার উপযুক্ত আবাসস্থান। তুমি আমার সংসারেই থাকিবে। তোমার গর্ভধারিণীর মৃত্যুর পর হইতেই তোমাকে আমার বাটীতে লইয়া যাইতাম; তবে কি জান, তোমার পিতা হট্টেশ্বর এক রকমের লোক। জ্ঞাতি শত্রুতা হিসাবে তোমাকে আমাদের বাটীতে লইয়া যাইতে দেয় নাই। যাহা হউক এখন তুমি আমার পিতার পৌত্র। ঢোলের বাটীতে যাওয়া কি ভাল দেখায়, ইহাতে তোমার পিতামহের অপমান করা হয়; আমাদের উচ্চবংশে কালিমা লাগে।

সুনীলের এসব কথা একেবারেই ভাল লাগিত না। সে এ সব কথা একেবারেই পছন্দ করিত না, তাই, সে একদিন এইরূপে বিরক্ত হইলে, মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল "দেখুন জেঠামহাশয়, যাঁহারা আমাকে এতদিন মানুষ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার পিতামাতা, আমি তাঁহার ঔরসজাত ও কমল মাতার গর্ভজাত হই আর নাই হই, তাঁহারাই আমার সব, আমার কাছে তাঁহারা দেবতা, অতএব তাঁহাদের অমতে আমি কোন কাজ করিব না, আর তাঁহাদের ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।"

বক্কেশ্বর ইহা শুনিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন, সেইদিন রাত্রে তাঁহার স্ত্রী শিবানীর কাছে সকল কথা বলিলেন, শেষে বলিলেন, হট্টেশ্বরটা চিরকাল অবাধ্য ও লক্ষ্মীছাড়া; তাহার ছেলে আর কত ভাল হবে? মহা এক-গুঁয়ে; দেখনা মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, পেট গুজরানের উপায় নাই, কোন সুবিধাই নাই, তবে যা বছর খানেকের মধ্যে ডাক্তার হয়ে বেরুবে; তা'ও আজকাল ডাক্তার অলিতে গলিতে। আমি প্রস্তাব করিলাম,

আমার বাটীতে তাহার জন্মদাতা পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাটীতে এনে বিয়ে থা দিব, আর এই সংসারেই রাখ্‌ব, তা তার পছন্দ হইল না। আমার মতলব তোমার ভাইঝিটীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া, আর তাহাকে তোমার কাছে রাখা।

শিবানীঃ—সে কি বল্‌লে? আমার ভাইঝিকে বিবাহ কর্‌তে নারাজ? তাত হবেই, যেমন বাপ, তেমনি বেটা, আর তাদের বংশটাই বা কি? আমার বাপের বাটীর চেয়ে বড় ঘর, ধনে মানে, কুলে শীলে তামাম কলিকাতায় আছে? এই দেখনা তোমারই কথা। তোমরা, তুমি আর তোমার ভাই—একই বাপের ছেলে এক মায়ের গর্ভে জন্মেছিলে, এক স্তন পান করেছ, তোমার ভাই হট্ট লক্ষীছাড়ার ঘরের মেয়ে বিয়ে করলে আর অমনি লক্ষীছাড়া হয়ে গেল। আর তুমি ভাগ্যি আমায় বিয়ে করেছিলে, তাই দশজনের একজন হয়ে সমাজে গণ্যমান্য হয়েছ। প্রথম প্রথম বাবা তোমাদের ঘরে আমাকে দিতে চান নাই তবে তোমার পিতা আমার শ্বশুর, তাঁহার বুদ্ধি ছিল, আমার পিতার কাছে অনেকবার যাতায়াত করে, টাকা পয়সা কম নিয়ে কাজ কর্‌লেন; তাতেও কি আমার মা সহজে রাজি হন? তিনি "বললেন আমার গর্ভের মেয়ে স্বাতি নক্ষত্রের জল। যে ঘরে পড়্‌বে সেই ঘর উথ্‌লে উঠ্‌বে। "আমাদের বংশের মেয়ে আমার ভাইঝিকে সে বিয়ে করতে চায় না? তাহার কপালে সুখ নাই। আমার সাফ কথা, রাগ কর, নাচার। হা ঘরের বংশ। তবে তোমার কথা স্বতন্ত্র, আমায় বিয়ে করে 'গোবর বনে পদ্মফুল'।

বক্কেশ্বরঃ—না সে তোমার ভাইঝিকে বিয়ে করবেনা, এ কথা বলে নি। তবে কি জান তাহার মা ও বাপ অর্থাৎ কমল ও রাজীবলোচন যা বল্‌বেন, সে তাই করবে।

শিবানীঃ—তাই বল, তা না হলে তার এত বড় স্পর্দ্ধা আমার ভাইঝিকে বিয়ে করতে নারাজ। আমি ভাবছিলাম, কলিকাতায় এমন কে আছে, যে আমার বাপের ঘরে কুটুম্বিতা করতে চায় না?

বক্কেশ্বরঃ—ফলে তাই দাঁড়াল। রাজীব বললে সে রামময়ের মেয়ের সঙ্গে সুনীলের বিবাহ দিবে।

শিবানীঃ—তা ঠিক, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। যেমন সেটা পাথর, তেমনি তাহার জহুরী। সে সাঁচ্চা হীরের কদর কি বুঝিবে।

বক্কেশ্বরঃ—তোমার ভাই ছয় হাজার পর্য্যন্ত দিতে রাজি।

শিবানীঃ—দাদার যেমন গ্রহ, তা না হলে তোমাদের ঘরে ছয় হাজার টাকা। আমার বাবা তোমাকে ছয় শত টাকা দিতেও নারাজ ছিলেন; কি বল্‌ব হবার নয়, নইলে দিক না দশ হাজার আমার ছেলেকে? পাত্রাপাত্র ত আছে, পোড়া শাস্ত্রকারদের মতে আমাদের হিন্দুর ঘরে এ বিয়ে বাধে। মুসলমানদের ঘরে কিন্তু সাফ চলে যায়, বলি এ বিষয়ে ডাক্তার গৌর কিছু আইন টাইন করিবেন কি? তাহা হলে পয়সা বাজে যায় না।

কিছুদিন বাদে একদিন বক্কেশ্বর শিবানীর সহিত পরামর্শ করিয়া সুনীলকে শ্যালকের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া খুব যত্ন ও আদর অভ্যর্থনা করিল, কন্যাটীকে সাজাইয়া গোজাইয়া তাহার সম্মুখে আনিয়া দেখাইয়া দিল; শিবানী নিজে নানা প্রকারে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, যে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিতে পারিলে তাহার রঙে দানে জিত। তাহার ভ্রাতার ধন সম্পত্তি, মান ইজ্জতের কথা বুঝাইয়া দিল। অবশেষে বলিল দেখ আমার ভাই বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বরকে জানে সে একদিন গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী হবে না? তা হলে তোমাকে অন্ততঃ মেডিক্যাল

কলেজের বড় সাহেব করে দিবেন; তখন আর তোমায় পায় কে? কিন্তু "ভবী ভুলবার নয়"; সেই এক কথা—তাহার মা বাপ যা বল্‌বে সে তাই কর্‌বে।

পর বৎসর সুনীল ডাক্তারী পাশে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতায় সরকারী চাকরী লইল। আর মাতাপিতার মতানুযায়ী রামময়ের কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিল। বিবাহ রাজীবলোচনের বাটীতে হইল। তাহার পিতা হট্টেশ্বর আসিয়া নান্দিমুখ করিল। স্ত্রী-আচারের জন্য শিবানীকে নিমন্ত্রণ করা হইল; কিন্তু তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, হাঘরের ঘরের মেয়ে আন্‌ছে, তার আবার স্ত্রী-আচার কি? একি আমার ভাইঝির বিয়ে, যে আমি যাব। বক্কেশ্বরও বিবাহের রাত্রে আফিসের কার্য্যের ভিড়ে বিবাহ সভায় আসিতে পারিলেন না। হট্টেশ্বর ছেলের বিয়েতে আনন্দ করিবার জন্য যৎসামান্য পান করিয়াছিল। সে এ সব কথা শুনিয়া রাজীবলোচনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—"ভাই হে! আমার বংশে থাকিলে ছেলেটা মানুষ হইত না। তোমার ঘরে দিয়ে তাহাকে গোত্রান্তর করে দিয়েছি। আমাদের সংসারে থাকলে সে নয় আমার মত, না হয় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বক্কেশ্বরের মত হইত। দুইই সমান, এ পিঠ আর ও পিঠ। কথায় বলে "ভাইয়ের চেয়ে বন্ধু নাই যদি না থাকে বেঁচে।" যাক্ ভায়া এলেন না তা কি করিব? ছেলের বিয়ে হয়ে যাক্; ভগবান্ তাহার মঙ্গল করুন; আমায় নষ্ট কর্‌লে বদ্‌সঙ্গ আর জুয়ায়; আর আমার ভাইকে খেলে আমাদের বৌদিদি। তিনিই হলেন আমার দাদার সোণার কাঠি আর রূপার কাঠি, তার কথায় উঠেন আর তার কথায় বসেন। "ভেড়া কি গাছে ফলে? বে-আক্কেলকেই ভেড়া বলে।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ঘুমায়ে স্বপনে হেরি জীবন কি মধুময়
জাগিয়া চাহিয়া দেখি জীবন কর্ত্তব্যময়।

কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার পর তিন বৎসর ধরিয়া ভৈরবচাঁদ ও তারাবাই নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। অনেক দেখিলেন, অনেক শিখিলেন; যাহা দেখিলেন তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, আনন্দিত হইলেন ও ক্ষুব্ধ হইলেন। তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যেখানে দুটা ভাল লোক সেখানে শতকরা ৯৮টা মেকি; ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া, ধর্ম্মের আচ্ছাদনে মণ্ডিত হইয়া, ধর্ম্মধ্বজীরা বিচরণ করিতেছে, সকলেরই গুরু হইবার সাধ। কেবল শিষ্যের অন্বেষণে ব্যস্ত; যে সময়টা শিষ্যের যোগাড়ে ফিরিতেছে সেই সময়টা যদি নিজের যথার্থ উন্নতির দিকে নিয়োজিত করিত, তাহা হইলে ইহকাল ও পরকালে, দুই কালেই শান্তি পাইত; কিন্তু কথাটা হচ্ছে, কেবল ধর্ম্মের ভাণ; আমাদের এই ধর্ম্মপ্রধান দেশে ধর্ম্মের ভাণে যত মেকি চলিয়া যায়, এত কিছুতেই নয়; ধর্ম্মের ভাণে আহার ঔষধ দুইই হয়। আর শত শত লোকের মস্তক এই ধর্ম্মধ্বজীর পদতলে নত হয়; আজকাল চেলার চেয়ে গুরু সংখ্যায় অনেক অধিক, আর যা দু একজন চেলা আছে, তাহাদের অনেকেই সর্দ্দার পড়ো; গুরু হইতে এক সূতা কম; প্রণাম করিবার আগেই আশীর্ব্বাদ করিতে ব্যস্ত; অনেক তীর্থযাত্রীকে দেখিলেন, যাহারা অল্পদিনের জন্য আসিয়াছেন, তাহাদের ধর্ম্মভাব খুব জাগ্রত, তাহাদের

ধর্ম্মপিপাসা খুব প্রবল। কিন্তু যাহারা অনেক দিন ধরিয়া তীর্থ স্থানে আসিয়া বাস করিয়া আছেন, তাহারা তীর্থ স্থানে ঘোর সংসারী; কেবল তাহাদের সংসারের পরিধি খুব ছোট। একদিন একটী তীর্থস্থানে, এক বৃদ্ধকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা উত্তর পাইলেন, তাহাতে ভৈরবচাঁদ ও তাহার পত্নী তারাবাইয়ের বিশেষ চৈতন্যের উদয় হইল। বৃদ্ধা বলিলেন—"দেখ মা, কালাচাঁদ খুব ভাল; তাহার সেবা ইহকালের ও পরকালের মঙ্গলপ্রদ; কিন্তু মুস্কিল বদনচাঁদকে লইয়া, তীর্থ স্থানেও পেট আছে ত; না খাইয়া তীর্থ স্থানে বাস করা যায় না; কাজেই হয় খরচের বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থ স্থানে আইস, আর না হয় এখানে আসিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা কর; উদর তোমার সঙ্গেই আসিল, তবে তুমি সংসার ছাড়িলে কোথা হইতে? ভগবান্ কালাচাঁদের, শ্রীকৃষ্ণের, সেবা করিতে গেলে আগে বদনচাঁদের অর্থাৎ নিজের সেবার যোগাড় করিতে হইবে। সেই চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, তরকারি, কাট, মসলা সকল দ্রব্যেরই প্রয়োজন; মাথায় একটা আচ্ছাদন, আর শরীরে একটু আরাম চাই। একটা কিছুর কম পড়িলে চলিবে না, তাহার উপর ব্যারাম হইলে ঔষধ চাই, বিছানা চাই, লেপ বালিশ চাদর তোষক সবই চাই; বাদ দিবে কোন্‌টা? তবে সংসার আশ্রমে থাকিলে পাঁচটা লোককে যথার্থ উপযোগী তোমার আয়ের কিছু কিছু বখরা দিতে হইত। তীর্থ স্থানে আসিয়া সেটীর কৃচ্ছ্রতা হয়, তাহা ছাড়া আর কিছু নয়।" তীর্থ স্থানে সংসারত্যাগী পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিলেন; তাহারা কিন্তু বদনচাঁদের সেবার কারণে প্রত্যহ ২।৩ ক্রোশ হাঁটিয়া কোন কর্ম্মী পুরুষের ভাণ্ডার হইতে আহার সংগ্রহ করিতে যান; ফলে কালাচাঁদের প্রেমে যতই আকৃষ্ট হও না কেন, বদনচাঁদকে একেবারে অস্বীকার করিবার বা হাঁকাইয়া দিবার কোন উপায় নাই। দেখিয়া শুনিয়া তিনি মনে মনে

ভাবিতে লাগিলেন, সংসারে থাকিয়া দশজনের উপকার করা যায়, দশজনের আহার যোগান যায়, কিন্তু তীর্থস্থানে ক্রমান্বয়ে বাস করিলে নিজের পেটের জন্য কতকটা সময় অতিবাহিত করিতেই হইবে, অথচ মনুষ্য সমাজের কোন হিতে লাগে না। অন্ততঃ বিশেষ কিছু নয়, এইরূপ মনের অবস্থায় ভৈরবচাঁদ বৈবাহিকের এলাহাবাদ আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কথাচ্ছলে প্রাণের আবেগে বৈবাহিককে সমস্ত মনের কথা বলিলেন। করমচাঁদ শুনিয়া বলিলেন—"বৈবাহিক মহাশয় আমারও সেই মত; সংসার আশ্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এখানে যদি তোমার ভগবানে বিশ্বাস থাকে, আর পরোপকারে মন থাকে, তুমি অনেক আর্ত্তের ও আতুরের উপকার করিতে পার, অনেক নিরন্নকে অন্ন দিতে পার, অনেক কষ্টক্লিষ্টকে শান্তি দিতে পার, বিপন্ন ও অভাবগ্রস্ত লোকের প্রভূত উপকার করিতে পার। তবে আসল কথা, ভগবানে তোমার বিশ্বাস থাকা চাই; বিশ্বাস ও আস্থা মৌখিক নয়। আন্তরিক হওয়া চাই। সংসার আশ্রমে থাকিলেই অন্যায় করিতে হইবে, অধর্ম্ম করিতে হইবে, নতুবা চলে না, এ বিশ্বাস অতীব ভ্রমাত্মক ও মিথ্যাবাদ। ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়া সেটি তোমার নিজের মনের অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। সংসার আশ্রমে থাকিয়াও দেবতা হইতে পার, আর তীর্থস্থানে থাকিয়াও দানব হইতে পার।" দুই বৈবাহিকে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন, এলাহাবাদের ২০ ক্রোশ দূরে এক সাধুর আশ্রম আছে, করমচাঁদ সেই সাধুকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও মান্য করেন, আর গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করেন। কয়েকদিন পরে দুই বৈবাহিকে মিলিয়া সাধুর আশ্রমে যাইলেন; করমচাঁদ সাধুপুরুষের নিকট তাহাদের আগমনের কারণ ব্যাখ্যাত করিলেন।

সাধুবাবাঃ—বাবা, সকল অবস্থায় ও সর্ব্ব সময়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পার।

ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার স্থান অস্থান নাই ; তাহা তোমার নিজের মনের উপর নির্ভর করে। তবে কর্ত্তব্য পালন না করিলে ধর্ম্ম হয় না, আগে তোমার ধার শোধা চাই, পরে তোমার অধিকার বর্ত্তিবে ; দেনা থাকিতে বা দেনা করিয়া দান হয় না।

ভৈরবচাঁদ :—প্রভু, মুক্তি কোন্ পথে ? কি করিলে মুক্তি পাইব।

সাধুবাবা :—মুক্তি কোন পথে! কর্ত্তব্য কার্য্যের সমাধানে মুক্তি ; তুমি কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা করিবে, ধর্ম্মের নামে কর্ম্মত্যাগ করিবে তাহাতে ধর্ম্মার্জ্জন হয় না ; মুক্তি ত নয়ই। কর্ম্মে আন্তরিকতা মুক্তির প্রধান সোপান। কেবল জপ তপে মুক্তি হয় না। মনুষ্যের কর্ত্তব্য অনেকগুলি ; একটী কর্ত্তব্য সমাধান করিয়া, অপর সমস্তগুলিকে অবহেলা করিলে ধর্ম্মার্জ্জন হয় না। কর্ম্মই মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করে। দেখ তুমি মাতাপিতার অনুগ্রহে এ সংসারে আসিয়াছ ; তাহাদের লালনপালন ও যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছ, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ আনন্দ ও অনুরাগের সহিত তোমার ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন ও সহানুভূতিবারিসিঞ্চনে অধিক উন্নতির দিকে তোমার মনোভাব জাগাইয়া দিয়াছেন ; যখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তোমার মাতাপিতার ঋণ ভুলিয়া গিয়া স্থির করিলে তোমার শরীরে শক্তি আছে, ধমনীতে দ্রুতবাহী রক্ত আছে, মনে বল আছে, সে সমস্তই তোমার নিজের নিজস্ব সম্পত্তি ; সে সমস্ত অধিকারের জন্য তুমি কাহারও কাছে ঋণী নও ; তুমি স্বভাবতঃই আপনা হইতে সে সমস্ত পাইয়াছ ; অতএব এই সমস্ত পুঁজি লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পার ; এই মানসিক ধারণাটিই তোমার ভুলের মূল কারণ। তুমি তোমার নিজস্ব সম্পত্তিগুলি লইয়া দেশের কাজ করিবে ; দেশকে ও দশকে তোমার শরীর, মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিবে। তোমার মাতৃ-ঋণ,

পিতৃ-ঋণ, আত্মীয়স্বজনের ঋণ, প্রতিবেশীর ঋণ, স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঋণের কথা একেবারেই স্বীকার করিবে না, কাযেই শোধ করিবে না; তোমার যাহা কিছু আছে, যাহাকে ভাল লাগে দান করিবে, এরূপ করিলে তুমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে। অগ্রে ঋণমুক্ত হও, পরে লম্বা হাতে দান করিও; অন্যের কাছে ঋণ থাকিতে, তৃতীয় ব্যক্তিকে দান করা জুয়াচ্চুরি, প্রতারণার নামান্তর মাত্র। তুমি যখন অন্যের কাছে ঋণী, ঋণ শোধের পূর্ব্বে তোমার নিজস্ব বলিবার কিছুই নাই; তুমি অপরের গচ্ছিত অপহরণ করিয়া দাতা হইবে, ইহা কি শাস্ত্রসঙ্গত না ধর্ম্ম সঙ্গত? কখনই নয়; ইহাকেই বলে "পরের ধনে পোদ্দারি"; ধর্ম্মের ভাণে আত্মচুরি; তোমার জন্মগত কতকগুলি ঋণ আছে—যেমন মাতৃঋণ, পিতৃঋণ ও ভ্রাতৃঋণ। নিজকৃত কতকগুলি ঋণ, যেমন স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য, পুত্রকন্যার প্রতি কর্ত্তব্য। তোমার বৃদ্ধ মাতাপিতাকে একা ফেলিয়া রাখিয়া, অপর আতুরের সেবা করিতে যাইবার অধিকার তোমার নাই; সেরূপ করিলে তুমি অনধিকারের চর্চ্চা করিতেছ; ভাল না করিয়া ভাল'র ভাণ করিতেছ; ধর্ম্মের উপাসনা না করিয়া অধর্ম্মের সেবা করিতেছ। বৃথা আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিতেছ; নিজের ছেলে মেয়েদের অনাথ ও নিরাশ্রয় করিয়া অপর অনাথ ও আতুরের সেবার চেষ্টা আত্মপ্রতারণামাত্র। কর্ত্তব্যপালন না করিয়া সুখী হইবার চেষ্টা মরীচিকাময়।

ভৈরবচাঁদ :—প্রভো! যদি মাতাপিতা দীর্ঘজীবী হয়েন, তবে কি আমার অপর আতুরের সেবার অধিকার হইবে না; অন্য নরনারায়ণের সেবা করিতে পারিব না; ভগবানের কার্য্যে আমার শরীর ও মনকে নিয়োগ করিতে পারিব না।

সাধুবাবা :—কে তোমাকে এ কথা বলিল? কে তোমাকে এগুলি

শিখাইল? ভগবানের কার্য্য কি? ধর্ম্মকার্য্য কি? প্রত্যেক নরনারী ভগবানের অংশ। তাহাদের সেবাই ভগবানের সেবা; ভগবান্ নিরাকার, তাহার সেবা তুমি কেমন করিয়া করিবে। নরনারায়ণের সেবা করিলেই ভগবানের সেবা করা হইল। তোমার কার্য্য নর-নারায়ণের সেবা; তবে জন্মকাল হইতে যতদিন না কার্য্যক্ষম হইয়াছ ততদিন তোমার মাতাপিতা ভাইভগ্নী আত্মীয়স্বজনের যত্নে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছ; তাঁহাদের দয়া, অনুকম্পা ও যত্নে তুমি বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছ। তাঁহাদের কাছে তুমি বিশেষরূপে ঋণী; তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ কর; তাহার পর তোমার যাহা ভাল লাগে, তোমার বিবেক যাহা ভাল ও সৎ বলে তাহা কর। যখন তোমার বৃদ্ধ মাতাপিতা বর্ত্তমান, যখন তাঁহারা আতুর, তাঁহাদিগকে একা ছাড়িয়া দিয়া, তুমি অন্য আতুরের অন্বেষণে বাহির হইবে তাহা ত হইতে পারে না, তাহাতে ধর্ম্মার্জ্জন হয় না, তাহাতে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

করমচাঁদ :—তবে যতদিন মাতাপিতা জীবিত, তাঁহাদের সেবা ব্যতীত অন্য সেবা করিতে পারিব না।

সাধুবাবা :—না আমি তা বলি না। আমি বলি মাতাপিতার সেবা তোমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সেবা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি পার অপর নরনারায়ণের সেবা কর।

করমচাঁদ :—যদি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকে?

সাধুবাবা :—আগে তাঁহাদের লালন পালন, তার পর অন্য কাজ; ভগবান্ জোর করিয়া তোমাকে ছেলেমেয়ের পিতা করেন নাই, তুমি স্বেচ্ছায় সে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছ। তাহাদের ফেলিয়া তুমি অন্য নর-নারায়ণের বা অন্য আর্ত্তের সেবা করিবে ভগবানের তাহা অভিপ্রেত নহে। ভগবান্ সকলকেই একটা করিয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য দিয়াছেন। সেই

কার্য্য প্রথমে করিতে হইবে। তাহা সম্পূর্ণ করিয়া সময় থাকে অন্য সৎকার্য্যে মন দাও, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; বাপুহে, তোমার কেন মনে হয় যে ভগবান্ চান তুমি সন্ন্যাসী হও? এ বিশ্বাসটা কোথা হইতে আসিল? সংসার-আশ্রমে থাকিয়া সদ্‌ভাবে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলে কি ভগবানের আরাধনা করা হয় না। যতদিন তোমার বন্ধন আছে, সংসারে থাকিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন কর। যাহার কোন বন্ধন নাই, অর্থাৎ ভগবানের দেওয়া ও স্বকৃত বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে সে পারে, সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করুক। কর্ম্মস্থান হইতে ভীরুর ন্যায় দৌড়িয়া পলাইলে সন্ন্যাস গ্রহণ হয় না। তুমি দেখ্‌লে মাতাপিতার সেবা, পুত্রকন্যার লালন পালন অনেক আয়াসসাধ্য, সমধিক ক্লেশদায়ক; সে কর্ত্তব্য পালন করিলেও লোকের হাততালি পাওয়া যায় না, সাধারণে বাহবা দেয় না; তাহাদের ছাড়িয়া রাস্তার দুটা আর্ত্তের সেবা করিলে সাধারণ লোকের বাহবা পাওয়া যায়। কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায় না। ভগবান্ তোমাকে একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তুমি সেটা কষ্টসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া, অন্য একটা সৎকার্য্য করিতে যাইবে, তাহাতে তোমার উৎকর্ষ দেখান হয় না; বরং দেখান হয় যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা মানুষের করতালি তুমি অধিক ভালবাস। ভগবানের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা মানুষের জয়ধ্বনি তোমায় অধিক মাতোয়ারা করে।

ভৈরবচাঁদ ঃ—তবে ভগবান্ যাহার সংসারের বন্ধন কাটিয়া দেন নাই, তাহাকে সংসারী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

সাধুবাবা ঃ—নিশ্চয়, তাহাতে কোন ভুল নাই। তুমি ছোট কাজ পার না, বড় কাজে হাত দিতে যাও কেন? "হেলে ধর্‌তে পারনা কেউটে ধর্‌তে যাও কেন?" তাহাতে শুভ ফল ফলিবে না।

ভৈরবচাঁদ :—কেন? আমি যদি সংসার-আশ্রমে থাকিয়া, নির্লিপ্ত-ভাবে ভগবানের আরাধনা করি।

সাধুবাবা :—বাবা, সেত খুব ভাল, সে পথে তুমি ভগবানের নিকট অনেকটা এগিয়ে এলে। তবে সংসার-আশ্রমেও থাকবে আর নিজের বোঝা অপরের মাথায় চাপিয়ে নির্লিপ্তের ভাণ করিবে, তাহাতে ধর্ম্ম হয় না; সেটা ধর্ম্মের ভণ্ডামি, ধর্ম্মধ্বজীর লক্ষণ।

করমচাঁদ :—প্রভো, অধিক বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হইলে তখন কি আর গৃহাশ্রমে মন লাগে? ভগবান্ ত বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তখন আর সংসারে আসক্ত থাকিব কেন?

সাধুবাবা :—কি বাবা, বন্ধন কি শুধু স্ত্রী? ছোট ছোট পুত্রকন্যা কি বন্ধন নয়?

ভৈরবচাঁদ :—গুরুদেব, শাস্ত্রে বলে "পঞ্চাশ উর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"।

সাধুবাবা :—তাহার মানে বুঝিয়াছ কি? তাহার মানে নয় যে, যে রাত্রে তোমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল, তাহার পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি বনের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশনের টিকিট কিনিবে, তাহার পরদিনই বাড়ীওয়ালার দেনা, মুদীর পাওনা, কাপড়ওয়ালার কর্জ্জ, জামাওয়ালার প্রাপ্য, বৃদ্ধ মাতাপিতার ঋণ, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজনের দাবী না বুঝাইয়া দিয়া, সংসার ছাড়িয়া অমনি বনে যাইবে। তুমি গৃহীর কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ না করিয়া, তাহার হিসাব না চুকাইয়া, দেনদার অবস্থায় ইন্‌সল্‌ভেন্সি কোর্টের (Insolvency Courtএর) আশ্রয়ের ন্যায় বনে পলাইবে, তাহা ধর্ম্মসংযুক্ত নয়। প্রথমে গৃহীর কর্ত্তব্য পালন কর, তার পর গৃহাশ্রম হইতে সরিয়া পড়িও। গৃহীর কর্ম্ম শেষ না করিয়া, সংসার-আশ্রমের কর্ত্তব্যপালনের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, উপবনে পলাইয়া যাইবে আর মুখে বলিবে আমি শাস্ত্রবাক্য পালন করিতেছি, তাহা কি

কভু হয় ? বাপুহে ! মানুষের চক্ষে ধূলা দেওয়া অতি সহজ ; তবে ভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামী। অধ্যবসায়হীন অনেক লোক কাজ আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা সব জিনিষ কতক কতক আস্বাদন করিয়া বেড়ায় ; কেবল দেখিতে চায় কোন্‌টা সুবিধাজনক। কোন্‌টায় সস্তার কিস্তীতে পাটনা যাত্রা হয়। কোনও কার্য্যের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, অথচ নানা কার্য্যে ঠোকর মারিয়া, নানা ফুলের মধু খাইয়া সুনাম অর্জ্জন করিতে চায়।

ভৈরবচাঁদ :—গুরুদেব, তবে আমি কি করিব ?

সাধুবাবা :—করবে আর কি ? কর্ম্ম করিবে, নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে। যেটা ধরিবে সেটা সম্পূর্ণ করিবে, পাঁচ ফুলের মধু খাইতে যাইও না। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যপালন করিতে না পারিলে, তাহার ফললাভের অধিকার তোমার নাই। সুচারুরূপে একটী কার্য্য সমাধা কর, তবেই তুমি সেই কার্য্যের ফলভোগী হবার উপযুক্ত, নতুবা নয় ; মনে থাকে যেন, যেমন বীজ পুঁতিবে তেমনি ফলভোগ করিবে। নিম পুঁতিয়া আম্রফল পাইবে না ; সেওড়া গাছে দাড়িম্ব জন্মে না। নিজকৃত কর্ম্মের ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তাহা হইতে উদ্ধার তোমার নাই। পরম করুণাময় পরমেশ্বরও তোমাকে তোমার কর্ম্মফল হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না ; তাহার কারণ, তিনি কর্ম্মফল-নিয়মের প্রবর্ত্তক। তিনি নিয়ম করিয়া তোমার জন্যই হউক, বা অপরের জন্যই হউক, তাহার ব্যতিক্রম করিবেন না। তুমি তাসের ফাঁসভাঁজে মানুষকে ঠকাইতে পার, ভগবানকে নয়। তিনি সর্ব্বান্তর্যামী, তাঁহাকে ঠকাইতে পারিবে না।

করমচাঁদ :—গুরুদেব, আমাকে মাফ করিবেন, আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমি কর্ম্মফলবন্ধনে বাধ্য, তবে ভগবানের

করুণা কোথায়? কর্ম্মফল সকল স্থান অধিকার করিলে; তবে ভগবানের দয়ার কি স্থান নাই?

সাধুবাবা :—তুমি তোমার কর্ম্মফলের ক্রীতদাস; তোমার কর্ম্মের ফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে, তাহা হইতে পরিত্রাণ নাই। তবে কি জান, পরম করুণাময় ভগবান্ তোমাকে সময় দেন; একেবারেই হিসাব নিকাশ দিতে ডাকেন না। তাঁহার নিকট সময় পাইয়াই তুমি দুষ্কর্ম্মের পর সুকর্ম্ম করিবার অবসর পাও। জমার দিকে বাড়াইবার সময় পাও; তাই যখন হিসাব নিকাশের সময় আসে, তখন জমার দিকে ভারী করিতে পার, সময় পাইয়া অনেক সৎকার্য্য করিতে সক্ষম হও। ইহা করুণাময়ের কম করুণার কথা নয়। তাহা না হইলে তুমি বলিতে চাও কি তুমি জীবনে কখন কর্ত্তব্য পালন করিবে না? ভীরুর ন্যায় কর্ত্তব্যপথ ছাড়িয়া পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে? আর ধর্ম্মের ভাণ করিয়া টিয়া পাখীর ন্যায় দুইটী শাস্ত্রকথা আওড়াইয়া মোক্ষ পাইবে? ইহা কখন হইতে পারে না।

ভৈরবচাঁদ :—গুরুদেব, তবে সন্ন্যাসধর্ম্ম কি কিছুই নয়? যিনি সংসারত্যাগী, তাহার কর্ম্ম কি কিছুই নাই? তবে কি তিনি ভগবানের রাজত্বে একজন মহাপুরুষ নন?

সাধুবাবা :—বৎস, কে বলিল সন্ন্যাসধর্ম্ম কিছুই নয়? সন্ন্যাসধর্ম্ম মহাধর্ম্ম; তবে ছাই মাখিলে, গেরুয়া পরিলে আর চিম্‌টা লইলে সন্ন্যাসী হয় না। গেরুয়া, ভস্ম ও চিমটা সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহার্য্য বস্তু, তাঁহাদিগের শ্রেণীর বাহ্য লক্ষণমাত্র; তা ছাড়া এ গুলির কোন বিশেষত্ব নাই। ঘোর সংসারী ভণ্ডচূড়ামণি কপট গুরুও, প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম্মের অধিকারী না হইলেও ত এই সব জিনিষ ব্যবহার করিতে পারে। স্বেচ্ছায়, ভগবদিচ্ছায় বা অবস্থানির্ব্বিশেষে যখন তোমার সংসারবন্ধন কাটিয়াছে, তখন তুমি ইচ্ছা ও

চেষ্টা করিলে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের অধিকারী, তখন তুমি কেবলমাত্র আপন পরিবারবর্গ ও আত্মীয়বন্ধুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ না করিয়া প্রত্যেক নরনারায়ণের, প্রত্যেক জীবজন্তুর মঙ্গলকামনায় নিজেকে নিয়োজিত করিতে পার। তখন তোমার কার্য্যের গণ্ডী কেবলমাত্র আত্মীয় স্বজনকে বেষ্টন না করিয়া পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তুকে পরিক্রমণ করিবে; অর্থাৎ গণ্ডীর পরিধি ক্ষুদ্র না হইয়া বৃহৎ হইবে। সন্ন্যাসী হইলে তোমার কর্ম্ম কমিল না। তোমাকে ভগবানের আরাধনা করিতে হইবে, আর সেই সঙ্গে তাঁহার সৃষ্ট জীবের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে।

ভৈরবচাঁদ :—গুরুদেব, তাহা হইলে কর্ম্মের পরিধি হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইল।

সাধুবাবা :—নিশ্চয়। তাহা না হইলে সন্ন্যাসধর্ম্ম কি ছেলেখেলা? গেরুয়া পরিয়া, ছাই মাখিয়া, চিমটা লইয়া পরের উপর নিজের খোরাক পোষাকের ভার দিয়া, কেবল ঘুরিয়া বেড়ান, তাহা কখনই নয়; তাহা হইলে নিজেকে সন্ন্যাসী না বলিয়া ভ্রমণকারী বল, পরিব্রাজক বল। নিজে খাটিয়া খাইবার ক্লেশ স্বীকার করিবে না, সেই ভার পরের হস্তে দিবে, আর মনের আবেগে ঘুরিয়া বেড়াইবে; ইহা সন্ন্যাস ধর্ম্মের লক্ষণ নয়।

ভৈরবচাঁদ :—প্রভো, আমি একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না, আমি যদি পর্ব্বতগুহায় কিম্বা ঘোর অরণ্যমধ্যে সাধনা করিতে থাকি, যদি জনশূন্য স্থানে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হই, তবে লোক সমাজে হিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিব কেমন করিয়া?

সাধুবাবা :—বৎস, যদি তুমি নিজের আত্মার উন্নতিতে ব্যস্ত থাক, জনসমাজের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখ, সে অবস্থায় মানবমণ্ডলীর সাক্ষাতের কোন সুযোগ রহিল না, আর তাহাদের হিতকর কর্ম্ম করিবার

সুবিধাও রহিল না। এ অবস্থায় স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু মনে থাকে তুমি ভগবানের সৃষ্ট জীব, সুবিধা পাইলেই ভগবানের অন্য সৃষ্ট জীব—তোমার ভ্রাতাভগ্নীদের মঙ্গল কামনায় নিজেকে নিয়োজিত করিতে বাধ্য; সে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা না করিলে তুমি কর্ত্তব্যচ্যুত হইবে; মনে থাকে তুমি অপরের সাহায্য গ্রহণ করিবে, আর অন্যকে সাহায্য করিবে না, ইহা অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক; অতি নীচ, অতি দায়িত্বহীন। একজন জীবের নিকট হইতে সাহায্য পাইলেই, অপর সকল জীবের কাছে তুমি সেই সাহায্যের জন্য ঋণী; মনে থাকে ভগবান্ সর্ব্বজীবের স্রষ্টা ও পাতা; জীবসমুদয় তাঁহারই অভিব্যক্তি ও আবির্ভাব; দান তোমার ধর্ম্ম, কিন্তু ঋণ শোধ করিতে তুমি বাধ্য ও দায়ী, তাহা না হইলে ভগবানের সৃষ্ট চাল, কলা, ছানা, সন্দেশ, পাঁটা, ভেড়া অর্ঘ্য দিয়া ভগবানের উদ্দেশে পূজা দিয়া মুক্তি পাইতে পার না। তোমার কর্ম্মই তোমার একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। কর্ম্ম কর, উদ্ধার পাইবে, নতুবা ভেল্কীবাজিতে উদ্ধার নাই। ভোজ বাজীতে লোক ঠকাইতে পার, মুক্তি পাইতে পার না।

ভৈরবচাঁদ :—প্রভো, তবে আমার উপায় ?

সাধুবাবা :—শোন, বৎস, তুমি ফের সংসার আশ্রমে ফিরিয়া যাও; ভগবান্ তোমাকে ধন দিয়াছেন, সম্পদ্ দিয়াছেন, ক্ষমতা দিয়াছেন, সুবিধা দিয়াছেন, মনুষ্যমাত্রের উপকারের জন্য। সে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া কেবল যেটী তোমার ভাল লাগিবে সেইটী করিবে, তাহাতে চলিবে না; তোমার এই সমস্ত সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য অধিকারের তাচ্ছিল্য ব্যবহারে, তুমি দেখাইতেছ ভগবান্ তোমাকে অযাচিতভাবে এতগুলি সুবিধা দিয়া অপাত্রে দান করিয়াছেন। অধিকারের অপব্যবহার করিলে নিজেকে ভগবানের দয়ার অনুপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়। যাও বৎস,

নারায়ণ তোমাকে এত সুবিধা দিয়াছেন সেই সুবিধার সদ্ব্যবহার কর। গৃহাশ্রমে ফিরিয়া যাও; নিজের সংসার দেখ, আর যতদূর সম্ভব নরনারায়ণের সেবা কর। সংসারআশ্রমে তোমার কার্য্যক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তৃত। তোমার কার্য্যগুলি সুচারুরূপে করিতে পারিলে, যিনি তোমাকে এতগুলি সুবিধা দিয়াছেন, সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বরের কাছে তুমি হিসাব শোধ করিতে পারিবে। মনুষ্যসমাজের কাছে তোমার জন্মজন্মান্তরীণ যে ঋণ আছে, কর্ম্ম করিয়া সেই ঋণ ক্ষয় কর, ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা কর। কর্ম্ম মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম ও মুক্তির সোপান; কর্ম্ম করিয়া মুক্তি লাভ কর। তুমি তোমার কর্ম্ম কর, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন। কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন কর, ধর্ম্ম তোমায় মুক্তি আনিয়া দিবে।

সাধুপুরুষের সহিত আলাপের পর ভৈরবচাঁদের চিন্তা অন্য দিকে ধাবিত হইল; তিনি সেই দিনই গৃহাশ্রমে ফিরিয়া আসিবার মনস্থ করিলেন। তারাবাইকে সাধুপুরুষের তর্ক ও যুক্তির কথা সমস্ত বলিলেন; নিজের মনের ভাব তাহাকে বিশেষ করিয়া জানাইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে হইতেই মুনিম্‌জির নিকট হইতে হরেকচাঁদের সুমতির কথা শুনিয়াছিলেন। হরেকচাঁদও কয়েকবার তাঁহাকে চিঠিপত্র দিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিতে আসিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু ভৈরবচাঁদ বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যে হরেকচাঁদ তাহার উদ্দেশে যেন না আসে, আসিলে সাক্ষাৎ হইবে না; সময় হইলে তিনি আপনিই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। পাছে হরেকচাঁদ তাঁহার কাছে আসে, সেই জন্য ভৈরবচাঁদ যে কয়খানি চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে ঠিকানা দিতেন না, তবে বলিয়া দিতেন, ইচ্ছা করিলে অমুক স্থানের পোষ্ট মাষ্টারের ঠিকানায় চিঠি পাঠাইতে পারে, যখন তিনি সেই স্থানে আসিবেন পত্রগ্রহণ করিবেন, না হয় তিনি লোক মারফৎ আনাইয়া লইবেন। তিনি তাহার ষ্টেটে

রাজীবলোচন ও রামময়ের নিয়োগের কথাও শুনিয়াছিলেন। মুনিম্‌জি সে বিষয় একবার লিখিয়াছিল। করমচাঁদও জামাতাকে সমস্ত সমাচার চিঠির দ্বারা জানাইয়া লিখিয়াছিলেন। হরেকচাঁদ ও তাঁহার কন্যা পেয়ারীবাই সত্বর যেন এলাহাবাদধামে আসেন। তিনদিনের মধ্যে হরেকচাঁদও পেয়ারীবাই এলাহাবাদে আসিলেন, অন্য অন্য লোকজনও সঙ্গে আসিল, মুনিমজি ও রাজীবলোচনও সঙ্গে আসিল, রামময় কলিকাতায় রহিল।

পরবর্ত্তী তিনদিনের পর ভৈরবচাঁদ, তারাবাই, হরেকচাঁদ, পেয়ারীবাই, মুনিম্‌জি, রাজীবলোচন কলিকাতায় আসিলেন। হরেকচাঁদের দুই পুত্র, শোভাচাঁদ ও তিলকচাঁদ, তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহারা দাদা-মহাশয়কে পাইয়া একেবারে আনন্দে আটখানা। তিন দিন এলাহাবাদে বাসের সময় তাহারা অধিকাংশ ক্ষণই দাদুর ও দিদির কাছে থাকিত; বলিত "দাদু তোমায় এইবার পেয়েছি, আর ছাড়িব না, কখনই না"; দাদা ও দিদি কেবল আনন্দাশ্রুপাত করিতেন, আর নাতি দুটীকে কোলে চাপিয়া ধরিতেন। বাটীর অন্যান্য লোক তাহা দেখিয়া আর তাহাদের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিত না। দুই নাতির মধ্যে এর ভিতরেই ভাগ বখরা হইয়া গেল, জ্যেষ্ঠ শোভাচাঁদ ভৈরবকে অধিকার করিল, আর কনিষ্ঠ তিলকচাঁদ দিদি তারাবাইকে দখল করিয়া লইল।

শোভাচাঁদ :—দাদাভাই, তুমি আমার বখরায়, তুমি দিদির সহিত কথা কহিতে পারিবে না।

ভৈরবচাঁদ :—কেন ভাই ?

শোভাচাঁদ :—তাহা হইলে সেই সময় আমি কাহার সহিত কথা কহিব ?

তিলকচাঁদ :—দিদি, তুমি দাদুর সহিত গল্প করিতে পারিবে না।

তারাবাই :—কেন ভাই ?

তিলকচাঁদ :—ততক্ষণ আমি কার সঙ্গে কথা কহিব ? রাত্রে ভৈরব চাঁদ ও শোভাচাঁদ এক বিছানায় শুইতেন, আর তারাবাই ও তিলকচাঁদ একত্র শয়ন করিতেন।

এখন চাঁদ পরিবারের আনন্দের আর সীমা নাই। হরেকচাঁদ মাতা পিতার ও পুত্রদের মাঝে পড়িয়া ঠিক সোজা হইয়া আছে, কোন দিকে এঁকিবার বেঁকিবার উপায় নাই, তাহার আজ আনন্দের সীমা নাই। তিনি ও পেয়ারীবাই মর্ত্তে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া ভৈরবচাঁদ বিষয়াদি আর নিজের হাতে লইলেন না। সমস্তই হরেকচাঁদের হাতে ছাড়িয়া দিলেন ; তাহাকে সাহায্য করে মুনিম্‌জি আর রাজীবলোচন ; পেয়ারী এখন প্রকৃতপক্ষে হরেকচাঁদের অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী। হরেকচাঁদ পেয়রীকে না বলিয়া বা তাহার মত না লইয়া কোন কার্য্য করেন না। তিনি বলেন "পেয়ারী আমার ডান হাত" ; পেয়ারী এখন পরিহাসছলেও হরেকচাঁদের পূর্ব্ব দুষ্কৃতির কথা তোলে না, সে সব কথা এখন পাঁকে পোঁতা, কেহই তাহা খুঁড়িয়া বাহির করে না। তবে মাঝে মাঝে হরেকচাঁদ মনে করিত কাহার অভিশাপে তাহার পূর্ব্ব দুর্ম্মতি হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর পরে ভৈরবচাঁদ যাদবপুরে একখণ্ড প্রকাণ্ড জমি লইয়া দুইটী অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। করমচাঁদের কথামত একখানিতে হিন্দু বিধবা-আশ্রম, আর অপরখানিতে হিন্দু বিপত্নীক-আশ্রম। দুই আশ্রমেরই কার্য্য প্রত্যহ নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ; তবে এ বিষয়ে রাজীবলোচন ও মুনিম্‌জি তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিত ; তাহাদের মধ্যে একজন না একজন প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গে যাইত। সুনীল এখন ডাক্তার হইয়াছেন, তিনি এই আশ্রমদ্বয়ের অন্তর্ভুক্তদের চিকিৎসা করিতেন। সে

কার্য্যে তাহার বিশেষ আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা ছিল। করমচাঁদ এখন ঘন ঘন তাহার কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, বৈবাহিক ও বৈবাহিকপত্নীকে দেখিতে আসেন, আসিলেই আশ্রমদ্বয়ের পরিদর্শনে যান, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সে দুটীর তত্ত্বাবধান করেন। তিনি কলিকাতায় আসিলেই অন্ততঃ দুইদিন বিপত্নীক-আশ্রমে বাস করিয়া যাইতেন। ভৈরবচাঁদ, তারাবাই, ও তাহার পরিবারবর্গের আর সুখের অবধি নাই। ভৈরব-চাঁদ ও তারাবাই ধর্ম্মকার্য্যে যথেষ্ট ব্যয় করিতে লাগিলেন; যে ব্যক্তির যথার্থ অভাব, সে কখনও তাঁহাদের নিকট বিমুখ হইত না। যতদূর সাধ্য অর্থ ও মিষ্টভাষায় সকল আবেদনকারীকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতেন। প্রত্যেক প্রার্থীই ম্লানমুখে তাহাদের কাছে আসিয়া হাসিমুখে ফিরিয়া যাইত। পুরুষ প্রার্থীদের ভার লইয়াছিল ভৈরবচাঁদ নিজে, আর স্ত্রীলোক প্রার্থীদের ভার লইয়াছিলেন তারাবাই। ক্রমে ভৈরবচাঁদ ও তারাবাইয়ের যশের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া গেল। আর্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্তের আশীর্ব্বাদে তাহাদের ভবন মুখরিত হইতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুখী-পরিবার

রাজীবলোচন :—দাদু, পাকাচুলের সঙ্গে কাঁচাচুল কগাছা ছিড়্‌লে দেখি।

সত্যবতী :—ওরে অনিল, তুই যে দাদুর মাথার চুল আর রাখ্‌বি না, সব তুলে ফেল্‌বি একগাছা পাকা চুলের সঙ্গে দুগাছা কাঁচা চুল তুলছিস্?

অনিল :—না মা, আমি পাকা চুলই তুলছি ; কি বল দাদু? (অনিল ও অমিয় সুনীলের পুত্রদ্বয়)।

রাজীবলোচন :—তোল্ ভাই, তোর যা ইচ্ছা।

অমিয় :—দিদি, আমি তোমার পাকাচুল তুল্‌ব।

কমল :—না ভাই, আমার পাকাচুল তুলতে হবে না, যদি পার ত কাঁচা চুল তুলে দাও ; তোমার দাদুর ছেলেমানুষ হবার ইচ্ছে আছে, সে পাকা-চুল তোলাক্, আমি বুড়া হয়েছি আমার সাদা চুলে সিঁদুরেতে বেশী বাহার ; কি বল কর্ত্তা।

সত্যবতী :—বাবার বয়স কি? মা তুমি ত বাবার চেয়ে ক'বৎসরের ছোট, চুল পাকলেই কি বুড়ো হয়?

রাজীবলোচন :—না মা তোমার বাবার আর ও বয়স কি? মনে করলে তোমার আর একটা মা আন্‌তে পারে।

রাজীবলোচন :—তোমার চেয়ে ভাল কনে আর একটা যদি পাই ত ফের বিয়ে করতে রাজি আছি। বৌমা যদি একটা দিদি এনে

দেন, তা হলে না হয় বিয়ে করতে রাজি আছি। দেখ বৌমা, তোমার কর্ত্তাবাবা কদিন আসেন নি; কোন অসুখ বিসুখ হয়নি ত?

কমল:—তাইত হটুবাবু ক'দিন আসেন নাই ত বটে, আমি বলছিলাম কি, হটুবাবু এইখানেই থাকুননা কেন, তার অন্য জায়গায় থাকিবার প্রয়োজন কি?

অনিল ও অমিয়:—হা! হা! তাহলে খুব মজা হবে, আমাদের দুজন দাদুই এখানে থাকিবে, আমাদের খুব মজা, কি বল দিদি?

এইরূপ কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময় হট্টেশ্বর কতকগুলি লজেন্‌জেস্‌, লকেট ফল ও বৈঁচিকাটি লইয়া হাজির। কয়টা লজেনজেস, লকেটফল ও একটা বৈঁচির কাটী অনিলকে আর ঐরূপ আর একটী ভাগ অমিয়কে দিলেন। বাকিগুলি সত্যবতীর হাতে দিয়া বলিলেন "মা তুলে রেখে দাও, এরপর দাদুদের দিও।"

অনিল:—কর্ত্তাদাদু বেশ মজা হবে, তুমি রোজ রোজ এখানে থাকবে আমি তোমার পাকা চুল তুলে দিব।

অমিয়:—কর্ত্তাদাদু, কেমন মজা, কেমন মজা বলিয়া ঝাঁপিয়ে তাহার কোলে উঠিল।

সত্যবতী:—কর্ত্তাবাবা, বাবা ও মা দুজনেই বল্‌ছিলেন, আপনি এইখানেই থাকুন।

হট্টেশ্বর:—(আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে) না মা, অতসুখ আমার সহিবে না, তোমাদের দূরে রেখে ও দেখে আমার যা আনন্দ, তাহাই আশাতীত; এর চেয়ে বেশী সুখ হলে, আমি আহ্লাদে ফেটে মরে যাব।

অনিল:—ও কর্ত্তাদাদু, আমাদের কর্ত্তাদিদিও তা'হলে এখানে এসে থাক্‌বেন ত?

হট্টেশ্বর :—ভাই, তোমার কর্ত্তাদিদি (আকাশের দিকে দেখাইয়া) ঐ উপরে আছেন, তিনি সেইখান থেকে সব দেখ্‌ছেন আর তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন।

অমিয় :—কর্ত্তা দাদু, কত দূরে ?

হট্টেশ্বর :—অনেক দূরে।

অনিল :—তা দূর হ'ক, যতদূর হউক, বাবার মোটরে করে গিয়ে তাকে নিয়ে আস্‌ব। বাবা যাবে, মা যাবে, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।

হট্টেশ্বর :—না দাদা, তোমরা এইখানেই থাক, সময় হলে আমি তার কাছে যাব, সে আমার জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছে। হিন্দুর মেয়ে কি না, আমি তাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছি, তবু আমাকে সে ভোলেনি, আমাকে ছাড়েনি, দুদিন আগে গেছে, কিন্তু আমার জন্য পথ চেয়ে আছে।

অমিয় :—তবে আমরা সবাই তাকে আন্‌তে যাব।

(এই সময় সুনীল আসিয়া উপস্থিত।)

কমল :—দেখ বাবা সুনীল, আমরা ঠিক করেছি হট্টেশ্বর বাবু এই বাটীতে আসিয়া বাস কর্‌বেন, আর আমাদের ঐ ওপার্শ্বের ঘরেতে থাক্‌বেন। আর বৌমা যেমন তোমার বাবার পূজা আহ্নিকের জায়গা করে দেয়, এখন থেকে দুটী করে স্থান করে দেবে, তোমার বাপের আর কর্ত্তাবাপের। এতদিন বৌমার তিনটী ছেলে ছিল, অনিল, অমিয় আর তোমার বাপ, আজ থেকে চারিটী ছেলে হইল। চতুর্থটী হট্টেশ্বর বাবু ; কি বল বৌমা, চারটীর ভার নিতে পার্‌বে ত ?

সুনীল :—তা হলে ত খুব ভাল হয় ; আর ক্রমেই তাঁর বয়স হচ্ছে, এখন সেবার বিশেষ প্রয়োজন।

হট্টেশ্বর :—বাবা, আমার কি অত সুখ সহিবে ? আমার কপাল পোড়া, যাহাতে হাত দিয়েছি সেইটিই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আমার দৃষ্টি

শনির দৃষ্টি ; তোমাকে তোমার মা-বাপ নিয়ে এসেছিল বলে ভগবান্ তোমার মঙ্গল করেছেন ; আমি আর সংসারী হতে চাই না, আমি যে ফকীর সেই ফকীরই থাকব।

অমিয় :—না দাদু আমরা তোমাকে ছাড়ব না।

অনিল :—দাদু, তুমি কেমন করে যাবে দেখি।

সুনীল :—বাবা, যদি আপনি এখানে না আসেন, আমরা মনে বড় দাগা পাব।

সকলকার আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা দেখিয়া হট্টেশ্বর রাজি হইল ও সেই দিন থেকেই রাজীবলোচনের বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা সুনীল ডাক্তারের বাটী ; কিন্তু সুনীল ও সত্যবতী এই বাটী রাজীবলোচন ও কমলার বাটী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিল।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সত্যবতী, রাজীব আর হট্টেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকে। তাঁহাদের সেবার জন্য লোকজন নিযুক্ত আছে, কিন্তু কতকগুলি কাজ সত্যবতী নিজহস্তে করে। বাকিগুলি নিজের তত্ত্বাবধানে করাইয়া লয়। পূজার আয়োজন নিজ হাতে করিয়া দেয়। আহারের সময় নিজে বসিয়া আহার করায়। তাহাদের পাঠের জন্য ঘরটী ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলি নিজে গুছাইয়া রাখিয়া দেয়। নিজে বসিয়া ভোজন করায় আর বিছানাটীও নিজের নজরের সামনে পাতাইয়া লয় ; তাহারা শুইলে নিজে মশারিটি গুঁজিয়া দিয়া যায়। দিনের মধ্যে দশবার করিয়া তাঁহাদের তত্ত্ব লয়। প্রেমময় প্রায় সে বাটীতে আসেন, আর সময়ে সময়ে, তিন বৃদ্ধে একসঙ্গে বসিয়া কথোপকথন ও আনন্দ উপভোগ করেন। হট্টেশ্বর প্রায় বলিতেন, "রাজীব দাদা তুমি আমাদের এত সুখে রেখেছ যে আমার কামিনী

জন্য অপেক্ষা করছেন, তাও সময়ে সময়ে ভুলে যাই আমি

রা হয়েছি ; ভগবান্ কি আমার এত সুখ রাখবেন।"

রামময় :—আরে, ভায়া, শুনেছ বক্কেশ্বর এখন স্ত্রী পুত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত; তোমার বউদিদি বক্কেশ্বরকে একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, তাহার ছেলেও মায়ের বেটা, পিতাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। বক্কেশ্বর প্রায়ই বলে "আমি আমার নিজের বাটীতে পেটভাতার সরকার; বাটীর সরকার কাজ করে, তাহার জন্য বেতন পায়; কিন্তু আমি তাহাও পাই না। দুবেলা দুমুঠো খেতে পাই; তা কুকুর শেয়ালেও তাহা পায়। যদি আমি আজ মরি, তাহা হইলে তাহারা বাঁচে, তবে হয়ত দুঃখ করবে, কেননা একটা বিনা বেতনের লোক চলে যাবে বলে।

হট্টেশ্বর :—তা ভাই ও সব কথা যাক্, দাদা আমার বৌদিদির তাড়নায় জর্জ্জরিত; হাজার হউক মার পেটের ভাই, শুন্‌লে দুঃখ হয়; তবে উপায় কি?

রাজীবলোচন :—সুনীল যে মাঝে মাঝে তাহার তত্ত্ব লয় ও গোপেনের সাহায্য করে।

হট্টেশ্বর :—আঃ! শুনেও সুখ। ভগবান্ তাহার মঙ্গল করুন।

গ্রন্থকার লিখিত পুস্তকদ্বয় সম্বন্ধে সংবাদ-পত্র ও মাসিক-পত্রিকার মতামত

১। ভোলানাথের ভুল

(সামাজিক উপন্যাস)

ধর্ম্মহীন শিক্ষার বিষময় পরিণাম এই গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে—মূল্য ২৲।

* * * মোট কথা ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে দেশময় এই যে নাস্তিক্য ভাবের প্রাবল্য হইয়াছে, যাহার ফলে লোকে ইহকাল সর্ব্বস্ব ও টাকাসর্ব্বস্ব হইয়া অসুরে পরিণত হইতেছে, তাহারই নিখুঁৎ প্রত্যক্ষ চিত্র তারকবাবু অতি মুন্সিখানার সহিত এই গ্রন্থে চিত্রিত করিয়াছেন। * * * বঙ্গবাসী।

* * * ইহাকে একাধারে উপন্যাস, ডিটেকটিভের গল্প ও নীতি-পুস্তক বলিতে পারা যায়। পুস্তকখানি সময়োপাযাগী ও চিত্তাকর্ষক। * * * হিতবাদী।

* * * অনেকদিন পরে একখানা মৌলিক উপন্যাস পাঠ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিলাম। ইহা অনুবাদ নহে, ছায়া অবলম্বনে লিখিত নহে, কায়া অবলম্বনে সাজান ফুলের সাজী নহে, ইহা দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার ফল। * * * নায়ক।

* * * তিনি (গ্রন্থকার) যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে যেমন আমোদ পাওয়া যায়—তেমনই সুশিক্ষাও লাভ করা যায়। * * * দৈনিক বসুমতী।

* * * লেখকের রচনায় প্রাণ আছে, ভাষা সরল, অনাড়ম্বর কোথাও বাহুল্য বা বে-মানান নাই। চরিত্রগুলি স্ব স্ব বিশেষত্বে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বেশ ফুটিয়াছে। * * * ভারতী।